প্রাণ বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

(দশম শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক কাজলকুমার চক্রবর্তী, এম্. এস-সি.

জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, গুরুদাস কলেজ (কলিকাতা), পূর্বতন অধ্যাপক,
বিদ্যাসাগর কলেজ (প্রাতঃ) ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির।
প্রাণ বিজ্ঞান পরিচয় ; প্রাণ বিজ্ঞান ১ম এবং মাধ্যমিক বিজ্ঞান
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

প্রাণ বিজ্ঞান (২য়) পুস্তকের পঞ্চম পরিমার্জিত সংস্করণের ... জানাই সেই সকল মাননীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের যাঁদের ... চারটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করতে ... প্রচ্ছদে যে চিত্রটি আছে তার ব্যাখ্যা অনেকে আমার নিকট জানতে চেয়েছেন ... প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল, তা না করার জন্য ... প্রাণ বিজ্ঞান বলতে জীব-বিদ্যাকে বোঝায় না কারণ যে বিজ্ঞানে মানুষকে কেন্দ্র করে ... চারদিকের উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন জীববস্তু এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ... মানুষের সঙ্গে জড়িত তাকেই বোঝায়। এই সঙ্গে জড়বস্তু কিভাবে জীববস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তারও অনুশীলন প্রাণ বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। প্রচ্ছদের সবুজ বা নীল অংশ হচ্ছে জীবমণ্ডলকে ঘিরে যে সূর্যালোকিত আকাশ তাকেই বোঝাচ্ছে। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদক যার উপর খাদ্যের জন্য সকল জীব, যথা—মানুষ, পাখী ইত্যাদি নির্ভরশীল, তা দেখানো হয়েছে। শুধুমাত্র খাদ্য হলেই চলবে না যদি না জীব জনন দ্বারা বংশ রক্ষা করে। এইজন্য ফুল এবং মানুষকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং মানুষকে কেন্দ্র করে যে জীবমণ্ডল আবর্তিত হচ্ছে যা হচ্ছে প্রাণ বিজ্ঞান তা প্রচ্ছদের চিত্রের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

আরও কয়েকটি কথার মাধ্যমে প্রাণ বিজ্ঞান (২য়)-এর পঞ্চম পরিমার্জিত সংস্করণে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ

প্রাণ বিজ্ঞান পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর যে পরিবর্তন করেছি তার ব্যাখ্যা করছি। এই পুস্তকে পূর্বের মত সহজ ভাষায় প্রাণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সরল ক'রে বোঝানো হয়েছে এবং এই সঙ্গে প্রাণ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা লব্ধ জ্ঞানও সংযোজিত করা হয়েছে। পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্রগুলি যথাসম্ভব বাস্তবানুগ এবং সকল বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির পরিভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এবং বাংলা শব্দের বানান 'চলন্তিকা' অনুযায়ী করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা ক'রে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা ছোট ছোট প্যারাগ্রাফে এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি 'বোল্ড' অক্ষরে করা হয়েছে। পুস্তকের পরিশেষে অনুশীলনী অংশে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার সকল প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। এইভাবে পুস্তকটি সর্বাঙ্গীণভাবে আদর্শ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু 'মানুষ মাত্রই ভুল করে' এবং 'যে কাজ করে সেই কেবল ভুল করে' এই কথা মনে রেখে পুস্তকটির ভুলত্রুটি যদি কিছু থাকে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে মাননীয় শিক্ষক ও মাননীয়া শিক্ষিকাদের নিকট ভুলত্রুটি সংশোধনে ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে যে-কোনও পরামর্শ আহ্বান করছি।

গুরুদাস কলেজ, কলি : ৫৪
জীববিদ্যা বিভাগ

কাজলকুমার চক্রবর্তী

ory notes on the Syllabus of Life Science

Introduction to Nervous System and Sense Organs
(Detailed description not required)

A. Nervous system — Function co-ordination, Components of **nervous system :**

Neurone—structural and functional unit ,

Nerves—afferent efferent types synapse reflex action with common example, ganglion

Central Nervous system (Brain and spinal cord) Elementary idea of brain naming of (A) Fore-brain, (B) Mid-brain, (C) Hind brain. Absence of nervous system in plants to be mentioned

B. Sense organs with reference to human being

(a) Eye—Structure of eye should be treated in an elementary way with reference to eyelids, conjunctiva, cornea lens, iris and pupil, sclera chroid retina—with their respective functions in outline Mention the presence of tear gland

(b) Ear—Elementary idea about outer middle and inner ear Transmission of sound waves—Eardrum to internal ear through bones (Structures not required)

Function Hearing and balancing (Mechanism not needed)

(c) Tongue—Detection of food taste in the tongue with the help of taste buds

(d) Nose—As an organ of smell (structure not needed)

(e) Skin—Sensory organ (histological structure not needed)

2 General idea about hormones

Chemical co-ordination Site of formation and action Group names of Plant hormones , Auxins, Gibberellins and Kinins—Practical application of hormones in agriculture

Animal hormones—Site of secretion and functions of the following hormones in man

(i) Pituitary hormones (1) ACTH (2) STH (3) TSH (4) GTH

(ii) Insulin (Islets and Lengerhans of Pancreas)

(iii) Thyroxin (Thyroid)

(iv) Adrenalin.

3. Cell division and its significance (Mitosis and [illegible] stages). Details not required.

   Cell Division : Definition and explanation. Mention only chromosome, chromatid, centromere, D.N.A., gene.

   Mitosis : Definition, occurence, 4 stages (prophase, metaphase, anaphase and telophase) cytokinesis

   Significance—qualitative and quantitative equal division, increase in length and volume of the body as well as repair of body.

   Meiosis. Definition, occurence (Stages not to be mentioned) Significance-reduction in number of chromosomes, exchange of segments, change of meterials leading to recombinations and variation

4. Growth and reproduction

   (a) Growth—Definition and explanation

   Factors—Hormones, Food, Air, Water, Light and Temperature. Region of growth in plants Differences between growth of plants and animals

   (b) Reproduction—Definition and importance Different types of Vegetative reproduction including cutting and grafting, Asexual, Parthenogenesis (Definition & examples) Sexual reproduction in flowering plants mentioning the structures concerned Sexual reproduction in a vertebrate mentioning toad with reference to testis and ovary fertilisation (Anatomy not needed)

5. Heredity Definition and explanation.

Experiments on monohybrid cross Mention laws of Mendel. Practical applications of genetics for humen welfare (Mention Paddy, Wheat, fowl and cow)

6. Evolution (Outline idea)

   Evolution : Definition and Explanation

   Outline idea about origin of life and gradual complexities

   Evidences. Morphological (basic similarity in certain organs like limbs, heart and vestigeal organs) Palaeontological. Theories of evolution (an outline) as put forward by Lamarck and Darwin only.

7. Adaptations as examplified by specimens mentioned in the course content :

   Adaptation : Definition and explanation : Animal types : Fish and Pigeon.

Function of accessory respiratory organs in Koi, Singi and Magur. Plant types: Lotus, Cactus, Sundari and climbing devices in pea.

8. Carbon cycle, Nitrogen cycle and Oxygen cycle.
9. General idea about Eco-system and conservation.
   (a) Eco-system—Explanation and meaning of eco-system. Brief description of biotic and abiotic factors. Food chain and energy flow in eco-system.
   (b) Conservation—Conservation and its importance. Brief description of conservation of water, soil and forest. General idea of wild life preservation with special reference to Tiger.

PRACTICAL WORK FOR CLASSES IX AND X

Practical work should be done by individual student. Class room or any other available space may be used as laboratory whenever suitable laboratory is not available. Keeping in view the above points the practical work has been designed in the following manner.

Demonstration

1. Simple experiment to show evolution of O_2 during photosynthesis.

Practical to be done by individual student

2. Bubbling of expiratory air through lime water to show release of CO_2 during the respiration.
3. Dissection to show general view of alimentary system of toad.
4. Collection of Life history stages.
   (a) Mosquito-Larva, pupa and adult or
   Butterfly Egg, larva, pupa and adult.
   (b) Collection different types of leaves.
5. Experiment to demonstrate the increase in the rate of heart beat after exercise.

A class work book should be maintained on the basis of above experiments.

সূচীপত্র

বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ নার্ভতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়স্থানগুলির পরিচয় দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ হরমোন বিষয়ে সাধারণ ধারণা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ কোষ বিভাজন এবং তাহার তাৎপর্য

বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নার্ভতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়স্থানগুলির পরিচয় [illegible]

(Introduction to Nervous System & Sense Organs)

জীবমাত্রেই উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তা সে এককোষী আদ্যপ্রাণী অ্যামিবা বা **বহুকোষী** মেরুদণ্ডী প্রাণী মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীরা যে-কোন জীব হোক না কেন। কারণ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া জীবমাত্রেরই ধর্ম এবং যে-কোনও জীবের প্রোটোপ্লাজমের স্বাভাবিক ক্রিয়ার অঙ্গীভূত। সকল জীবই তাদের পরিবেশের উপর আহার ও বাসস্থানের জন্য নির্ভরশীল এবং এজন্য তাদের পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। কোন কারণে পরিবেশের পরিবর্তন হলে, সেই পরিবর্তনে জীবদেহে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং সাড়া জাগায়। বহুকোষী প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অঙ্গের পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের দ্বারা উত্তেজনায় সংজ্ঞা জাগায়। দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন তন্ত্রের ও দেহযন্ত্রের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যে পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাতে যদি কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাও জীবকে উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা জীবদেহে যে আবেগের সৃষ্টি করে তা সাড়াদানকারী অঙ্গের কার্যের দ্বারা পুনরায় প্রশমিত হয়।

প্রাণীদের দেহে পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার উদ্দীপনার গ্রাহক-অঙ্গ, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক ইত্যাদি আছে। উদ্দীপনার দ্বারা দেহের মধ্যে যে আবেগ সৃষ্টি হয় তা সাড়াদানকারী অঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এই সাড়াদানকারী অঙ্গ প্রধানত দেহের পেশী এবং বিভিন্ন গ্রন্থিতে আবেগ সৃষ্টির ফলে এই অঙ্গগুলি বিশেষ ক্রিয়া করে তাকেই উত্তর বা সাড়া বলে। **সংজ্ঞা : প্রাণীরা যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহের বহিঃস্থ বা আভ্যন্তরিক পরিবর্তনে উদ্দীপিত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা এবং দেহের আভ্যন্তরিক বিভিন্ন অঙ্গগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন দ্বারা তাদের সমন্বয় বিধান করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র (Nervous system) বলে।**

বিভিন্ন প্রাণী ও আমরা এই স্নায়ু বা নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে দেখতে, শুনতে, খাদ্যের স্বাদ বা ঘ্রাণ নিতে, উত্তাপ ও শীত অনুভব করতে, সুখ-দুঃখ-অনুভূতি বা ভাল মন্দ বিবেচনা করতে পারি এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনাতে এই তন্ত্র সাহায্য করে। প্রাণীদের নার্ভতন্ত্র থাকলেও **উদ্ভিদের দেহে কোন নার্ভতন্ত্র নেই তথাপি উদ্ভিদ উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে।** উদ্ভিদের সাড়া দেবার ক্ষমতা তাদের কোষের প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তার উপরে নির্ভর করে।

নার্ভতন্ত্রের কার্য— সমন্বয় বিধান : উদ্দীপনা-গ্রাহক অঙ্গগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অতি সহজেই উদ্দীপিত হয়, যথা—আলোর দ্বারা চক্ষু, ঘ্রাণের দ্বারা নাসিকা, শব্দের দ্বারা কর্ণ, চাপ ও স্পর্শের দ্বারা চর্ম ইত্যাদির উদ্দীপনা ঘটায়। এই সব বিভিন্ন

নিউরোনের শ্রেণীবিভাগ : আকার ও কার্য অনুযায়ী নিউরোন তিন প্রকারের হয়, যথা—(১) **সংবেদী নিউরোন** (Sensory neurone) **:** উদ্দীপনা-গ্রাহক-অঙ্গ থেকে যেসব নিউরোন কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে আবেগ বা অনুভূতি বহন করে তাদের সংবেদী নিউরোন বলে।

(২) **চেষ্টীয় বা আজ্ঞাবাহী নিউরোন** (Motor neurone) **:** কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র থেকে অনুভূতি বহন করে প্রতিবেদন বা সাড়াদানকারী অঙ্গ ; যথা—পেশী ও গ্রন্থির মধ্যে সাড়া জাগায় তাদের চেষ্টীয় বা আজ্ঞাবাহী নিউরোন বলে।

(৩) **সঙ্গী বা যোজক নিউরোন** (Associated neurone) **:** কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য নার্ভকোষ বা নিউরোন সংবেদী নিউরোন থেকে অনুভূতি আজ্ঞাবাহী নিউরোনের মধ্যে বিনিময় করে, তাদের সঙ্গী বা যোজক নিউরোন বলে।

(খ) **নার্ভসূত্রের গঠন :** একটি নার্ভ এক বা একাধিক নার্ভতন্তুর অ্যাক্সন বা ডেনড্রন এবং পুষ্টির জন্য খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন সরবরাহ হওয়ার জন্য রক্তবাহী ধমনী ও শিরার দ্বারা গঠিত। এদের চারদিকে যোগকলার আচ্ছাদন থাকে। দীর্ঘ নার্ভ বহু নার্ভতন্তুর দ্বারা গঠিত। দীর্ঘ নার্ভের সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের বা টেলিগ্রাফের কেবলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নার্ভ সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বাহিরে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিউরোন এবং নার্ভতন্তুর একত্রে অবস্থানের ফলে উৎপন্ন হয়। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র, যথা—মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের (spinal cord) অভ্যন্তরে বিভিন্ন নিউরোনের মধ্যে অবস্থানকারী এবং একটি নিউরোন থেকে অন্য নিউরোনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারক বিভিন্ন প্রকার কোষকে **নিউরোগ্লিয়া** (neuroglia) বলে।

নিউরোনের শ্রেণীবিভাগের ন্যায় যে নার্ভ অনুভূতি বহন করে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে আনে তাদের **সংবেদী নার্ভ** (sensory nerve) বা **অন্তর্বাহী নার্ভ** (afferent nerve) এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র থেকে যে নার্ভ আজ্ঞা বহন করে প্রতিবেদন বা সাড়াদানকারী অঙ্গে পৌঁছায় তাদের **আজ্ঞাবাহী নার্ভ** (motor nerve) বা **বহির্বাহী নার্ভ** (efferent nerve) বলে। আবার অনেক নার্ভ আছে (যথা—পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং দশম করোটিক নার্ভ) যাদের মধ্যে অনুভূতি এবং আজ্ঞাবহনকারী উভয় নার্ভতন্তুই আছে তাদের **মিশ্র নার্ভ** (mixed nerve) বলে।

(গ) **প্রান্তসান্নিকর্ষ বা সাইন্যাপস্** (Synapse) **:** গঠন ও কর্মধারা অনুযায়ী নিউরোনকে নার্ভতন্ত্র গঠনের একক বলা যায়। প্রতিটি নিউরোন পরবর্তী নিউরোনের সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে যুক্ত থাকে তাকে **সাইন্যাপস্** বা **প্রান্তসান্নিকর্ষ** (synapse) বলে। এই প্রকার সংযোগে নার্ভীয় আবেগ একটি নিউরোন থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় নিউরোনে এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় নিউরোনে এইভাবে কেবলমাত্র এক দিকেই প্রবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী নিউরোনের অ্যাক্সন পরবর্তী নিউরোনের ডেনড্রনে আবেগ বহন করে।

অ্যাক্সনের বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত শেষ প্রান্তগুলি **স্ফীত আকারের হয়। নার্ভের আবেগ এইস্থানে** উপস্থিত হলে এই অংশগুলি এক প্রকার রাসায়নিক **পদার্থ সাইন্যাপসের মধ্যে** নিঃসরণ করে। এই রাসায়নিক পদার্থকে **নিউরোহিউমর** (neurohumor) **বলে** এবং এই পদার্থ এক প্রকার **স্থানীয় হরমোন**। নিউরোহিউমর ডেনড্রনের প্রান্তে **রাসায়নিক সংবাদ প্রেরক** রূপে অ্যাক্সন দ্বারা আনীত আবেগ পরবর্তী নিউরোনের ডেনড্রনের মধ্যে প্রেরণ করে। এইরূপে সাইন্যাপস্ নার্ভের আবেগ কখনও নার্ভকেন্দ্রের (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড) মধ্যে আবার কখনও বা নার্ভকেন্দ্র থেকে প্রতিবিধানকারী অঙ্গের দিকে বহন নিয়ন্ত্রণ করে, এইজন্য সাইন্যাপসকে "**শারীরবৃত্তীয় কপাটিকা**" বলে।
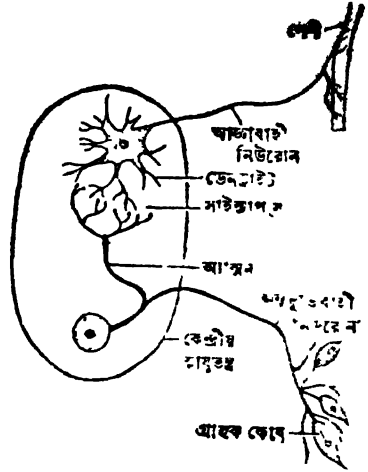
২নং চিত্র ॥ সাইন্যাপসের গঠন

বিভিন্ন প্রকার নিউরোহিউমর : কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বাইরে সাইন্যাপসের মধ্যে যে নিউরোহিউমরের ক্ষরণ হয় তাকে **অ্যাসিটিলকোলিন** (acetylcholine) এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের **সাইন্যাপসের** নিউরোহিউমরকে **সিমপ্যাথিন** (sympathin) বলে।

সাইন্যাপসের মধ্যে রাসায়নিক সংবাদ প্রেরক বস্তু পরবর্তী নিউরোনে আবেগ **সঞ্চারের** পরে সাইন্যাপস্ থেকে অপসৃত হয়, না হলে এই বস্তু পরবর্তী নিউরোনকে **ক্রমাগত** আবেগ দ্বারা উদ্দীপ্ত করতে থাকে। **অ্যাসিটিলকোলিন ইস্টারেজ** (acetylcholine esterase) নামক উৎসেচক অ্যাসিটিলকোলিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ দ্বারা নিষ্ক্রিয় **করে।** এজন্য অ্যাসিটিলকোলিন পুনরায় নিউরোনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না।

উদ্দীপনায় নার্ভতন্ত্রের আবেগ সঞ্চার : কোন উদ্দীপনা-গ্রাহক-অঙ্গ পারিপার্শ্বিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হলে নিউরোনের মধ্যে আবেগ উৎপন্ন হয়। আবেগ উৎপন্ন হয়ে নার্ভের তন্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নিউরোন থেকে **অন্য** নিউরোনে প্রবাহিত হয়। **এই প্রকার আবেগ প্রবাহকে ফুলঝুরি জ্বালানোর সাথে তুলনা করা চলে।** একটি ফুলঝুরিতে আগুন ধরালে যেমন আপনা-আপনি নিজের **মধ্যে রাসায়নিক** পদার্থ **জ্বলনের ফলে** আগুন একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে জ্বলতে **জ্বলতে অগ্রসর হয়**, আর আগুন ধরানোর প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ কোন উদ্দীপক একবার **গ্রাহক-অঙ্গে** উদ্দীপনা সৃষ্টি **করলে নার্ভের মধ্যে** একদিক থেকে অন্যদিকে আবেগ **প্রবাহ অগ্রসর হতে** থাকে। আমরা যেমন **ফুলঝুরি পুড়ে শেষ হয়ে গেলে ফেলে দিই, নার্ভের**

আবেগ সেইরূপে পেশী বা গ্রন্থির মধ্যে সঞ্চারিত হলে পেশী বা গ্রন্থির আবেগ অনুযায়ী কাজ করে এবং আবেগ প্রবাহকারী অ্যাসিটিলকোলিন অবশেষে উৎসেচক ক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়।

. **শান্ত** বা **নিষ্ক্রিয়** নার্ভতন্তুর বহির্ভাগ **ধনাত্মক আধান** (positive charge) এবং **অভ্যন্তর ঋণাত্মক আধানযুক্ত** (negative charge) থাকায় নার্ভতন্তু **সমবর্তিত** (polarized) অবস্থায় থাকে। আবেগ পরিবহনের সময় নার্ভতন্তুর মধ্যে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধান একে অপরকে প্রশমিত (neutralize) করে। আবেগ প্রবাহ এই উভয় প্রকার আধানের পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয়। একবার আবেগ প্রবাহিত হলে নার্ভতন্তু কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, এই সময় আর আবেগ প্রবাহিত হয় না, কারণ এই সময় নার্ভতন্তু অসমবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই সময়কে **প্রতিসরণীয় কাল** (refractory period) বলে। পরে রাসায়নিক পরিবর্তনে নার্ভতন্তু পুনর্বার সমবর্তিত এবং আবেগ সঞ্চারের উপযুক্ত হয়। বিভিন্ন প্রাণীর নার্ভতন্তুর আবেগ প্রবাহ, যথাক্রমে—চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রতি সেকেণ্ড ৬-১২ মিটার, ব্যাঙের ২৮-৩৮ মিটার এবং স্তন্যপায়ীদের ১২০ মিটার পর্যন্ত হয়।

উদ্দীপনায় এক নিউরোন থেকে অন্য নিউরোনে আবেগ প্রবাহকে 'রিলে দৌড়ের' সাথে বা এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণের সাথে তুলনা করা চলে।

সজ্ঞানে কার্য সাধন এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা অজ্ঞানে কার্য সাধন (Reflex action **:**

সজ্ঞানে কার্য সাধন : আমাদের হাতে মশা কামড়ালে সেই সংবাদ অন্তর্বাহী নার্ভসূত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে সঙ্গী নিউরোন সংবাদটি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক আজ্ঞাবাহী বা চেষ্টীয় নিউরোনের মাধ্যমে মশাটিকে তাড়ানোর বা মারার আদেশ প্রেরণ করে। বহির্বাহী নার্ভসূত্র এই আদেশ হাতের পেশীতে বহন করে, ফলে পেশীর কার্যের দ্বারা হাত মশাটিকে মারার চেষ্টা করে। এই প্রকার কার্য সাধন সজ্ঞানে হয় বলে এই ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা যায় না।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া : উদ্দীপনা-গ্রাহক-অঙ্গ (গ্রাহক ইন্দ্রিয়) কোনও উদ্দীপনায় উদ্দীপিত বা সংবেদনশীলতা প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্বাহী নার্ভসূত্রের মাধ্যমে আবেগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গী বা যোজক নিউরোনে প্রবাহিত করে। সঙ্গী নিউরোন এই আবেগ বহির্বাহী স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা সাড়াদানকারী অঙ্গে বাহিত করে সময়োপযোগী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সমগ্র ঘটনাটিকে **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** বলে। উদ্দীপনা-গ্রাহক থেকে সাড়াদানকারী অঙ্গে যে চাপে আবেগ বাহিত হয় তাকে **প্রতিবর্ত চাপ** (reflex arc)

বলে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া অজ্ঞানে হয় এবং এই প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনও প্রয়োজন হয় না। এইজন্য প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে অজ্ঞানে কার্য সাধন বলে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ ঃ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা অজ্ঞানে কার্য সাধনের একটি উদাহরণ
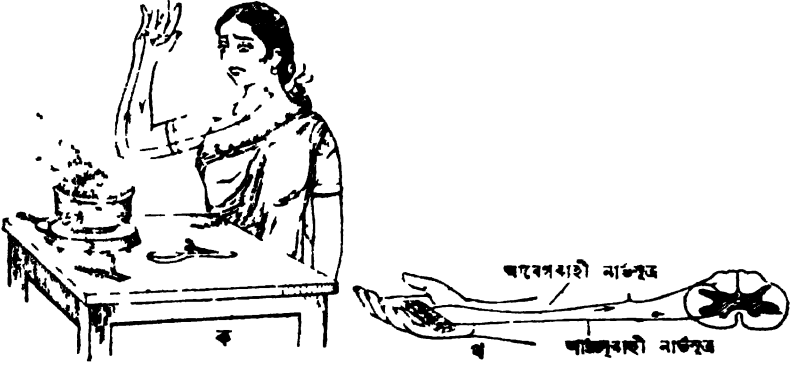
৩নং চিত্র ॥ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (ক) তাপের স্পর্শে হাত সরিয়ে নেওয়া— শর্তহীন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত, (খ) আবেগবাহী নার্ভের মাধ্যমে অনুভূতি বহন এবং আজ্ঞাবাহী নার্ভের মাধ্যমে হাত সরিয়ে নেওয়ায় প্রতিবর্ত চাপের দৃশ্য।

হচ্ছে অন্যমনস্ক অবস্থায় অত্যন্ত গরম পাত্রে হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নেওয়া। এই ক্রিয়ায় হাতের ত্বকে অবস্থিত গ্রাহক ইন্দ্রিয় অধিক তাপের স্পর্শে উদ্দী
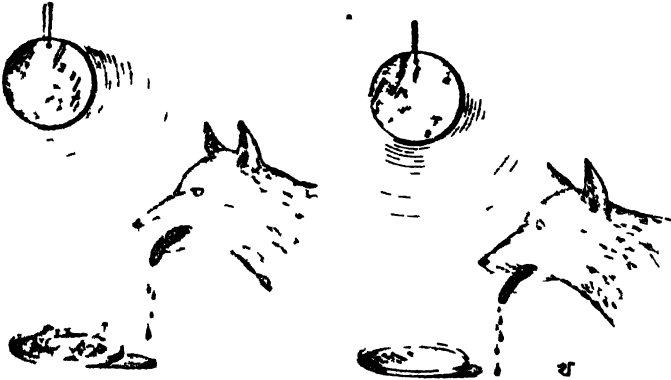
৪নং চিত্র ॥ শর্তবদ্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (ক) ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে কুকুরকে খাদ্য দেওয়ায় লালা নিঃসরণ, (খ) খাদ্য না দিলেও একই সময়ে ঘণ্টা বাজানোর কুকুরের লালা নিঃসরণের দৃশ্য।

হয়ে সংবেদী নিউরোনের দ্বারা সংবাদ দ্রুত সুষুম্নাকাণ্ডে প্রেরণ করে এবং সুষুম্নাকাণ্ড কালক্ষেপ না করে আজ্ঞাবাহী (চেষ্টীয়) নিউরোন দ্বারা হাত সরিয়ে নেবার আদেশ দেয়।

সুস্বাদু খাদ্য খেতে তৎক্ষণাৎ আমাদের অজান্তে মুখ লালায় ভরে যায়, এও একটি **সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার** উদাহরণ। এই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আর একটি উদাহরণ হচ্ছে, উজ্জ্বল আলো চোখের উপর পড়লে তৎক্ষণাৎ আমাদের চোখের পাতা বুজে যাওয়া। এই সকল প্রতিবর্ত ক্রিয়া কোনও শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে এদের **শর্তহীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditional reflex) বলে।

বিখ্যাত রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানী **পাভলভ** একটি পরীক্ষার দ্বারা **শর্তবন্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার** উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি একটি কুকুরকে খাদ্য দিয়ে তার সঙ্গে একটি ঘণ্টা কয়েক দিন যাবৎ বাজিয়ে তাকে ঐ পরিবেশে অভ্যস্ত করান, এই সময় কুকুরের মুখে লালা নিঃসরণ হতে থাকে। পরে তিনি খাদ্য না দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র ঘণ্টা বাজালেও কুকুরের লালা নিঃসরণ হচ্ছে দেখেন। এই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে শর্তবন্ধ বলে একে **শর্তবন্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (conditional reflex) বলে।

প্রাণীদের নার্ভতন্ত্রের গঠন

নার্ভতন্ত্র গঠনের একক নিউরোন বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক জীব যথা—বিভিন্ন উদ্ভিদ, এককোষী অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম ইত্যাদির দেহে কোনও নিউরোন নেই কিন্তু তারা পরিবেশের প্রভাবে সাড়া দেয়। এই প্রাণীদের দেহের প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন উদ্দীপক যথা—ক্ষুধা, অত্যধিক বা অত্যল্প তাপ বা বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়।

প্যারামেসিয়াম নামক আদ্য প্রাণীর দেহের মধ্যে অনুপেশীতন্তু বা মায়োফাইব্রিলগুলি (Myofibril) চেষ্টীয় নার্ভের মত উদ্দীপ্ত হয়ে আবেগ সৃষ্টির সাহায্যে চলন ক্রিয়া করে। **বহুকোষী স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীদের দেহে কোন নার্ভকোষ বা নার্ভতন্ত্র নেই,** কিন্তু হাইড্রার দেহের বহিঃকোষ স্তরের মধ্যে নার্ভকোষ দ্বারা তৈরী **নার্ভজালক** বিস্তৃত থাকে। এই নার্ভকোষ বা নিউরোনের একটির সাথে অন্য নিউরোনের প্রোটোপ্লাজম দ্বারা দৈহিক সংযোগ সাধিত হয় (উন্নত জীবের নার্ভতন্ত্রের বিপরীত)। এই নার্ভকোষ বাইরের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে অনুভূতি পেশীকোষে বহন করে, এর ফলে পেশীকোষের সংকোচন ঘটে এবং হাইড্রার চলন ও গমন ক্রিয়া হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভতন্ত্র : মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভতন্ত্র যথাক্রমে—(১) **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র,** (২) **প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র** এবং (৩) **স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের** দ্বারা গঠিত। এখানে মানুষের নার্ভতন্ত্রের এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাথে এর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কথা বলা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র : কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র যথাক্রমে সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্ক দ্বারা গঠিত। ইহা পৌষ্টিকতন্ত্রের পৃষ্ঠদেশে দেহের অভ্যন্তরে অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে পশ্চাতে

পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁপা নার্ভরজ্জু—সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা গঠিত (অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র কিন্তু ভরাট)। সমগ্র কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড) মেনিনজিস (meninges) নামক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে।

(ক) সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) বর্ণনা এবং কার্য :

গঠন : মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে মেরুদণ্ডের নিউর‍্যাল ক্যানেলের মধ্য দিয়ে দেহের পৃষ্ঠদেশ বরাবর বিস্তৃত চকচকে সাদা রজ্জুর আকারের বস্তুকে সুষুম্নাকাণ্ড বলে। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে বাহিরের দিকে **শ্বেতবস্তু** (white matter) এবং অভ্যন্তরে **ধূসর বস্তু** (grey matter) দেখা যায়। শ্বেতবস্তু প্রকৃতপক্ষে মাইয়েলিন আবরণীযুক্ত দীর্ঘ নার্ভতন্তুগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে সম্মুখ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় নার্ভরজ্জুকে সাদা দেখায়। ধূসর বস্তুর অভ্যন্তর পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন সঙ্গী নিউরোন এবং আজ্ঞাবাহী বা চেষ্টীয় নিউরোনের কোষ-দেহ দ্বারা গঠিত এবং প্রস্থচ্ছেদে ধূসর বস্তুর আকার ইংরেজী H-এর মত হয়। ধূসর বস্তুর মধ্য অঞ্চলে একটি সরু নালী সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালীর মধ্যে এক প্রকার অতিপ্রয়োজনীয় তরল পদার্থ থাকে—এই পদার্থকে **সেরিব্রো-স্পাইনাল রস** (cerebrospinal fluid) বলে।

মানুষের সুষুম্নাকাণ্ডের উভয়পার্শ্বে পরপর সমদূরত্বে ৩১ জোড়া নার্ভমূল থাকে। প্রতি জোড়ার উপরেরটিকে পৃষ্ঠ নার্ভমূল (dorsal root) এবং নিচেরটিকে অঙ্কীয় নার্ভমূল (ventral root) বলে। পৃষ্ঠ নার্ভমূল সংবেদী নার্ভ এবং অঙ্কীয় নার্ভমূল চেষ্টীয় নার্ভ এবং এরা মিলিত হয়ে প্রান্তস্থ মিশ্রনার্ভ উৎপন্ন করে। মিশ্রনার্ভের সংবেদী নিউরোনের সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছবার পর পৃষ্ঠ নার্ভমূলের মধ্য দিয়ে ধূসর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের কোষদেহ পৃষ্ঠ নার্ভমূলের গ্যাংগ্লিয়নের মধ্যে থাকে। চেষ্টীয় নিউরোন অঙ্কীয় নার্ভমূলের মধ্য দিয়ে মিশ্রনার্ভে যুক্ত হয়।

কার্য : নার্ভতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানে সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান কার্য দুটি : (১) প্রথম কার্য প্রান্তস্থ নার্ভতন্ত্রের (peripheral nervous system) সাথে মস্তিষ্কের যোগসাধন। এই ক্রিয়ায় সংজ্ঞাবাহী বা সংবেদ নিউরোন দ্বারা আনীত আবেগ সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গী নিউরোন দ্বারা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছায়। মস্তিষ্কের মধ্যে আবেগ বিবেচিত হওয়ার পর অন্য আরেক দল সঙ্গী নিউরোন দ্বারা তা সুষুম্নাকাণ্ডের আজ্ঞাবাহী বা চেষ্টীয় নিউরোনের মধ্যে বাহিত হয়। নির্দিষ্ট অনুভূতি বহনের জন্য সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট সঙ্গী নিউরোন থাকে এবং তারা নির্দিষ্ট পথ ধরে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অনুভূতি পৌঁছিয়ে দেয়, আবার অন্য আরেক দল সঙ্গী নিউরোন একই উপায়ে আজ্ঞাবাহী নিউরোনে আদেশ পৌঁছায়। তবে একটি বিশেষত্ব এই যে, দেহের ডানদিকের উদ্দীপক-গ্রাহক-অঙ্গের উত্তেজনা সংজ্ঞাবাহী নিউরোন দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবেশের

পর বামদিকের পথ ধরে মস্তিষ্কের বামদিকে উপস্থিত হয়। একইভাবে বামদিকের আবেগ মস্তিষ্কের ডানদিকে যায়। সুতরাং কোনও কারণে বাম মস্তিষ্কের ক্ষতি হলে দেহের ডানদিকে এবং ডান মস্তিষ্কের ক্ষতি হলে দেহের বামদিকের অনুভূতি এবং অন্যান্য ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

(২) সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বিতীয় কার্য হচ্ছে **গৌণ নার্ভকেন্দ্ররূপে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ।** উত্তপ্ত পদার্থে হাত লাগালে তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে নেওয়া সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে গৌণ নার্ভকেন্দ্রের দ্বারা চালিত হয়। এই কার্যটি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যায়। একটি সুস্থ ব্যাঙের মস্তিষ্ক কোনওভাবে নষ্ট করে বা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে কেটে আলাদা করে নিচের চোয়াল কাঁটার দ্বারা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এই অবস্থায় দেখা যাবে যে, ব্যাঙটি কোনওপ্রকার নড়াচড়া করছে না। এখন একটি কাগজ লঘু অ্যাসিড দ্রবণে ভিজিয়ে একদিকের ত্বকে লাগালে দেখা যাবে যে, ব্যাঙটি যে দিকে অ্যাসিড লাগান হয়েছে সেই দিকের পা নাড়িয়ে কাগজটি সরিয়ে দিচ্ছে। মস্তিষ্কের সাথে যোগ না থাকায় ব্যাঙের সংজ্ঞাবাহী নিউরোন উত্তেজনার আবেগ সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে গৌণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর ফলে আজ্ঞাবাহী নিউরোন পায়ের পেশী সংকোচন ঘটায়, ফলে ব্যাঙটি পা নেড়ে কাগজটি সরাবার চেষ্টা করে।

(খ) মস্তিষ্কের গঠন ও বিভিন্ন অংশের কার্য :

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যাবলী অত্যন্ত জটিল। সুষুম্নাকাণ্ড এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির করোটিক নার্ভগুলির (এই নার্ভগুলি সংবেদী) দ্বারা বাহিত আবেগ মস্তিষ্কের মধ্যে আনীত হলে মস্তিষ্ক সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করে। এই বিন্যাসকরণ বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি, এক আবেগের সাথে অন্য আবেগের নৈকট্য এবং এই সব ক্রিয়ার দ্বারা দেহের সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়া ইত্যাদি সবই মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে আবেগের নির্দিষ্ট পথপরিক্রমার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মস্তিষ্ক প্রাণিদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং শক্ত অস্থির দ্বারা গঠিত করোটির (মাথার খুলি) গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় সহজে আঘাত লাগে না। মস্তিষ্কের চারদিকে মেনিনজিস্ নামক তিনস্তরযুক্ত আবরণীতে ঢাকা থাকে। মস্তিষ্কের বাইরের দিকে ধূসর বস্তু, ভেতরের দিকে শ্বেতবস্তু এবং অভ্যন্তরে চারটি প্রকোষ্ঠ (ventricle) থাকে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতীব প্রয়োজনীয় **সেরিব্রোস্পাইন্যাল রস** (cerebrospinal fluid) থাকে। এই রস এবং মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশের দুটি প্রকোষ্ঠের উপরে যে বৃহৎ রক্তবাহিকার জালক—কোরয়েড প্লেক্সাস (choroid plexus) উৎপন্ন হয়, এর রক্তের সাথে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, বর্জ্যবস্তু ইত্যাদির বিনিময় ঘটে।

মস্তিষ্কের গঠন : মস্তিষ্ক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা—(১) অগ্রমস্তিষ্ক (Fore-brain), (২) মধ্যমস্তিষ্ক (Mid-brain) এবং (৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hind-brain)।

মস্তিষ্ক গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আদিমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক একটি দীর্ঘ লাঠির স্ফীতাকার অগ্রবর্তী অংশের মত ছিল। এই প্রকার আকৃতির বিভিন্ন অঞ্চল সংকুচিত
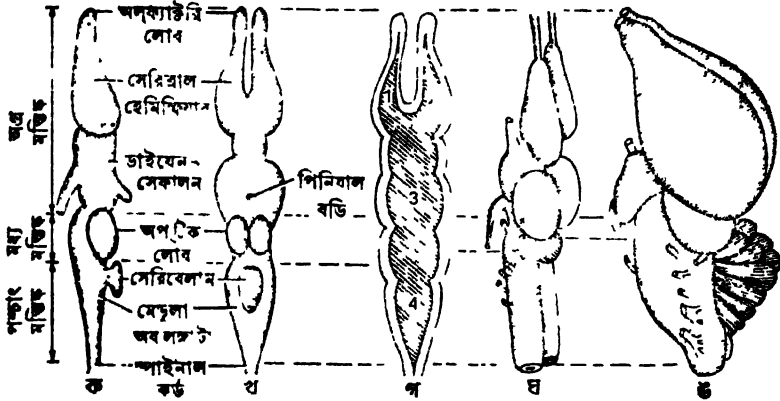
৫নং চিত্র ॥ (ক, খ—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কের প্রাথমিক গঠন ও (গ)—আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য। (ঘ—ব্যাঙ ও (ঙ—পাখীর মস্তিষ্কের বহির্গঠনের দৃশ্য।

ও প্রসারিত হওয়ায় মস্তিষ্ক অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। অগ্রমস্তিষ্ক সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও ডাইয়েনসেফালনে পরিবর্তিত, মধ্য মস্তিষ্ক প্রায় অপরিবর্তিত এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক সেরিবেলাম ও মেডুলা অবলংগাটায় (সুষুম্নাশীর্ষক) পরিবর্তিত হয়। এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা মস্তিষ্ক যে সকল অঞ্চলে বিভক্ত হয় মৎস্য ও উভচরের ক্ষেত্রে তা প্রায় একই প্রকার থাকে। কিন্তু সরীসৃপ থেকে পক্ষী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও সেরিবেলাম পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্ধিত হয়ে ডাইয়েনসেফালন ও মেডুলা অবলংগাটাকে আংশিকভাবে ঢেকে ফেলে।

(১) **অগ্রমস্তিষ্ক:** মানুষের অগ্রমস্তিষ্ককে **সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বা গুরুমস্তিষ্ক** (cerebrum or cerebral hemisphere) বলে। এই অংশের আকার বেশ বড় এবং দক্ষিণ ও বাম অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশকে **গোলার্ধ** (hemisphere) বলে। গুরুমস্তিষ্কের উভয় গোলার্ধ **কর্পাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামক নার্ভযোজক দ্বারা যুক্ত। গুরুমস্তিষ্কের বাইরের দিকটি বহু গভীর ও অগভীর খাঁজে বিভক্ত হয়ে এক একটি অঞ্চল বা পিণ্ড (lobe) উৎপন্ন করে। মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের গঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বাইরের দিকের বস্তু নার্ভকোষ ও পুরু ধূসরবস্তুর দ্বারা গঠিত স্তর বা **সেরিব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex) এবং অভ্যন্তরের মায়েলিন আবরণীযুক্ত নার্ভতন্তু দ্বারা গঠিত শ্বেতবস্তু আছে।

আমাদের মস্তিষ্কের উন্নত গঠন কর্টেক্সের কয়েক লক্ষকোটি নিউরোনের কোষদেহ এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকারের সংযুক্তির ফলে হয়েছে।

গুরুমস্তিষ্কের কার্য : বিভিন্ন জীবজন্তু ও কখনও কখনও মানুষের উপর পরীক্ষার মাধ্যমে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কেন্দ্র আছে বলে জানা গিয়েছে। গুরুমস্তিষ্কের প্রধান কাজগুলির মধ্যে প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ,

৬নং চিত্র ॥ মানুষের মস্তিষ্কের—(ক) অন্তর্গঠন ও (খ) বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্যের দৃশ্য।

স্মরণ, ভয় এবং ক্রোধ ইত্যাদি প্রধান। এগুলি ব্যতীত আরও বহুভাবে গুরুমস্তিষ্ক অন্যান্য অংশকেও চালিত করে।

(২) মধ্যমস্তিষ্ক : এই অংশটি মানুষের মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ। এই অংশ একদিকে গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের (cerebellum) সাথে এবং আরেক দিকে গুরুমস্তিষ্ক ও চক্ষুর মধ্যে আবেগ প্রবাহে অংশ গ্রহণ করে।

মধ্যমস্তিষ্কের কার্য : মস্তিষ্কের এই অংশ প্রাণীর চলন, গমন ও অন্যান্য শারীরিক কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে। মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যমস্তিষ্কের উভয় দিকে দুটি গোলাকার অপটিক লোব (optic lobe) এবং স্তন্যপায়ীদের এক একদিকে দুটি করে মোট চারটি অপটিক লোব বা করপোরা কোয়াড্রিজেমিনা আছে।

(৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক : মস্তিষ্কের এই অংশ আবার দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) এবং দ্বিতীয় ভাগকে মেডুলা অবলংগাটা সুষুম্নাশীর্ষক (medulla oblongata) বলে।

(ক) লঘুমস্তিষ্ক মধ্যমস্তিষ্কের পশ্চাতের অংশ এবং বহু গভীর খাঁজযুক্ত ভাঁজ দ্বারা গঠিত। লঘুমস্তিষ্ক গুরুমস্তিষ্কের মত দক্ষিণ ও বাম এই দুই গোলার্ধে বিভক্ত।

লঘু মস্তিষ্কের কার্য : এই অংশ দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজের সমন্বয় সাধন করে দেহের ভারসাম্য রক্ষায় এবং চলনে সাহায্য করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পাখীর লঘুমস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে সর্বাপেক্ষা বড়। এর ফলে বিভিন্ন উড্ডয়ন পেশীগুলির সামঞ্জস্যবিধান ঘটিয়ে পাখী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উড়তে পারে।

(খ) সুষুম্নাশীর্ষক : সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রবর্তী এবং লঘুমস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলের স্ফীত অংশটিকে সুষুম্নাশীর্ষক বলে। এই অংশটি আকারে ছোট হলেও প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুষুম্নাশীর্ষকের কার্য : এই অঞ্চলে উৎপন্ন বিভিন্ন করোটিক নার্ভ হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, ধমনীসংকোচন, খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ ইত্যাদি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য এই অংশের কোন ক্ষতি হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র (Peripheral nervous system) : কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অন্তর্গত মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী, পক্ষী এবং সরীসৃপ ইত্যাদি প্রাণীর বার জোড়া নার্ভ উৎপন্ন হয়। এই নার্ভগুলি করোটি ভেদ করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার করে বলে এদের করোটিক নার্ভ (cranial nerves) বলে। ব্যাঙের বা মাছের করোটিক নার্ভ কিন্তু দশ জোড়া। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যেসব প্রান্তীয় নার্ভ উৎপন্ন হয় তাদের সুষুম্নানার্ভ বলে। প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র করোটিক এবং সুষুম্না নার্ভ দ্বারা গঠিত।

স্বয়ংক্রিয় বা স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র (Autonomic nervous system) :

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত নয় এই প্রকার নার্ভতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় বা স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র বলে। এই নার্ভতন্ত্র বিভিন্ন গ্যাংগ্লিয়ন এবং নার্ভসূত্রের সাহায্যে দেহের
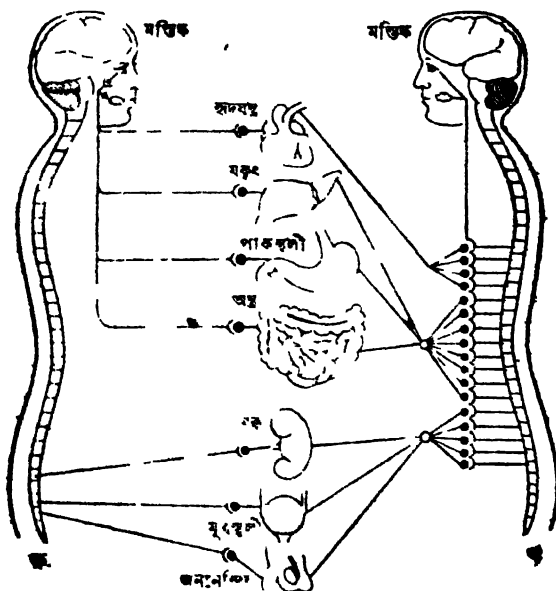
৭নং চিত্র ॥ মানুষের স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের—(ক) পরাসমব্যথী বা মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ত্রৈকাস্থিক অংশ, (খ) সমব্যথী বা বক্ষ এবং কটিদেশীয় অংশ।

অভ্যন্তরে অনৈচ্ছিক পেশী, হৃদ্‌যন্ত্র বিভিন্ন গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্র (viscera) ইত্যাদির দ্বারা গঠিত দেহের আভ্যন্তরিক পরিবেশের কোন পরিবর্তন হলে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশেষ ইন্দ্রিয়স্থানগুলির বর্ণনা
(Special Sense-organs)

বিভিন্ন প্রাণী এবং আমাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রকার বস্তুর আকার, আয়তন, শব্দ উৎপাদন, গন্ধ, স্বাদ, তাপমাত্রা এবং আরও অন্যান্য অনুভূতি লাভের জন্য যে সকল উদ্দীপক গ্রাহক যন্ত্র আছে তাদের **বিশেষ ইন্দ্রিয়স্থান** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয়** বলে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষের বিশেষ ইন্দ্রিয়স্থান প্রধানত পাঁচটি। এই সকল পাঁচটি ইন্দ্রিয়স্থান যথাক্রমে—**চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকে** অবস্থিত এবং এদের **পঞ্চ ইন্দ্রিয়** বলা হয়।

প্রাণীদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি : এই সকল ইন্দ্রিয়স্থানের অনুভূতি গ্রহণের ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকার, যথা—কুকুরের ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা এবং মনুষ্য শিশু, বাদুড় ও বিড়ালের

৮নং চিত্র — অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের গ্রাহক-যন্ত্রের দৃশ্য (ক) ইউগ্লিনার আলোকগ্রাহক যন্ত্র চক্ষুবিন্দু, (খ) জেলীফিসের ভারসাম্যরক্ষক যন্ত্র ল্যাপেট এবং স্পর্শেন্দ্রিয় টেনটাকেল, (গ) শামুকের আলোকগ্রাহক যন্ত্র চক্ষুবিন্দু, (ঘ) পতঙ্গের উদরে অবস্থিত শ্রবণযন্ত্র এবং পায়ে অবস্থিত স্বাদেন্দ্রিয়।

ঘ্রাণ গ্রহণ ক্ষমতা, শোনার ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। ঈগল পাখীর দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশী। মৌমাছিরা আলোর মধ্যে অতিবেগুনী এবং লোহিত আলোক রশ্মি সহজেই বুঝতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য প্রকার প্রাণীর দেহের বিভিন্ন স্থানে এই সকল ইন্দ্রিয়স্থান অবস্থিত।

স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক) : বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণী যথা—হাইড্রা ও কেঁচোর ত্বকে স্পর্শ অনুভূতির নার্ভকোষ আছে। হাইড্রার কর্ষিকার মধ্যে স্পর্শকাতর নার্ভকোষ থাকায় কোন খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে যে অনুভূতি গ্রহণ করে তা দ্বারা দংশনশীল কোষ দ্বারা খাদ্যবস্তু ধরে। কেঁচোর দেহের ত্বকে স্পর্শকাতর নার্ভকোষ থাকায় গমনের সময় কোন বস্তুতে বাধা পেলে অন্যদিকে দেহটি সরিয়ে নেয়। চিংড়ি এবং আরশোলার শুঙ্গ বা অ্যান্টেনায় অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল লোম স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। **এই সকল প্রাণী কোন বস্তুর গায়ে অ্যান্টেনার স্পর্শ দ্বারা কোন্ জাতীয় বস্তু তা এবং বস্তুটির তাপমাত্রাও মোটামুটি বুঝতে পারে।**

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্পর্শেন্দ্রিয়গুলি ত্বকের নীচে থাকে। এই ইন্দ্রিয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত নার্ভ প্রান্ত বা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **স্পর্শকণা** (Touch corpuscle) বা অন্য প্রকার স্নায়ুকোষের বহিঃপ্রান্তদেশের পরিবর্তনের ফল। এই সব স্নায়ুকোষের সাহায্যে প্রাণীরা স্পর্শ বা কি জাতীয় স্পর্শ এবং তাপ, চাপ, যন্ত্রণা ইত্যাদি বোধ অনুভব করে। মাছ তার দেহের উভয় পার্শ্বে মস্তক হতে লেজ পর্যন্ত প্রসারিত **পার্শ্বরেখার** নালিকার মধ্যে অবস্থিত নার্ভপ্রান্ত (lateral line sense organ) দ্বারা জলের মধ্যে কোনওপ্রকার আলোড়ন সহজেই অনুভব করতে পারে।

আমাদের দেহের সর্বত্র স্পর্শেন্দ্রিয় থাকলেও অনুভূতির হার সব স্থানে সমান নয়। আঙ্গুলের অগ্রভাগে, হাতের পৃষ্ঠের দিকে, কপাল এবং জিহ্বায় স্পর্শ বা তাপমাত্রার অনুভূতির পরিমাণ অধিক।

(খ) **স্বাদেন্দ্রিয় (জিহ্বা) :** মানুষের জিহ্বা এবং মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জলচর প্রাণীর দেহের সর্বত্র রাসায়নিক বস্তুর প্রকৃতি বিচার করার ইন্দ্রিয়গুলি অবস্থিত। মানুষের জিহ্বা পেশীবহুল এবং পেশীগুলির বাইরে ঝিল্লির দ্বারা গঠিত আবরণ থাকে। ঝিল্লির মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **স্বাদ কোরক** (taste buds) অবস্থিত এবং স্বাদ কোরকগুলির মধ্যে উভয় প্রান্ত সরু এবং মধ্যদেশ স্ফীত এরূপ বহু স্বাদ কোষ থাকে। এই
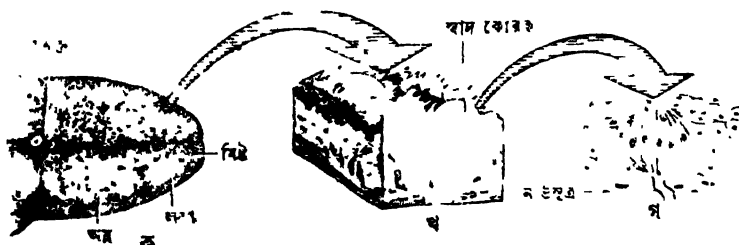
১নং চিত্র ॥ মানুষের স্বাদেন্দ্রিয় জিহ্বার বিভিন্ন অংশের দৃশ্য—(ক) জিহ্বার বিভিন্ন প্রকার স্বাদ গ্রহণের স্থান, (খ) স্বাদ কোরক এবং (গ) স্বাদ কোরকের অন্তর্গঠন।

কোষগুলি নার্ভ কোষের রূপান্তর মাত্র। মুখগহ্বরে লালার দ্বারা খাদ্যবস্তু তরল করলে বা তরল খাদ্যবস্তু স্বাদ কোরকের উপরিদিকের রন্ধ্রপথে স্বাদ কোষগুলিকে উদ্দীপ্ত করে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তা মস্তিষ্কে। স্বাদ কেন্দ্রে সংবেদ নার্ভদ্বারা বাহিত হয়ে স্বাদবোধ জাগায়। খাদ্যবস্তু বা অন্য কোনও বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য এই ইন্দ্রিয়কে **রাসায়নিক উদ্দীপক গ্রাহকও** বলা হয়।

আমাদের জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এক এক প্রকার রাসায়নিক বোধ গ্রহণ করে। **জিহ্বার দুই পার্শ্বের স্বাদ কোরকগুলি অম্ল, অগ্রভাগেরগুলি মিষ্টতা, পশ্চাতেরগুলি তিক্ত বা কষায়** স্বাদের জন্য দায়ী, কিন্তু জিহ্বার **সমগ্র উপরিভাগ লবণাক্ত স্বাদ গ্রহণ করে।**

মাছি, প্রজাপতি এবং মথের স্বাদেন্দ্রিয় তাদের পায়ের তলায় থাকে এবং খাদ্যবস্তু পায়ে লাগলে তার উদ্দীপনা পায়ের মধ্যে সংবেদ নিউরোন দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং আজ্ঞাবাহী নিউরোন তাদের শুঁড়াকার মুখের চোষক নলে অনুভূতি বহন করে। ফলে গুটানো চোষক নল খুলে যায় এবং খাদ্যবস্তু মুখের মধ্যে গৃহীত হয়।

(গ) **ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) :** মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর নাসিকার ঝিল্লির মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দীর্ঘ আকারের নিউরোন এবং তাদের প্রান্তদেশীয় অনাবৃত বা মুক্ত অংশের সাহায্যে বায়ুর মধ্যে গন্ধযুক্ত বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। বায়ু-প্রবাহে কণিকাগুলি নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে ঝিল্লির গ্রন্থিরসে দ্রবীভূত হয়ে নার্ভপ্রান্তে উত্তেজনা ঘটায়। এই উত্তেজনা সংবেদ নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কের অগ্রভাগে ঘ্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ঘ্রাণ অনুভূতির সৃষ্টি করে। খাদ্যের স্বাদ তার গন্ধের উপর অনেকটা নির্ভর করে, কারণ ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হলে নাসিকার ঝিল্লিতে কোনও গন্ধদ্রব্য উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে না, ফলে ঘ্রাণবোধ সৃষ্টি হয় না এবং বিভিন্ন প্রকার খাদ্য একই প্রকারের স্বাদযুক্ত মনে হয়।

বন্যপ্রাণীদের এবং পতঙ্গের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল, যার ফলে তারা সহজেই খাদ্য ও সঙ্গী খুঁজতে এবং শত্রুর হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন মথের ঘ্রাণশক্তির গ্রাহক তাদের শুঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। পুরুষ মথ স্ত্রী-মথের দেহনিঃসৃত অতি অল্প পরিমাণ গন্ধবস্তু, যাকে বর্তমানে ফিরোমোন (pheromone) বলে, তা বহুদূর থেকেও অনুভব করতে পারে এবং সেই গন্ধ অনুসরণ করে স্ত্রী-মথের কাছে উড়ে আসে।

(ঘ) **দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষু) :** এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাণী আলোর তারতম্য বুঝতে পারে। ইউগ্লিনার স্টিগমা (Stigma), জেলিফিসের চক্ষুবিন্দু (Eye spot) এবং কেঁচোর ত্বকের আলোক-গ্রাহক কোষ ইত্যাদি আলোর প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। চাপটা কৃমি জাতীয় প্রাণী প্ল্যানেরিয়ার দেহের মস্তিষ্কের কাছে দুটি চক্ষুবিন্দু থাকে এবং এই যন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে চক্ষুর প্রাথমিক পর্যায়। চিংড়ি, আরশোলা এবং অন্যান্য পতঙ্গের চক্ষু প্রকৃতপক্ষে বহু সরল অক্ষি বা চক্ষুর দ্বারা গঠিত পুঞ্জাক্ষি।

মানুষের চক্ষুর গঠন : বিভিন্ন মেরুদণ্ডীদের চক্ষু অনেকটা ছবি তোলার ক্যামেরার যন্ত্রের সাথে তুলনীয়। এই প্রকার চক্ষুতে একটি লেন্স থাকে এবং লেন্সের সামনে বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব ফিল্মের মত একটি আলোক সংবেদনশীল পর্দার উপর উৎপন্ন হয়।

মানুষের নাকের উপরের দুদিকে দুটি গহ্বরের মধ্যে বহু পেশীযুক্ত দুটি নেত্র গোলক থাকে। নেত্র গোলকের চারদিকে তিনস্তরবিশিষ্ট বলা আবরণী থাকে। এই স্তরের বাইরেরটি বেশ শক্ত। একে স্ক্লেরোটিক স্তর আবরণী (sclerotic coat) বলে। তবে লেন্সের সম্মুখে এই আবরণী স্বচ্ছ হওয়ায় আলোক প্রবেশ বাধাহীন হয়। এই অংশকে অচ্ছোদপটল বা কর্ণিয়া (cornea) বলে। চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় নেত্র গোলকের

সম্মুখের অনাবৃত অংশ নেত্রপল্লবের অভ্যন্তরে অবস্থিত **কনজাংটিভা** বা **নেত্রবর্ত্মকলা** (conjunctiva) নামক শ্লেষ্মঝিল্লির আস্তরণ দ্বারা আবরিত থাকে। নেত্রবর্ত্মকলার
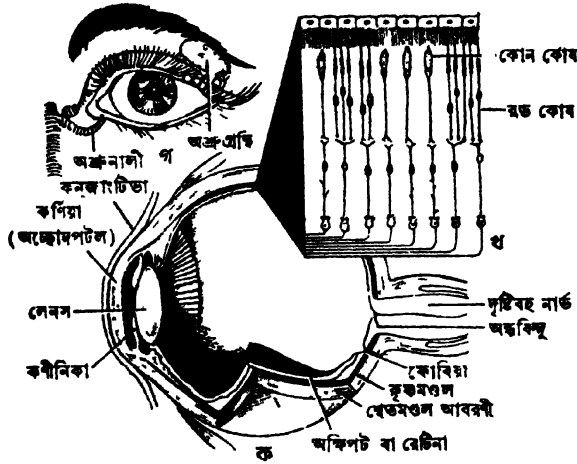
১০নং চিত্র ॥ চক্ষুর আভ্যন্তরীণ গঠনের দৃশ্য—(ক) চক্ষুগোলক, (খ) রড ও কোন কোষের গঠন, ও (গ) অশ্রুগ্রন্থি ও অশ্রুনালির দৃশ্য।

আস্তরণ অশ্রুগ্রন্থির জলীয় নিঃসরণে পিচ্ছিল এবং পরিষ্কার থাকে। উভয় চক্ষুর উপরিভাগের কোণের দিকে একটি করে **অশ্রুগ্রন্থি** (lacrimal gland) থাকে। অশ্রুগ্রন্থির জলীয় নিঃসরণ অশ্রুগ্রন্থির নালিকার মাধ্যমে কনাজাংটিভা স্থলীর মধ্যে বহন করে। **অশ্রুগ্রন্থির** জলীয় নিঃসবণ চক্ষুকে ধুলোবালি, শুষ্কতা এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

অচ্ছোদপটলের মধ্য দিয়ে ছিদ্রযুক্ত কালো রঙের পর্দা দেখা যায় তাকে **কনীনিকা** বা **আইরিস** (iris) বলে। চক্ষু গোলকের মধ্যস্তরটি কালো রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে চোখের মণি বা লেন্সের উপরদিকে অসম্পূর্ণ থেকে ছিদ্রের সৃষ্টি করে। কনীনিকার অভ্যন্তরের ছিদ্রটিকে **তারারন্ধ্র** (pupil) এবং কনীনিকার পেশীর সংকোচন বা প্রসারণের ফলে তারারন্ধ্র বড় বা ছোট হয়। কম আলোতে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর করার জন্য অধিক আলোর প্রয়োজনে তারারন্ধ্র কনীনিকা পেশীর প্রসারণের ফলে বড় হয়, আবার অধিক আলোতে কনীনিকা পেশীর সংকোচনের ফলে তারারন্ধ্র ছোট হয়ে কম আলো প্রবেশ করতে দেয়। চক্ষু গোলকের পশ্চাৎ অঞ্চলের মধ্য স্তরটিকে **কৃষ্ণমণ্ডল** (choroid coat) বলে। এই স্তরের অভ্যন্তরের চোখের মধ্যে আলোক সংবেদনশীল স্তরটিকেই **অক্ষিপট** বা **রেটিনা** (retina) বলে। এই স্তরে আলোক-গ্রাহক নার্ভকোষ (rod) এবং কোন (cone) থাকে এবং ক্যামেরার ফিল্মের মত কাজ করে।

তারারন্ধ্রের পরে পেশী দ্বারা সংযুক্ত স্বচ্ছ, গোলাকার, উত্তল বস্তুকে **চোখের মণি** বা **লেন্স** (lens) বলে। অচ্ছোদপটল ও মণির মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্বচ্ছ, তরল জলীয় পদার্থ—**অ্যাকুয়াস হিউমার** (aqueous humour) এবং মণি ও অক্ষিপটের অন্তর্বর্তী অঞ্চল মধ্যে জেলির মত গাঢ় কিন্তু অতিস্বচ্ছ জলীয় পদার্থ—**ভিট্রিয়াস হিউমার** (vitreous humour) থাকে। অক্ষিপটের প্রতি রড এবং কোন কোষ থেকে বিভিন্ন সংবেদী নিউরোনের অ্যাক্সনগুলি মিলিত হয়ে অক্ষিগোলকের পশ্চাতে **দৃষ্টিবহ নার্ভ** বা **অপটিক নার্ভ** উৎপন্ন করে। এই নার্ভ মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে অনুভূতি বহন করে।

মানুষের চক্ষু এবং ক্যামেরার তুলনা : মানুষের চোখের গঠন অনুযায়ী ক্যামেরা তৈরী হলেও, কোন ক্যামেরাই চোখের মত উন্নত এবং শক্তিশালী নয়। চোখের কৃষ্ণমণ্ডল আলোর প্রতিফলন রোধ করায় ক্যামেরার অভ্যন্তরে কালো প্রলেপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কনীনিকার সাথে ক্যামেরার মধ্যচ্ছদা (diaphragm), তারারন্ধ্রের সাথে ক্যামেরার আলো প্রবেশের ছিদ্র এবং চোখের মণি ক্যামেরার লেন্সের সাথে তুলনীয়। অক্ষিপট ক্যামেরার ফিল্মের মত বস্তুর প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। এই প্রতিবিম্ব ক্যামেরার মধ্যে ফিল্মের মত অক্ষিপটে উল্টোভাবে পড়লেও আমরা দৃষ্টিকেন্দ্রের সাহায্যে তা সোজা দেখি।

অক্ষিপটে আলোর অনুভূতি : অক্ষিপটে **রড** ও **কোন** নামক আলোক সংবেদনশীল কোষ ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। **রড কোষ মৃদু আলোতে বর্ণহীন অনুভূতির এবং কোন কোষ উজ্জ্বল আলোতে বর্ণময় বা সাদা উভয় প্রকার আলোতে স্পষ্ট প্রতিবিম্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে।** রড কোষের মধ্যে রডপসিন্ নামক প্রোটীন গঠিত রঞ্জক পদার্থ সূর্যের আলোয় বিরঞ্জিত বা বর্ণহীন হয় এবং অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে ; এজন্য কম আলোতে বা অন্ধকারে দেখার পক্ষে এই বস্তুটি উপযুক্ত। রডপসিন্ উৎপাদনে ভিটামিন A প্রয়োজন হয়, এজন্য ভিটামিন A-র অভাবে রডপসিন্ উৎপাদন না হলে **রাত্র্যান্ধতা রোগ** দেখা দেয়। অক্ষিপটে কোন নামক কোষ রড কোষের চেয়েও অধিক পরিমাণে থাকে এবং এই কোষ চোখের মণির বিপরীতে **ফোভিয়াতে** (fovea) সর্বাধিক থাকে। এই কোষগুলি বিভিন্ন প্রকারের এবং প্রত্যেক প্রকার এক একটি বর্ণ যথা, লোহিত, সবুজ ও নীল বর্ণের আলো শোষণ করতে পারে। নেত্র গোলকের পশ্চাৎ অঞ্চলে অক্ষিপটের একস্থানে প্রায় এক লক্ষ নিউরোনের অ্যাক্সন্ বক্র হয়ে দৃষ্টিবহ নার্ভ উৎপন্ন করে, সেখানে রড ও কোন কোষ না থাকায় কোন প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় না, এই স্থানকে **অন্ধবিন্দু** (blind spot) বলে।

দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) **:** বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, পক্ষী ও অন্যান্য কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী তাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের কোন বিশেষ অংশে অবস্থিত বস্তুর উপর উভয় চক্ষু দ্বারা একই সঙ্গে ফোকাস্ করতে পারে। এর ফলে দর্শকের দৃষ্টির পাল্লার মধ্যে কোনও বস্তুর নিকট বা দূরের চলন বুঝতে বা দর্শক তার থেকে বস্তুটির দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে।

উপযোজন (Accommodation) : চোখের মণি বা লেন্স তারারন্ধ্রের পশ্চাতে ঝুলন্ত সন্ধিবন্ধনীর (suspensory ligament) দ্বারা স্থির থাকে। সাধারণ অবস্থায় ঝুলন্ত সন্ধিবন্ধনী টানটান থাকায় মণির আকার চেটালো হয়। কিন্তু সন্ধিবন্ধনীর পেশী সংকোচনের ফলে সন্ধিবন্ধনী অনেকটা আলগা হয়ে মণির আকার অনেকটা গোলীয় হয়। এই অবস্থায় চোখের দৃষ্টি দূর বস্তু থেকে নিকট বস্তুতে নিবদ্ধ হয়। চোখের এই পরিবর্তনকে উপযোজন বলে।

(৬) **শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ)** : মানুষের ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়কে কর্ণ বলে। কর্ণ তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ।

(১) **বহিঃকর্ণ** : এই অংশটি কর্ণের বাইরের অংশ এবং কর্ণছত্র ও বহিঃশ্রবণ নালী (external auditory canal) দ্বারা গঠিত। বাইরের শব্দতরঙ্গ কর্ণছত্রের দ্বারা গৃহীত ও বহিঃশ্রবণ নালী দ্বারা আরও ঘনীভূত হয়ে মধ্যকর্ণের কর্ণপটহে আঘাত করে।

(২) **মধ্যকর্ণ** : **কর্ণপটহ** (Tympanic membrane) : তিনটি পরস্পর-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি যথাক্রমে **ম্যালিয়াস** (malleus), **ইনকাস** (incus) ও **স্টেপিস** (stapes) এবং **ইউস্টেকিয়ান নালীর** সংযোগ দ্বারা গঠিত। ইউস্টেকিয়ান নালী
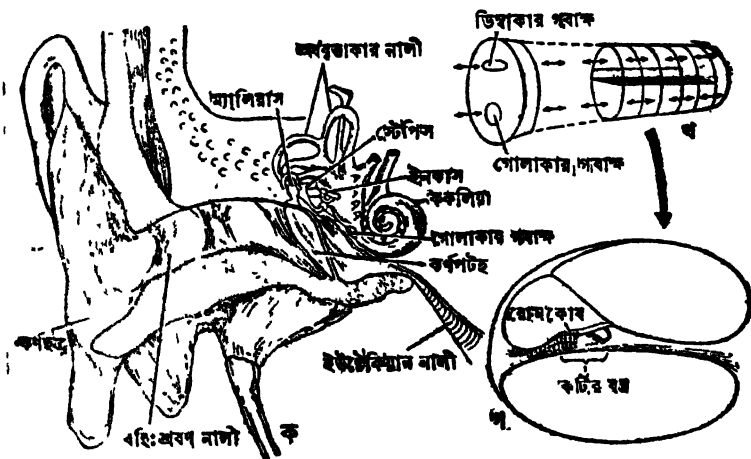
১১নং চিত্র ॥ (ক) কর্ণের বিভিন্ন অংশের অন্তর্গঠনের দৃশ্য, (খ) ককলিয়ার আভ্যন্তরিক গঠন ও (গ) ককলিয়ার প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে কর্টির যন্ত্র দেখান হয়েছে।

মধ্যকর্ণকে গলবিলের সাথে যুক্ত করে এবং এর দ্বারা বাইরের সাথে মধ্যকর্ণের অভ্যন্তরের বায়ু চাপ সমান রাখে। শব্দের দ্বারা বায়ুতে যে কম্পনের উদ্ভব হয় তা ঘনীভূত হয়ে কর্ণপটহে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তা

কর্ণপটহের সাথে যুক্ত তিনটি অস্থির দ্বারা অন্তঃকর্ণে বাহিত হয়। ঠাণ্ডা লেগে বা কোনও রোগের আক্রমণে ইউস্টেকিয়ান নালীর স্ফীতি ঘটলে কর্ণপটহে বায়ুর চাপ অধিক হওয়ার কানে কম শুনতে পাওয়া যায়।

(৩) **অন্তঃকর্ণ :** কর্ণের এই অংশ শামুকের খোলার মত পাকানো **ককলিয়া** (cochlea) নামক শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনটি **অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী** (semi-circular canals) দ্বারা গঠিত। ককলিয়ার অভ্যন্তর নালীর মত এবং এর মধ্যে তরল বস্তু—**লসিকা** থাকে। ককলিয়ার অভ্যন্তরের সমগ্র দৈর্ঘ্যে একটি অস্থিময় প্লেট এবং সরু টিউব থাকায় ককলিয়া দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়েছে। শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থির দ্বারা ককলিয়ার **ডিম্বাকার গবাক্ষে** (oval window) প্রবাহিত হয় এবং এই প্রবাহ ককলিয়া বাইরের প্রকোষ্ঠের তরল লসিকায় কম্পন সৃষ্টি করে। এর ফলে **গোলাকার গবাক্ষ** (round window) বাইরে এবং ভিতরে যেতে-আসতে থাকে।

ককলিয়ার অভ্যন্তরের মধ্য প্রকোষ্ঠে **কর্টির যন্ত্রে** (organ of Corti) যে সব হাজার হাজার রোমের আকারের সংবেদনশীল কোষ আছে তারা কম্পন গ্রহণ করে। এর ফলে বৈদ্যুতিক আবেগ সৃষ্টি হয় এবং তা সংবেদী নার্ভ আবেগরূপে—**শ্রুতিবহ নার্ভের** (auditory nerve) মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রুতিকেন্দ্রে উপনীত হয় এবং মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি ঘটে।

ভারসাম্য রক্ষা : মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডীদের শ্রবণ ব্যতীত দেহের ভারসাম্য রক্ষা অন্তঃকর্ণের মাধ্যমে ঘটে। ককলিয়ার উপরদিকে দুটি পরস্পরযুক্ত লসিকা-ভর্তি অর্ধচন্দ্রাকার অস্থি প্রণালী এবং অভ্যন্তরে বহু রোমের আকারের সংবেদনশীল কোষ আছে। এই রোমের আকারের কোষগুলির কাছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা তৈরী বহু অতি ক্ষুদ্র দানার মত বস্তু আছে। মহাকর্ষীয় বলের আকর্ষণে এই দানাগুলি রোম-গুলিকে নিচের দিকে চেপে রাখে। কোনও কারণে দেহ বা মস্তিষ্ক অন্যদিকে ঘোরালে এ দানাগুলি স্থানান্তরিত হয়ে নার্ভের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে এবং এই আবেগ মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট বিশেষ অংশে উপনীত হলে আমরা দেহের ভারসাম্য বুঝতে পারি।

———

...... বিষয়ে সাধারণ ধারণা
(General idea about Hormones)

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন যন্ত্রের এবং তন্ত্রের মধ্যে সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের জন্য সংযোগ এবং বিভিন্ন অঙ্গাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন অত্যাবশ্যক। এই প্রকার সংযোগ সাধন দুটি ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে নার্ভতন্ত্র এবং দ্বিতীয় তন্ত্রটিকে এণ্ডোক্রিনতন্ত্র বলে। এণ্ডোক্রিন তন্ত্রের অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরণের ফলে হরমোন নামক উত্তেজক রস উৎপন্ন হয়। ইহা এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। হরমোন দ্বারা জীবদেহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, কোষের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, কোষের আবরণীর মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর পরিবহন, ক্ষরণ এবং বৃদ্ধি ঘটানো, বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বিধান দ্বারা চালনা করে। এজন্য হরমোন একস্থানে উৎপন্ন হয়ে দূরবর্তী স্থানে বাহিত হয়ে বিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করে বলে একে **রাসায়নিক সংযোগ সাধক** বলে। নার্ভতন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ সাধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ঘটে কিন্তু এই ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এণ্ডোক্রিন তন্ত্রের নিঃসরণ হরমোন একস্থানে উৎপন্ন এবং অন্যস্থানে বাহিত হয়ে যে ক্রিয়া করে তার স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি : কতকগুলি বিশেষ আকার ও কার্যসম্পন্ন কোষ দলবদ্ধ হয়ে গ্রন্থি উৎপন্ন করে। এই সব গ্রন্থি দেহের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য রক্ত বা লসিকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করে সংশ্লেষণ করে। অধিকাংশ গ্রন্থির মধ্যে যে নালী থাকে তার দ্বারা গ্রন্থির উৎপন্ন রস বাহিত হয়। এই প্রকার গ্রন্থিকে **নালিকাযুক্ত গ্রন্থি** বা **বহিঃস্রাবী গ্রন্থি** (exocrine gland) বলে। উদাহরণ—মুখের মধ্যে অবস্থিত লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থি, উদরে অবস্থিত যকৃৎ ও বিভিন্ন আন্ত্রিক গ্রন্থি ইত্যাদি।

আবার কয়েকটি গ্রন্থি আছে যাদের মধ্যে নালী না থাকায়, তাদের নিঃসরণ সরাসরি রক্তের মধ্যে বাহিত হয়। এই প্রকার গ্রন্থিকে **অনাল গ্রন্থি** (ductless gland) বা **অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থি** (endocrine gland) এবং এই সকল গ্রন্থির নিঃসরণকে প্রখ্যাত প্রাণী শারীরতত্ত্ববিদদ্বয় বেলিস (Bayliss) এবং স্টারলিং (Starling) ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে **হরমোন** (গ্রীক শব্দ হরমাউ মানে আমি জাগ্রত করি) নামকরণ করেন।

হরমোন কাকে বলে : হরমোন একপ্রকার জৈব যৌগ যা দেহের এক অংশের কোষ দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার পর দেহরস দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য অংশের কোষের কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

হরমোন উৎপত্তির স্থান ও কার্য :

উৎপত্তির স্থান : হরমোন যেস্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থান থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানে কার্য করে। (অনেক হরমোন আছে, যথা—পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রীন,

ক্ষুদ্রান্তের সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন ইত্যাদি যেস্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থানেই কার্য করে, এদের স্থানীয় হরমোন বলে)। **কার্য:** (১) অতি অল্প পরিমাণ হরমোন দেহের বিভিন্ন কার্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। (২) হরমোন যে গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় সেই গ্রন্থি ব্যতীত অন্য কোথাও সঞ্চিত হয় না এবং কার্য করার পরেই রেচিত হয়। (৩) দেহের বিভিন্ন কলার আয়তন বৃদ্ধি ও কার্যকলাপগুলিকে উদ্দীপিত করে অথবা বাধা দান করে। (৪) হরমোন ভিটামিনের মত কোনও কলার উৎসেচকের সহযোগী উৎসেচকরূপে কাজ করে বলে এগুলিকে **জৈব অনুঘটকও** বলা হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার হরমোন

উদ্ভিদ দেহে নার্ভ বা নার্ভতন্ত্র নেই, এজন্য দেহের বিভিন্ন প্রান্তে কোনও দ্রুত সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। লজ্জাবতী লতার পাতা গুটিয়ে যাওয়া তাদের কোষের রসস্ফীতির পরিবর্তনের ফলে ঘটে এবং কোনও উদ্দীপনায় কোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যে আবেগ সঞ্চার হয় তার ফলে প্রাণীদের নার্ভতন্তুর মত বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। **উদ্ভিদের প্রতিবেদন বা সাড়াজাগানো এবং বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন উদ্ভিদের দেহে উৎপন্ন হরমোন নামক রাসায়নিক সংযোগ সাধক বস্তুর দ্বারা ঘটে।** উদ্ভিদের বিভিন্ন হরমোনের মধ্যে অক্সিন, জিব্বারেলিন এবং কাইনিন ইত্যাদি জৈবিক ক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ হরমোনের বর্ণনা:

(ক) **অক্সিন (Auxin): আবিষ্কারের ইতিহাস**—উদ্ভিদের অগ্রমুকুল কেটে ফেললে উদ্ভিদের আলোকবর্তী চলন হয় না। এই ঘটনা বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী **স্যার চার্লস ডারউইন** এবং তাঁর পুত্র **ফ্রান্সিস ডারউইন** ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। তাঁরা আরও দেখেন যে, যদি অগ্রমুকুলের চারদিক কোন অস্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তাহলেও আলোকবর্তী চলন হয় না। আলোকবর্তী চলন ঠিক অগ্রমুকুলের পরের অংশে ঘটে। তাঁরা এই সকল পরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উদ্ভিদের অগ্রমুকুল আলোকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে কোনও-না-কোনও রূপে পরবর্তী অঞ্চলের বক্রতার মাধ্যমে সাড়া দান করে। তাঁরা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, উদ্ভিদের অগ্রস্থ মুকুল কোনও না-কোনওভাবে বৃদ্ধিক্ষু অঞ্চলের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে ড্যানিস্ উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ববিদ **বয়সেন জেনসেন্** (Boysen Jensen) প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের সংযোগরক্ষাকারী পদার্থ এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু। এই রাসায়নিক বস্তু উদ্ভিদের অগ্রমুকুল থেকে ক্রমশ নিচের অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়। **এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট** (F. W. Went) নামক আরেক বিজ্ঞানী অনেকগুলি নবঅঙ্কুরিত ওটের কোলিওপটাইল (একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজের ভ্রূণমুকুল আবরণী)

থেকে রাসায়নিক বস্তুটি নিষ্কাশন করেন। তিনি এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কুরিত ওটের কোলিওপটাইল কেটে সেটি আগরপিণ্ডের উপর স্থাপন করেন। কয়েক ঘণ্টা পরে সেই আগরপিণ্ড ওটের কাটা অংশের উপর স্থাপন করে দেখেন যে, কাণ্ডটির বৃদ্ধি ঘটছে। এর দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আগরপিণ্ডের মধ্যে কোলিওপটাইল থেকে রাসায়নিক বস্তুটি ব্যাপন ক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়ে বৃদ্ধির সহায়তা করছে। পরে এই রাসায়নিক বস্তুটির নাম দেওয়া হয় **অক্সিন** (auxin)।
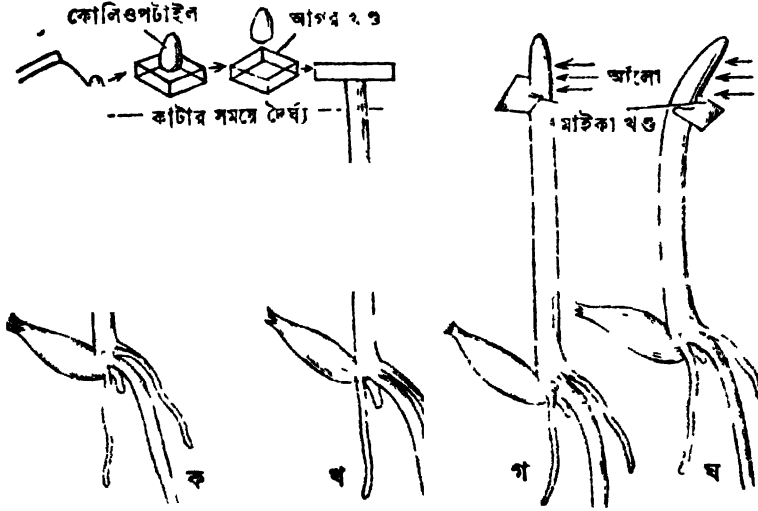
১২নং চিত্র ॥ (ক, খ) ওয়েন্টের পরীক্ষা—ওটের কোলিওপটাইল অক্সিন উৎপন্ন করে। (ক) এই অংশটি কেটে আগরপিণ্ডের উপর রাখলে ব্যাপন ক্রিয়ায় আগরের মধ্যে প্রবেশ করে, (খ) পরে এই আগরপিণ্ডটি ওটের কাটা অংশের উপর রাখলে কাণ্ডের বৃদ্ধি শুরু হয়। (গ, ঘ) জেনসেনের পরীক্ষা (গ) কোলিওপটাইলের আলোর বিপরীত দিকের অংশে অক্সিন উৎপন্ন হয়ে নিম্নের দিকে কোষ বৃদ্ধি ঘটায়। এই অংশে মাইকা খণ্ড প্রবেশ করালে অক্সিন প্রবাহিত হতে না পেরে বৃদ্ধি হয় না, (ঘ) আলোর দিকে মাইকা খণ্ড প্রবেশ করালে বিপরীত দিকে অক্সিন উৎপন্ন হয়ে বৃদ্ধি ঘটায়।

উৎপত্তির স্থান : পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে অক্সিন কাণ্ডের অগ্রমুকুলে অধিক পরিমাণে এবং মূলের অগ্রবর্তী অঞ্চলে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অক্সিনের প্রকার : প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বৃদ্ধিকারক অক্সিন আছে। অক্সিন সাধারণত অঙ্কুরিত বীজ, চারাগাছ, বিটপের বর্ধনশীল অংশ ইত্যাদি থেকে পৃথক করা যায়। রাসায়নিক যোগের বিভিন্নতা অনুযায়ী অক্সিন তিন প্রকারের, যথা—**অক্সিন a, অক্সিন b এবং হেটারো অক্সিন।** তার মধ্যে মানুষের মূত্রে যে প্রকারের অক্সিন পাওয়া যায় সেটি হেটারো অক্সিন এবং তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে **ইনডোল অ্যাসেটিক**

্যাসিড (I. A. A.)। এই প্রকার অক্সিন উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাধিক দেখতে পাওয়া য়।

অক্সিনের বিভিন্ন কার্য : (১) **কোষের আয়তন** বৃদ্ধি কোষ প্রাচীরের নমনীয়তা দ্ধির দ্বারা ঘটে। (২) উদ্ভিদের চলনে সাহায্য : ওয়েন্টের পরীক্ষায় প্রমাণিত য়েছে যে, উদ্ভিদের অগ্রমুকুলের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার বিপরীত দিকে ক্সিনের পরিমাণ বেশী হয়। এইজন্য ঐ অঞ্চলের **কোষ দীর্ঘায়িত হয়ে বৃদ্ধি ঘটে** বং উক্ত অঞ্চলটি বেঁকে আলোর উৎসের দিকে ধাবিত হয়। এই প্রকার চলনকে **ালোকবর্তী** চলন বলে। মূলের ক্ষেত্রে অক্সিনের কিন্তু বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়। ারণ অধিক পরিমাণ অক্সিন কাণ্ডের কোষের বৃদ্ধির সহায়তা করলেও মূলের কোষ দ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে অল্প মাত্রায় এই হরমোন মূলের কোষ বৃদ্ধিতে ামান্য পরিমাণে সহায়তা করে।

(৩) **ফলের বৃদ্ধি এবং বীজহীন ফল উৎপাদন :** গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফুলের র্ভমুণ্ডে পরাগসংযোগের দ্বারা বীজ উৎপন্ন হয় এবং প্রতি বীজের মধ্যে নূতন উদ্ভিদের ্ণ অবস্থান করে। বীজ উৎপন্ন হওয়ার পর পরিণত হওয়ার সময় পরিণত গর্ভাশয় ও লের অন্যান্য অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফল উৎপন্ন করে। বর্তমানে জানা গেছে বীজ থেকে া অক্সিন উৎপন্ন হয় তা ফুলের অন্যান্য অংশের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ফলে পরিণত করে। এমন ক পরাগসংযোগ না ঘটিয়ে কেবলমাত্র অক্সিন প্রয়োগ করেও ফুলের ফল উৎপাদনকারী ংশকে উদ্দীপিত করার দ্বারা ফল উৎপাদন করা যায়। এইভাবে চাষীরা একই সময়ে াজারে ফল সরবরাহের জন্য কমলালেবু বা আপেলের ফুলে অক্সিন প্রয়োগ দ্বারা ফল ৎপাদনের সময় নির্দিষ্ট করে।

(৪) **উদ্ভিদের অগ্রমুকুলের প্রাধান্য রক্ষা :** সচরাচর দেখা যায় যে, অগ্রমুকুলের ৃদ্ধির দ্বারা কাণ্ড দৈর্ঘ্যে াড়ে এবং অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি কাক্ষিকমুকুল ও শাখা-প্রশাখার ৃদ্ধি ঘটতে দেয় না। অগ্রমুকুলের এই প্রকার আধিপত্যকে **অগ্রমুকুলের প্রাধান্য** বলে। ই প্রকার প্রাধান্য পাইন, দেবদারু ইত্যাদি বৃক্ষে দেখা যায়। অনেক গুল্ম বা ঝোপ ৃষ্টিকারী উদ্ভিদের অগ্রমুকুলের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম। যে-সব উদ্ভিদে অগ্রমুকুলে াধান্য দেখা যায়, তাদের অগ্রমুকুল কেটে দিলে পার্শ্ব বা কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধির ারা বহু শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়। এইজন্য বাগানের মালীরা নিয়মিত গাছের ালপালা কেটে ঝোপের সৃষ্টি করে। অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি তার মধ্যে অক্সিন রমোনের নিচের দিকে সঞ্চারণ দ্বারা ঘটে এবং অগ্রমুকুল কাটলে অক্সিন সরবরাহ বন্ধ য়ে কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি শুরু হয়।

গোলআলু বহুদিন যাবৎ সঞ্চয় করার ফলে তার চাষের সময় কেবলমাত্র অগ্রমুকুলের ৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু আলুটিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে লাগালে প্রতিখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত

সুপ্ত মুকুলগুলি অগ্রমুকুলের প্রভাবমুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়। এজন্য চাষীরা আলু চাষের সময় আলুকে কেটে কেটে লাগায়।

(৫) **পাতা ও ফল ঝরানো :** পাতা ও ফল ঝরানো বা পতনে অক্সিন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। পাতা ও ফল অক্সিন যতদিন উৎপন্ন করতে পারে ততদিন কাণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু এই বস্তুর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে পাতা ও ফল ঝরে পড়ে। এই সময় পাতা ও ফলের বৃন্তে একটি কোষস্তর সৃষ্টি হয় যা পাতা ও ফলকে কাণ্ড থেকে শিথিল করে বিচ্যুতি ঘটায়। পূর্বে আপেল বা কমলালেবু উৎপাদনকারীদের এই ফলগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করার আগেই খসে পড়ে অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হত। বর্তমানে চাষীরা অক্সিন স্প্রে করে অসময়ে ফল পড়া বন্ধ করায় তাদের আর্থিক ক্ষতি অনেক কমে গেছে।

(৬) **মূল উৎপাদনে সাহায্য :** অক্সিন্ কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার মধ্যে অস্থানিক মূল উৎপাদন করে। এইজন্য চাষীরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের কাটা শাখা-প্রশাখায় কৃত্রিম অক্সিন্—**সেরাডিক্স** (Seradix) দ্রবণ লাগিয়ে বালির মধ্যে রোপণ দ্বারা দ্রুত মূল উৎপন্ন করে।

(খ) **জিব্বারেল্লিন** (Gibberellin) **:** এই প্রকার উদ্ভিদ হরমোন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী কুরোসোয়া ধানগাছের পরজীবী ছত্রাক জিব্বারেল্লা ফুজিকুরই থেকে আবিষ্কার করেন. পরে বিভিন্ন উদ্ভিদের কোষ ও কলার মধ্যে এই বস্তুর অস্তিত্ব জানা গিয়াছে।

উৎপত্তি স্থান : উদ্ভিদের দেহের সর্বত্র, যথা—মূল. কাণ্ড. পাতা এবং ফলেও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের জলজ উদ্ভিদ কচুরিপানায় এই হরমোন প্রচুর পাওয়া যায়।

জিব্বারেল্লিনের কার্য : (১) এই প্রকার উদ্ভিদ-হরমোন সাধারণত জন্মগত খর্বাকার উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বমধ্য অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে উদ্ভিদের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। (২) জিব্বারেল্লিন উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বমধ্য বৃদ্ধি ব্যতীত মূলের বৃদ্ধি, কাণ্ডের নূতন মুকুল সৃষ্টি এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে। (৩) বাঁধাকপি ও অনেক শাকসব্জিতে জিব্বারেল্লিন প্রয়োগ করে দ্রুত ফুল উৎপন্ন করা যায়। (৪) বীজহীন ফল উৎপাদনও এই হরমোনের সাহায্যে ঘটে।

উদ্ভিদের কাণ্ডের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য এই প্রকার হরমোনের সাথে অক্সিনের কিছু পরিমাণ কার্যগত সাদৃশ্য থাকলেও এরা অক্সিন নয়। কেবলমাত্র এদের আনবিক গঠন যে অক্সিনের মত তা নয়, এরা ওটের কোলিওপটাইল পরীক্ষার অক্সিনের মত আলোকবর্তী প্রতিক্রিয়াও ঘটায় না।

(গ) **কাইনিন বা সাইটোকাইনিন** (Cytokinin) **:** এই প্রকার হরমোন যে স্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থানে অথবা অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। **সাইটোকাইনিনের কার্য :** (১) সাইটোকাইনিন এবং অক্সিন একত্রে উদ্ভিদের ভাজককলার মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনে উদ্দীপনা জাগায়। (২) বীজের মধ্যে অধিক পরিমাণ সাইটোকাইনিন থাকায় অঙ্কুরোদ্গমের পর চারার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। (৩) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের বার্ধক্য রোধ করতে, ভাইরাস-ঘটিত রোগ প্রতিহত করতে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে সাইটোকাইনিন সাহায্য করে। নারকেল জল, আম, কলা এবং অপরিণত ভুট্টা দানায় কাইনিন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

কৃষিকার্যে হরমোনের ব্যবহার : পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাবও প্রকট হচ্ছে। উন্নত মানের জীবনযাত্রা পরিচালনায় সকলের জন্যে সুলভ খাদ্যের প্রয়োজন। এইজন্য কৃষি-বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা উন্নত মানের বীজ ও সার, রোগ ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বস্তুর আবিষ্কার করেছেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষ-আবাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং ফসল উৎপাদনের হারও বেড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন হরমোন সম্বন্ধে গবেষণার সময় জানা গেছে যে, উদ্ভিদের দেহে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বা গবেষণাগারে উৎপন্ন কৃত্রিম হরমোন বা হরমোন জাতীয় রাসায়নিক বস্তুগুলি অনেক কম পরিমাণে সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা খুবই অল্প খরচায় কৃষিকার্যে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। কৃষিকার্যে ও উদ্যানকার্যে বিভিন্ন প্রকার হরমোন ব্যবহৃত হয়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও মূলের দ্রুত বৃদ্ধি কৃষিকার্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কাজে হরমোন কৃত্রিম অক্সিন (2, 4 D , NAA) ব্যবহারের সুফল পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন ফুল ও ফল গাছের শাখা কেটে তাতে অক্সিন ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মূল উৎপাদন দ্বারা চারা তৈরী করা হয়। কলম দিয়ে চারা তৈরী করতে গেলে হরমোন ব্যবহারের দ্বারা চারা তৈরী করার চেয়ে অধিক সময় লাগে। আমরা যে সকল উদ্ভিদের মূল খাদ্যরূপে ব্যবহার করি (মূলা, শালগম, গাজর, রাঙা আলু ইত্যাদি) কৃত্রিম অক্সিন জাতীয় হরমোন (ইনডোল বিউটিরিক অ্যাসিড —IBA) ব্যবহারে সুগঠিত হয়। অক্সিন প্রয়োগে অকালে ফুল ও ফল ঝরা বন্ধ করা এবং বীজহীন ফল উৎপন্ন করা যায়। ফুল বা ফল ঝরানো বন্ধ হলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়ে চাষীর প্রচুর লাভ হয়। জিব্বারেলিন প্রয়োগ করে পাট গাছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যায় এবং পাটের আঁশও বড় হয়। জমিতে আগাছা জন্মালে ফসল উৎপন্ন হয় না এজন্য জমিতে আগাছা নির্মূল করা উচিত। কিন্তু জমির আগাছা পরিষ্কার করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আগাছা নির্মূলে 2, 4 D নামক কৃত্রিম হরমোন ব্যবহার করে আগাছা ধ্বংস করা যায়। এইভাবে কৃষিকার্যে বিভিন্ন হরমোন ব্যবহার করে প্রচুর সুফল পাওয়া যায়।

প্রাণিদেহের বিভিন্ন হরমোন

প্রাণীদের দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা ও যন্ত্রাদির মধ্যে সংযোগ সাধনের এবং শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য দুটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রথম ব্যবস্থায় নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন সহকারীকেন্দ্র, উপ-প্রধান কেন্দ্র ও প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ দ্বারা সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় রাসায়নিক সংযোগ সাধক বস্তু হরমোন দেহের কোনও এক অংশের অনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। পরে রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে দেহের অন্য অংশের কোষ ও কলার মধ্যে বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রিত করে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হরমোন : বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, যথা—গোলকৃমি, অঙ্গুরীমাল, শামুক এবং সন্ধিপদ ইত্যাদির দেহেও হরমোনের অস্তিত্ব জানা গেছে। বিশেষত পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন প্রকার হরমোন ডিম্ব উৎপাদনের জন্য উত্তেজনা সঞ্চার, দেহের বর্ণপরিবর্তন, বৃদ্ধি ও রূপান্তরের কার্য করে। এই প্রকার হরমোন উৎপাদনে পতঙ্গের মস্তিষ্কের নার্ভকোষ অংশগ্রহণ করায় অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থি ও নার্ভতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রমাণিত হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হরমোন : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মানুষের বিভিন্ন অন্তঃনিস্রাবী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি (endocrine glands) যথাক্রমে—পিট্যুইটারী বা অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি, থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি, প্যারাথাইরয়েড বা উপগলগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় (দ্বৈপিক অংশ), অ্যাড্রিনাল বা কটিগ্রন্থি, পাকস্থলী ও আন্ত্রিক ঝিল্লির বিভিন্ন গ্রন্থি, মুষ্ক ও ডিম্বগ্রন্থি।

পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্য নির্ধারণ : বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্য নির্ধারণ করা হয়, এই উপায়গুলি যথাক্রমে—(১) যে গ্রন্থিকে অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃনিস্রাবী বলে মনে হয় সেটিকে প্রাণীর দেহ থেকে কেটে বাদ দেওয়া। (২) এই গ্রন্থি দেহ থেকে বাদ দেওয়ার ফলে কি পরিবর্তন বা উপসর্গ দেখা দেয় তা লক্ষ্য করা। (৩) পরে যে গ্রন্থি বাদ দেওয়া হয়েছে তা পুনর্যোজনের ফলে উপসর্গগুলি দূরীভূত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা। (৪) যদি উপসর্গগুলি দূরীভূত হয় তা হলে ঐ গ্রন্থির নিঃসরণের ন্যায় সক্রিয় নির্যাস তৈরী করে প্রয়োগ করা। সাধারণত এই নির্যাস অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হতে তৈরী করা হয়। (৫) অনেক সময় এই নির্যাসকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করে, তার মধ্যে কোন্ রাসায়নিক বস্তু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অভাবজনিত উপসর্গ দূর করতে সমর্থ তা নির্ণয় করা হয়। (৬) এই সঙ্গে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অধিক (hyper) বা অল্প (hypo) নিঃসরণের দ্বারা যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তা লক্ষ্য করতে হয়। মানুষের দেহে এই প্রকার বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্য পরীক্ষা করার আগে কুকুর বা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে সহজেই সফলতা লাভ করা যায়।

মানবদেহে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বর্ণনা ও অবস্থান : মানুষের মস্তক হতে বস্তিদেশ পর্যন্ত দেহের বিভিন্ন অংশে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি অবস্থিত।

(ক) **অধোমস্তিষ্ক বা পিট্যুইটারী গ্রন্থি** মস্তিষ্কের নীচের এবং তালুর উপরে একজোড়া অতিসুরক্ষিত অস্থির দ্বারা গঠিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত। (খ) একজোড়া **গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি** গ্রীবাদেশে শ্বাসনালীর সম্মুখ-ভাগে একটি সংকীর্ণ যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। (গ) চারটি **উপগলগ্রন্থি** বা **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** গ্রীবাদেশে থাইরয়েডের পশ্চাতে বা মধ্যে অবস্থিত। (ঘ) দেহের উদরগহ্বরের মধ্যে **পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লির অন্তঃক্ষরা** গ্রন্থি এবং (ঙ) **অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহ্যান** গ্রন্থি থাকে। (চ) **কটিগ্রন্থি** বা **অ্যাড্রেনাল** গ্রন্থি দুটি বৃক্কের উপরে থাকে। (ছ) **স্ত্রী ও পুংগ্রন্থি** বস্তিদেশের মধ্যে অবস্থিত (জ) বর্তমানে জানা গেছে যে, মস্তিষ্কে অবস্থিত **পিনিয়াল বডি** ও গ্রীবাদেশের নীচে অবস্থিত **থাইমাস** গ্রন্থিও হরমোন উৎপন্ন করে।

১৩নং চিত্র ॥ মানুষের দেহের মধ্যে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থানের দৃশ্য।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির গঠন ও কার্য

(ক) **গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি** (Thyroid gland) :

গঠন : এই প্রকার গ্রন্থি বহু গোলাকার আণুবীক্ষণিক স্থলি দ্বারা গঠিত এবং এই সব স্থলিকে থাইরয়েড ফলিকল বলে। ফলিকলের মধ্যে গ্রন্থির সক্রিয় পদার্থ থাইরোক্সিন (thyroxine) হরমোন সঞ্চিত থাকে। থাইরোক্সিনের প্রধান উপাদান আয়োডিন।

থাইরোক্সিনের কার্য : (১) থাইরোক্সিন দেহের বিপাক ক্রিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে অধিক থাইরোক্সিন উৎপন্ন হলে কোষের অধিক শ্বাসকার্যের ফলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে এবং এই কার্যে অধিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। (২) দেহের বৃদ্ধি ও যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটায়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাইরোক্সিনের কার্য বয়স, লিঙ্গ এবং অন্যান্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। **থাইরোক্সিনের কম ক্ষরণহেতু** (Hypothyroidism) **মানুষের বিভিন্ন রোগ :** (১) **গলগণ্ড :** বহু স্থানের মাটিতে এবং জলে আয়োডিনের

পরিমাণ কম থাকে। যেমন, আমাদের দেশের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। এই সব জায়গার প্রাণী ও মানুষের খাদ্যে এবং পানীয়ে আয়োডিনের অভাব হেতু থাইরয়েড গ্রন্থির দীর্ঘস্থায়ী স্ফীতি ঘটে। এর ফলে গলার কাছটি পিণ্ডাকার হয়ে ফুলে ওঠে; এই রোগকে **গলগণ্ড** বা **গয়টার** (Goiter) বলে। আয়োডিনযুক্ত খাদ্য ও জল খেলে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। (২) **ক্রেটিনিজম ঃ** বাল্যাবস্থায় এই গ্রন্থির ক্ষরণ কম হলে দেহের ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না বলে বামন হয়ে থাকে, গায়ের চামড়া পুরু আঙ্গুলের আকার মোটা, বেঁটে এবং মাথায় চুল জন্মায় না। দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে চর্বি জমে এবং বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনের প্রকাশ দেখা যায় না। এই প্রকার বামনদের হাবাগোবা বলে মনে হয়। শিশুকালে থাইরোক্সিনের অভাব হেতু রোগকে **ক্রেটিনিজম** (Cretinism) বলে। (৩) **মিক্সইডিমা ঃ** অধিক বয়সে থাইরোক্সিন নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস পেলে দেহে চর্বি জমে চামড়া পুরু হয় এবং চোখ-মুখ ফুলে মোঙ্গলীয় মুখাকৃতি ধারণ করে। মাথার চুলের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং খসখসে হয়। বিপাক ক্রিয়া কম হওয়ায় দেহের তাপমাত্রা বেশ কম, চোখ ঢুলুঢুলু, দেহে আলস্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির অভাব দেখা যায়। এই প্রকার রোগকে **মিক্সইডিমা** (Myxoedema) বলে।

১৪নং চিত্র ॥ অধিক থাইরোক্সিন ক্ষরণ হেতু এক্সপ্থ্যালমিক গয়টারের দৃশ্য।

থাইরোক্সিনের অধিক ক্ষরণ হেতু রোগ (Hyperthyroidism) **ঃ** অধিক থাইরোক্সিন ক্ষরণ হলে দেহের বিপাকক্রিয়া বেড়ে যাওয়ায় হৃদ্স্পন্দন ও দেহের তাপমাত্রার পরিমাণ বেড়ে যায়। থাইরোক্সিন ক্ষরণের পরিমাণ অত্যাধিক হলে অধিক বিপাকের জন্য দেহ কৃশ হতে থাকে, চক্ষু গোলক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অত্যাধিক বৃদ্ধি হেতু গলগণ্ড দেখা দেয়। এই রোগকে **গ্রেভের রোগ** বা **এক্সপ্থ্যালমিক গয়টার** (Exopthalmic goiter) বলে।

(খ) অগ্ন্যাশয় (Pancreas) গঠন ঃ অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দলবদ্ধভাবে বহু গ্রন্থি উৎপন্ন করে। এই গ্রন্থিগুলিকে **ল্যাঙ্গারহ্যানের ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ** (islets of Langerhans বলে। মানুষের অগ্ন্যাশয়ে এই প্রকার দলবদ্ধ কোষ লক্ষাধিক আছে। এই কোষগুলির নিঃসরণ অগ্ন্যাশয়ের নালীর সাথে যুক্ত নয়। সরাসরি রক্তের সাথে এদের নিঃসরণ বাহিত হয়। এজন্য এগুলিকে **অনালগ্রন্থি** বা **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। এই প্রকার গ্রন্থি যে দুটি হরমোন ক্ষরণ করে তাদের **ইনস্যুলিন** (insulin) এবং **গ্লুকাগন** (glucagon) বলে।

ইনস্যুলিন আবিষ্কারের ইতিহাস : ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিং এবং মিনকোওয়াস্কি নামে দুজন জার্মান চিকিৎসক কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিয়ে পরিপাকে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময় তাদের পরীক্ষাগারের একজন সহকারী ঐ কুকুরের মূত্রে অনেক পিঁপড়া ঘুরছে দেখতে পান। সাধারণ অবস্থায় কুকুরের মূত্রে গ্লুকোজ না থাকলেও এই কুকুরের মূত্র পরীক্ষায় বেশ অধিক পরিমাণে গ্লুকোজ আছে তা তাঁরা দেখতে পান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং (Dr. Frederik Banting) অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি অংশ নষ্ট করে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ সংগ্রহ করেন। এই বস্তুটিই দেহের শ্বেতসার বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন বা **ইনস্যুলিন**।

ইনস্যুলিনের কার্য : স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় আমাদের দেহে প্রতি ১০০ মিলি লিটার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ প্রায় ৮০—১২০ মিলিগ্রাম। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে প্রায় ১৬০ মিলিগ্রাম হয়ে যায়। কিন্তু ইনস্যুলিন রক্তের এই অধিক গ্লুকোজ যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেন এবং স্নেহে পরিবর্তিত করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখে।

ইনস্যুলিন কম ক্ষরণের ফল : অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে ইনস্যুলিনের কম ক্ষরণ হলে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। এই অধিক পরিমাণ গ্লুকোজ যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয় না বরং গ্লাইকোজেন এবং পেশীর স্নেহ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। বৃক্কের রেণাল টিউবিউল রেচনের সময় সম্পূর্ণ পরিমাণ গ্লুকোজ পুনর্বার শোষণ করতে না পারায় মূত্রের সাথে গ্লুকোজ বেরিয়ে যায়। ফলে দেহের শক্তিপ্রদায়ক গ্লুকোজের অভাব হয় এবং চিকিৎসা না করালে রোগী ক্রমশ দুর্বল ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, অবশেষে মারা যায়। ইনস্যুলিনের অভাবজনিত এই রোগকে **মধুমেহ** বা **বহুমূত্র রোগ** (diabetes mellitus) বলে।

ইনস্যুলিনের সাহায্যে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা : বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইনস্যুলিন ইনজেকশন দিলে শ্বেতসার বিপাক দ্রুত হয়ে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়। ওষুধের দোকানে যে ইনস্যুলিন বিক্রি হয় তা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির অগ্ন্যাশয় থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চিকিৎসার উপযোগী করা হয়।

মিশ্রগ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ের অধিকাংশ অংশে উৎসেচক নিঃসরণকারী প্রণালীযুক্ত গ্রন্থি এবং হরমোন ক্ষরণকারী অনালগ্রন্থি থাকায় এটিকে মিশ্রগ্রন্থি বলে।

(গ) **কটিগ্রন্থি বা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি** (Adrenal gland) **:** দেহের মধ্যে দুটি বৃক্কের উপরে অ্যাড্রিনাল বা কটিগ্রন্থি অবস্থিত। উভয় গ্রন্থিতে প্রচুর পরিমাণ রক্ত সরবরাহ হয়। প্রতি গ্রন্থির অভ্যন্তরে দুটি অংশ যথাক্রমে **বহিরাংশ** বা **কর্টেক্স** (cortex) এবং **কেন্দ্রাংশ** বা **মেডালায়** (medulla) বিভক্ত। উভয় অংশই বিভিন্ন প্রকার হরমোন ক্ষরণ করে।

কটিগ্রন্থির কেন্দ্রাংশের হরমোন : কেন্দ্রাংশের (মেডালার) কোষগুলি সম্ভবত নার্ভকোষের পরিবর্তিত অবস্থা, এজন্য কেন্দ্রাংশকে নার্ভতন্ত্রের অংশ বলে ধরা হয়। এই অংশে দুই প্রকারের হরমোন ক্ষরণ হয় তার মধ্যে **অ্যাড্রিনালিনের** (Adrenaline) ক্ষরণ **নরঅ্যাড্রিনালিন** (Noradrenaline) অপেক্ষা অধিক।

(১) **অ্যাড্রিনালিন :** সাধারণত কোনও ব্যক্তির মানসিক চাপবৃদ্ধি, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদিতে বা আহত অবস্থায় এই হরমোন অত্যধিক পরিমাণে ক্ষরণ হয়। অ্যাড্রিনালিন রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র বাহিত হয়ে হৃদ্‌যন্ত্র সঞ্চালনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এই হরমোনের প্রভাবে দেহের ত্বক ও আন্তর যন্ত্রের রক্ত সরবরাহ হ্রাস পেয়ে অস্থি, পেশী, করোনারী ধমনী, যকৃৎ ও মস্তিষ্কে বাহিত হয়। ক্লোমশাখার (bronchus) শৈথিল্যের ফলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু চলাচল সহজ হয় এবং এই সঙ্গে চক্ষু তারকার কুঞ্চন ঘটে এবং গায়ের রোম খাড়া হয়। (২) **নরঅ্যাড্রিনালিন।** ধমনীকার সংকোচনে উদ্দীপনা ঘটিয়ে রক্তচাপ বাড়ায়।

অ্যাড্রিনালিন হরমোন : দেহকে প্রচণ্ড হিংসাত্মক শারীরিক কার্যের জন্য প্রস্তুত করে। যুদ্ধ বা অন্য কোন সংকটকালে মানুষের শৌর্য, বীর্য, সাহস ইত্যাদি এই হরমোনের কাজের ফলে ঘটে বলে একে **'সংকটকালীন বা যুদ্ধ, ত্রাস ও পলায়ন'** (fright, fight and flight) সম্বন্ধীয় হরমোনও বলে।

(ঘ) অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি বা পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland)

অবস্থান ও গঠন : অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থির আকার মটর বীজের মত এবং করোটির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত। অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীর অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা—**সম্মুখ পিণ্ড** (anterior lobe) এবং **পশ্চাৎ পিণ্ড** (posterior lobe)। উভয় পিণ্ড থেকে বহু হরমোন ক্ষরণ হয়। এই গ্রন্থি আকারে ছোট হলেও শারীরবৃত্তীয় কার্যের নিয়ন্ত্রণ সমন্বয়সাধনে এই গ্রন্থির অবদান অসামান্য। এই গ্রন্থির ক্ষরণ অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে এই গ্রন্থিকে প্রধান গ্রন্থি বা **পরিচালক গ্রন্থিও** (master gland) বলে।

সম্মুখ পিণ্ড (Anterior lobe) **:** এই অংশে সাত প্রকারের হরমোন ক্ষরণ হয়। এই সকল হরমোনের মধ্যে পাঁচ প্রকার হরমোনের কার্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—(১) **মানুষের বৃদ্ধির হরমোনকে** সোমাটোট্রফিক হরমোন বা অল্প কথায় S. T. H (Somatotrophic hormone) বলে—এই হরমোন শৈশব বা বয়ঃসন্ধিকালে (যৌবনের প্রারম্ভে) অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে দেহের অস্থি, তরুণাস্থি, পেশী এবং অন্যান্য যোগকলা ইত্যাদির বৃদ্ধির দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। **বিভিন্ন পরিমাণে ক্ষরণের প্রতিক্রিয়া :** (ক) বাল্যাবস্থায় এই হরমোন কম পরিমাণে ক্ষরণ হলে মানুষের **বামনত্ব** (dwarfism) দেখা দেয়, এর ফলে যার বয়স ১১-১২ তাকে ৫-৬ বৎসরের এবং যার বয়স ২০-২২ তাকে ৩-১০ বৎসরের

মত মনে হয়। এই প্রকার বামনের কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির অভাব ঘটে না। বাল্যকালে এই হরমোন (S.T.H.) অধিক পরিমাণে ক্ষরণের ফলে **অতিকায়ত্ব** (giantism) দেখা দেয়। এই প্রকার দৈত্যাকার ব্যক্তি দৈর্ঘে ২·৪০-২·৭০ মিটার (৮-৯ ফিট) পর্যন্ত হয়। পরিণত বয়সের প্রথম, পর্যায়ে এই প্রকার দৈত্যাকার ব্যক্তির S. T. H. কম পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় এদের মৃত্যু ঘটে। (খ) পরিণত বয়সে S. T. H. অধিক ক্ষরণের ফলে গরিলার মত মুখ, হাত-পা হয় এবং এই অবস্থাকে **অ্যাক্রোমেগালি** (acromegaly) বলে। অ্যাক্রোমেগালি (গরিলার আকৃতি) সাধারণত হস্ত-পদাদির করোটি, নাসিকা, নিম্ন-চোয়াল এবং কশেরুকার অস্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ঘটে। এর ফলে মানুষ কুঁজো হয়ে যায় এবং নাসিকা স্বাভাবিক আকারের চেয়ে দুগুণ বেড়ে যায়।

১৫নং চিত্র ॥ অল্পবয়সে মানুষের পিট্যুইটারীর সম্মুখ পিণ্ডের হরমোন অধিক বা অল্পপরিমাণে ক্ষরণের ফলে অতিকায়ত্ব বা বামনত্ব লাভ।

(২) **ল্যাকটোজেনিক হরমোন** (L. T. H.)—ইহা মানুষের ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের সন্তান হওয়ার পর স্তনে দুগ্ধ উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়।

(৩) **থাইরয়েডের উদ্দীপক হরমোন** বা T.S.H (Thyroid stimulating hormone)—এই হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে থাইরোক্সিন উৎপন্ন করে।

* (৪) **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন** (A. C. T. H.)—এই হরমোন অ্যাড্রিনাল বা কটিগ্রন্থির বহিরাংশকে উত্তেজিত করে কটিগ্রন্থির হরমোন ক্ষরণ ঘটায়। এই হরমোনের ক্ষরণ ব্যাহত হলে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির বহিরাংশের বিভিন্ন হরমোনের ক্ষরণ হয় না, ফলে **অ্যাডিসনের রোগ** উৎপন্ন হয়। মূত্র থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন এবং জল শোষিত হয় না। দেহের আয়ন ও জলসাম্য রক্ষিত না হওয়ায় রক্তের গাঢ়তা

বাড়ে এবং হৃৎপিণ্ডের সংকোচনে অল্প রক্ত দেহে প্রবাহিত হয়। দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।
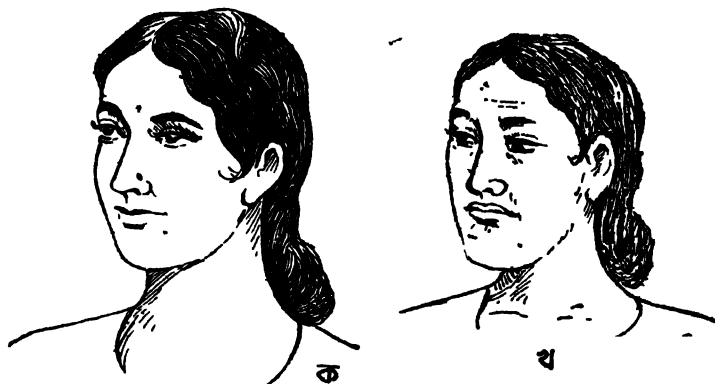
১৬নং চিত্র ॥ পরিণত বয়সে পিট্যুইটারী গ্রন্থির সম্মুখ পিণ্ডের হরমোন অধিক ক্ষরণের ফলে অ্যাক্রোমেগালি (গরিলার মত আকার) রোগ হয়--(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় এবং (খ) অ্যাক্রোমেগালি হওয়ার পরের অবস্থা।

(৫) **গোনাডোট্রফিক হরমোন** (G. T. H.)—পিট্যুইটারী গ্রন্থির সম্মুখ পিণ্ড থেকে যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক হরমোন—গোনাডোট্রফিক হরমোন উৎপন্ন করে। গোনাডোট্রফিক হরমোন ফলিকলস্টিমুল্যাটিং (F. S. H.) ও লুটেনাইজিং হরমোন (L. H.) দ্বারা গঠিত। ডিম্বাশয়ের ফলিকল বা ডিম্বাণু থলির আবরণী ফাটিয়ে ডিম্বাণুর মুক্তি এই হরমোন দুটির দ্বারা ঘটে এবং শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু উৎপন্ন করে।

পিট্যুইট্রিন (Pituitrin): পিট্যুইটারী গ্রন্থির অশোধিত নির্যাসকে পূর্বে চিকিৎসায় ব্যবহার করা হত। এই নির্যাসের মধ্যে ভেসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন থাকে। পূর্বে এই নির্যাসকেই চিকিৎসার কাজে পিট্যুইট্রিন নাম দিয়ে বিক্রি করা হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোষ বিভাজন এবং তাহার তাৎপর্য
(Cell division and significance)

কোষ বিভাজন (Cell division) **:** জীবজগতের সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহ একটি আদিকোষের বিভাজন ও রূপান্তরের ফলে হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন যুগে আদিকোষ থেকে উৎপন্ন কোষগুলি থেকে এককোষী শৈবাল ও আদ্যপ্রাণী এবং পরে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী আবির্ভূত হয়েছে। যে কোষ প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছে তা আবার পূর্বের কোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং এইভাবে অনুসরণ করলে আদিকোষ পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়। আমাদের ও অন্যান্য জীবের ভূত এবং ভবিষ্যতের ইতিহাস আদিকোষ থেকে অন্যান্য কোষের মধ্যে যে যোগসূত্র বিদ্যমান তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক **রুডোল্ফ ভারচাও** (Rudolf Virchow) ১৮৫৮ **খ্রীস্টাব্দে একটি সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করেন যে, প্রতিটি কোষ অন্য একটি কোষ থেকে উৎপন্ন হয়।** পরবর্তী কালে তাঁর মতবাদ বা সূত্র অনুসরণ করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোষ বিভাজনের পদ্ধতি এবং পর্যায় আবিষ্কার করেছেন।

জননক্রিয়া কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজড়িত। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা বংশবৃদ্ধি ও দেহের আয়তন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৃদ্ধি করে। বিশেষত নিম্নশ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি দেহ কোষ বিভাজনের দ্বারা সংঘটিত হয়। উচ্চশ্রেণীর বহুকোষী উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের আয়তন বৃদ্ধি কোষ বিভাজনের দ্বারা হলেও বংশবৃদ্ধির জন্য সন্তান-সন্ততির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জননকোষ সৃষ্টি যৌন গ্রন্থির কোষ বিভাজনের ফলে ঘটে। দুটি জননকোষের মিলনের ফলে যে এককোষী জাইগোটের (ভ্রূণাণু) সৃষ্টি হয় তা পুনর্বার কোষ বিভাজনের ফলে বহুকোষী ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। ভ্রূণের পরিণত জীবে রূপান্তরও কোষবিভাজনের দ্বারা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফল। এজন্য জীবজগতে কোষ বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক কাজ।

কোষ বিভাজনের সংজ্ঞা : যে পদ্ধতিতে মাতৃকোষে নতুন কোষীয় বস্তু উৎপাদনের ফলে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ভ্রূণাবস্থা থেকে পরিণত অবস্থা প্রাপ্তি বা জননকোষ উৎপন্ন ইত্যাদির জন্য মাতৃকোষ অপত্য কোষ উৎপন্ন করে তাকে কোষ বিভাজন বলে।

নিউক্লিয়স, ক্রোমোজোম ও কোষ বিভাজন :

জীবের বৃদ্ধি, প্রজনন ও দেহের বিভিন্ন অংশের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কোষ বিভাজনের দ্বারা সাধিত হয়। কোষ বিভাজনের বিষয় বুঝতে হলে কোষের নিউক্লিয়সের গঠন, কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়সের অভ্যন্তরে সুতোর মত বস্তুগুলির (ক্রোমোজোম) কার্য ও গঠন বিষয়ে জানা উচিত। বিশেষত কোষ বিভাজনের দ্বারা ক্রোমোজোমের মাধ্যমেই বিভিন্ন জীবের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বাহিত হয়।

নিউক্লিয়াস (Nucleus)

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) কোষের মধ্যে একটি বিন্দুর মত, অপেক্ষাকৃত ঘন অস্বচ্ছ বস্তু আবিষ্কার করেন। তিনি এই বস্তুটির নিউক্লিয়াস নামকরণ করেন। পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, নিউক্লিয়াস কোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কোষের সকল কার্য পরিচালনা করে বলে একে **কোষের মস্তিষ্ক** বা **নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র** বলা হয়। **কোষ থেকে নিউক্লিয়াস বাদ দিলে কোষের মৃত্যু হয়।**

নিউক্লিয়াসের গঠন ঃ প্রতি কোষে একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে, তবে অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। নিউক্লিয়াসের আকার বিভিন্ন প্রকার, যথা—ডিম্বাকার, স্ফীতাকার, চ্যাপ্টা অথবা বহুভাগে বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়াস বিশেষ প্রকার কোষ বা কোষের সক্রিয়তা (কর্মতৎপরতা) অনুযায়ী বিভিন্ন আয়তনের হয়। সক্রিয় কোষের নিউক্লিয়াসের আয়তন নিষ্ক্রিয় কোষ অপেক্ষা অধিক।

যদিও নিউক্লিয়াস অধিকাংশ কোষে বর্তমান তবুও অনেক কোষে নিউক্লিয়াস নাও থাকতে পারে। যথা—ব্যাকটিরিয়া, নীল-সবুজ শৈবাল, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকা ইত্যাদি। নিউক্লিয়াস তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্বারা গঠিত। যথা—(১) **নিউক্লিয় আবরণী** (nuclear membranc), (২) **নিউক্লিয়োলাস** (nucleolus) ও (৩) **নিউক্লিয় জালিকা**। নিউক্লিয় আবরণীর মধ্যে যে তরলবস্তুতে নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয় জালিকা থাকে তাকে **নিউক্লিয়োপ্লাজম** (nucleoplasm) বা **জীবপঙ্ক** বলে।

নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ঃ (১) নিউক্লিয় আবরণী ঃ নিউক্লিয়
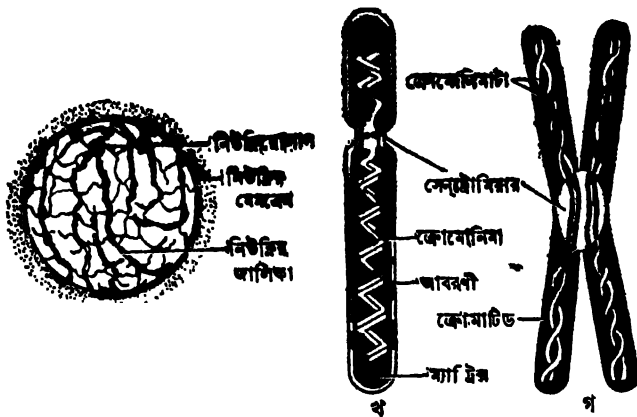
১৭নং চিত্র ॥ (ক) নিউক্লিয়াস ও (খ) ক্রোমোজোমের আভ্যন্তরিক গঠনের দৃশ্য ; (গ) ক্রোমোজোম থেকে ক্রোমাটিডের উৎপত্তি।

আবরণী কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে আলাদা করে রাখে এবং নিউক্লিয়াসের ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। নিউক্লিয়

আবরণীর সূক্ষ্ম গঠন সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এটি দুটি আস্তরণ দ্বারা গঠিত বলে জানা গেছে। নিউক্লিয় আবরণীর মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রের মাধ্যমে নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে। এই ছিদ্র কোষের অবস্থানুযায়ী উন্মুক্ত বা বন্ধ থাকে তবে কিরূপে এ কাজ হয় তা জানা নেই। নিউক্লিয় আবরণী কোষ বিভাজনের প্রফেজ পর্যায়ে অদৃশ্য হয় এবং কোষ বিভাজনের সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর (টেলোফেজ পর্যায়ে) পুনরায় আবির্ভূত হয়।

(২) **নিউক্লিয়োলাস** (Nucleolus) ° উচ্চতর জীবের প্রতি কোষের নিউক্লিয়সের মধ্যে গোল স্ফীতাকার **কলয়েডল** (colloidal) বস্তু থাকে, একে নিউক্লিয়োলাস বলে। কোষ বিভাজনের সময়ে প্রফেজ পর্যায়ে নিউক্লিয়োলাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং টেলোফেজ পর্যায়ে পুনর্বার আবির্ভূত হয়। নিউক্লিয়োলাসের প্রধান কাজ হচ্ছে **রাইবোসোমাল** RNA (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) **সংশ্লেষণ**।

ক্রোমোজোম (Chromosome)

কোষ আবিষ্কারের বহুদিন পরে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে স্ট্রাসবারজার (E. Strasburger) কোষ বিভাজনের সময়ে কতকগুলি সুতোর মত বস্তু আবিষ্কার করেন। ওয়ালডেয়ার (W. Waldeyer) ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সুতোগুলির ক্রোমোজোম নামকরণ করেন। ক্রোমোজোম নিউক্লিয় জালিকার সুতোগুলি স্থূল ও হ্রস্বতর হওয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। গ্রীক ভাষায় ক্রোমস যার বাংলা মানে রঙ থেকে এদের নামকরণ ক্রোমোজোম হয়েছে এবং এই সুতোগুলির ক্ষারকীয় রঙের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। ক্রোমোজোম সংখ্যায় আকারে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীতে নির্দিষ্ট এবং শান্ত অবস্থায় নিউক্লিয়সের মধ্যে অদৃশ্য থাকে কিন্তু কোষ বিভাজনের সময় দৃশ্যমান হয়।

কোষ বিভাজনের সময়ে ক্রোমোজোম আকারে অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় এবং প্রতি ক্রোমোজোমের মধ্যে মুক্তামালার মত বহু দানা দেখা যায়। এই দানাকে ক্রোমোমেয়ার (chromomere) বলে। বহু বিজ্ঞানীর মতে ক্রোমোমেয়ারই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একক—**জীন** (gene) এবং এর মধ্যে DNA কেন্দ্রীভূত। **ডিপ্লয়েড** (diploid) নিউক্লিয়সের সদৃশ (একই আকার ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং এই প্রকার একজোড়া ক্রোমোজোমকে **সমসংস্থ** (homologous) ক্রোমোজোম বলে। কোন জীবের বহুজোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়া আরেক জোড়ার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হয় না। দুটি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি পিতা আর একটি মাতার কাছ থেকে আসে। তবে পুংজনন কোষ (শুক্রাণু) ও স্ত্রীজনন কোষের (ডিম্বাণুর) নিউক্লিয়সে ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে না, বিজোড় অবস্থায় প্রতি জোড়ার একটি করে থাকে এবং এই প্রকার নিউক্লিয়সকে **হ্যাপ্লয়েড** (haploid) নিউক্লিয়স বলে।

ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে 2n এবং হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ক্রোমোজোমের-সংখ্যা, আকার ও গঠন : প্রতি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রোমোজোমের-সংখ্যা 4 থেকে 1600 পর্যন্ত হতে পারে। মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা 46 (23 জোড়া)। প্রতি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি স্বচ্ছ অংশ থাকে তাকে **সেন্ট্রোমিয়ার** বলে। ক্রোমোজোমের গঠন তার সেন্ট্রোমিয়ারের উপর নির্ভরশীল। সেন্ট্রোমিয়ার যদি ক্রোমোজোমের মধ্যভাগে থাকে তাকে **মেটাসেণ্ট্রিক** (metacentric), এক প্রান্তে থাকলে **টেলোসেণ্ট্রিক** (telocentric) এবং মধ্যভাগ ও প্রান্তের মাঝামাঝি থাকলে **সাব-মেটাসেণ্ট্রিক** (sub-metacentric) বলে।

ক্রোমোজোমের আভ্যন্তরিক গঠনে একটি কুণ্ডলী করে পাকানো সূত্রকে (coiled filament) আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়, এই কুণ্ডলী করে পাকানো সূত্রকে **ক্রোমোনিমা** (chromonema) এবং আবরণীকে **পেলিকল** (pellicle) বলে। আবরণী ও ক্রোমোনিমার মধ্যে অর্ধতরল পদার্থকে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (matrix) বলে। কোষ বিভাজনের প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোমের গঠন দুটি পাকানো সূত্রের ন্যায়। প্রতি সূত্রকে **ক্রোমাটিড** বলে। একটি ক্রোমোজোম প্রতিরূপ সৃষ্টির দ্বারা দুটি অপত্য ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়।

রাসায়নিক গঠনে ক্রোমোজোমের মধ্যে DNA (ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড), RNA (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড), প্রোটীন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি থাকে।

মানবদেহের বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোম :

মানুষের দেহকোষে অবস্থিত ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোজোম আছে যা তাদের লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে। এদের **যৌন ক্রোমোজোম** বলে। যৌন ক্রোমোজোমদের X এবং Y বলে। যৌন ক্রোমোজোম ব্যতীত বাকী ২২ জোড়া ক্রোমোজোমকে **অটোজোম** বলে।

কার্য : বংশের ধারা এক কোষ থেকে অন্য কোষে বহন করা ক্রোমোজোমের প্রধান কাজ এবং বংশধারার বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত DNA-এর মধ্যে থাকে।

DNA : ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সকল জীবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক যৌগ। কারণ এরই দ্বারা বংশপরম্পরায় বংশের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য কোষ থেকে অপত্যকোষে বা এক জীব থেকে পরবর্তী অপত্য জীবের মধ্যে বাহিত হয়।

গঠন : রাসায়নিক গঠনে DNA কতকগুলি **নিউক্লিয়োটাইডস** (nucleotides) দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়োটাইড আবার **ফসফরিক অ্যাসিড** (H_3PO_4), **ডি-অক্সিরাইবোজ** (deoxyribose) নামক শর্করা এবং একটি **পিউরিন বেস** (ক্ষারক—অ্যাডিনাইন বা গুয়ানিন) অথবা একটি **পিরামিডিন বেস** (থায়ামিন বা সাইটোসিন) দ্বারা গঠিত।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয় ওয়াটসন (Watson) এবং ক্রিক (Crick) মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি DNA অণুতে দুটি বহু-নিউক্লিয়োটাইড যুক্ত (polynucleotide) শৃঙ্খল পাশাপাশি পাকানো অবস্থায়
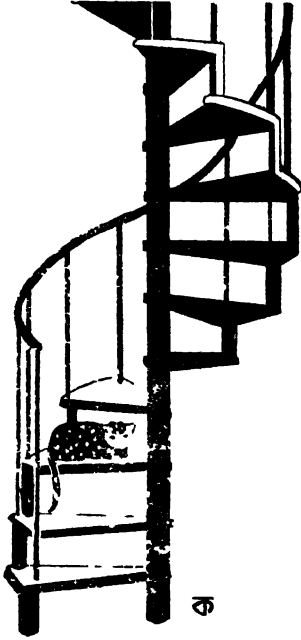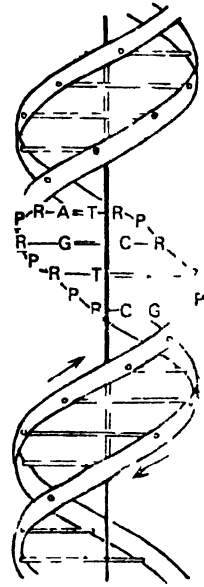
১৮নং চিত্র ॥ (ক) একটি সর্পিল সিঁড়ির সাথে (খ) DNA শৃঙ্খলের গঠনের সাদৃশ্য। P-ফসফরিক অ্যাসিড, R-ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, A-অ্যাডিনাইন, G-গুয়ানিন, T-থায়ামিন ও C-সাইটোসিন।

থাকে এবং মধ্যভাগ বহু আড়াআড়ি যোজক দ্বারা যুক্ত হয়। এই শৃঙ্খলের আকার অনেকটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ির মত দেখতে হয়। শৃঙ্খল দু'টি আড়াআড়ি যোজক দ্বারা যুক্ত এবং কোনও যোজক একটি পাকানো শৃঙ্খলের পিরামিডিনের সাথে যুক্ত থাকলে অপর শৃঙ্খলের পিউরিনের সাথে সংযুক্ত হয়।

প্রতিটি DNA-এর বহু নিউক্লিয়োটাইড (polynucleotide) যুক্ত শৃঙ্খলে কয়েক হাজার নিউক্লিয়োটাইড তাদের বেস বা ক্ষারকসহ থাকায় বিভিন্ন প্রকারের নূতন সমবায়ে বিন্যস্ত হতে পারে। তার মানে শৃঙ্খলের একস্থানে অ্যাডিনাইনের (A) সাথে থায়ামিনের (T) আবার অন্যস্থানে সাইটোসিনের (C) সাথে গুয়ানিন (G) থাকতে পারে। DNA শৃঙ্খলকে একটি টেপরেকর্ডারের টেপের উপর টেলিগ্রাফের মর্স (Morse) সংকেত অনুযায়ী কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে মনে করা যেতে পারে। মর্স-সংকেতে ড্যাস (—) ও ডট (.)

সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে যে-কোন জায়গায় যে-কোনও সংবাদ পাঠান যায়। DNA শৃঙ্খল সেই একইভাবে কেবলমাত্র দুটি পিউরিন ও দুটি পিরামিডিন ক্ষার এই চারটি বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিন্যাসের দ্বারা জীবের নূতন নূতন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে।

কার্য : DNA জীবকোষের সকল প্রকার জৈব সংশ্লেষ এবং বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও বহন করে। DNA জীবজগতের সবচেয়ে স্থায়ী যৌগ যার সচরাচর কোনও পরিবর্তন হয় না।

DNA অণু থেকে নূতন DNA অণুর জন্ম এবং মিউটেশন : নূতন DNA অণু উৎপন্ন হওয়ার আগে দুটি বহু-নিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খলের সর্পিল বন্ধন খুলে যায় এবং শৃঙ্খল দুটি বিভক্ত হয়। প্রতিটি শৃঙ্খল এসময়ে ছাঁচের (template) কাজ ক'রে অন্য একটি শৃঙ্খল তৈরী করে। শৃঙ্খলের পিউরিন বা পিরামিডিন বেস সাইটোপ্লাজম থেকে পরিপূরক বেস সংগ্রহ করে পরিপূরক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে। যথা—অ্যাডিনাইন থায়ামিনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম হয়। যেমন, অ্যাডিনাইন থায়ামিনকে আকর্ষিত না করে যদি সাইটোসিনকে আকর্ষণ করে তাহলে নূতন DNA শৃঙ্খলে বিন্যাসের পরিবর্তন হয় এবং এই প্রকার পরিবর্তনকে **মিউটেশন** (mu'a'ion) বলে। মিউটেশনের ফলে নূতন চরিত্রের সৃষ্টি হয়ে জীবের পক্ষে ভাল বা মন্দ উভয়ই হতে পারে। মটর গাছে সাধারণত লাল ফুল হয় কিন্তু মিউটেশনের ফলে সাদা ফুল হতে পারে।

জীন (Gene) : বহু বিজ্ঞানীর মত অনুযায়ী ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত গুটির মত অংশগুলিই জীন যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে বহন করে। বর্তমানে জানা গেছে যে এরা DNA-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ।

বিভিন্ন প্রকার কোষ বিভাজন : প্রতিটি কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে—কোষের এই অবস্থাকে ডিপ্লয়েড বলে। কোষ বিভাজন প্রধানত দুই প্রকারের—যথা, **মাইটোসিস** (mitosis) এবং **মায়োসিস** (meiosis)। কিন্তু বহু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে আরেক প্রকার কোষ বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, একে **অ্যামাইটোসিস** (amitosis) বলে। কোষ বিভাজন প্রথমে **নিউক্লিয়স বিভাজন** (nuclear division) এবং পরে **সাইটোপ্লাজম বিভাজন** (cytokinesis) দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার কোষ বিভাজনের বর্ণনা দেওয়া হল :

মাইটোসিস (Mitosis)

সংজ্ঞা : যে প্রকারের কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের অনুরূপ গুণাগুণ সমন্বিত ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত অপত্যকোষ উৎপন্ন হয় তাকে মাইটোসিস বা সদৃশ কোষ বিভাজন বলে।

নিম্নশ্রেণীর এককোষী জীবের জননক্রিয়ায় অপত্য জীবের উৎপাদনে ও উচ্চতর শ্রেণীর বহুকোষী জীবের জননকোষ মিলনের ফলে উৎপন্ন এককোষী ভ্রূণাণু বা জাইগোটের বিভাজনের ফলে পূর্ণাঙ্গ বহুকোষী জীবের সৃষ্টি এই প্রকার কোষ বিভাজন দ্বারা ঘটে। এই প্রকার কোষ বিভাজনে দেহকোষের (somatic cell) মধ্যে হয় বলে একে দেহকোষ বিভাজনও (somatic cell division) বলে। স্ট্রাসবার্গার (Strasburger, 1875) এবং ডব্লিউ. ফ্লেমিং (W. Fleming, 1882) নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন বর্ণনা করেন। এইস্থানে একটি প্রাণিকোষের মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা করা হচ্ছে—

(১) **প্রফেজ** (Prophase) : মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের প্রথম পর্যায় এবং এই সময় শান্ত বা স্থির নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময় কোষের আকার গোল, চকচকে এবং সান্দ্র (চটচটে পদার্থ) হয়।
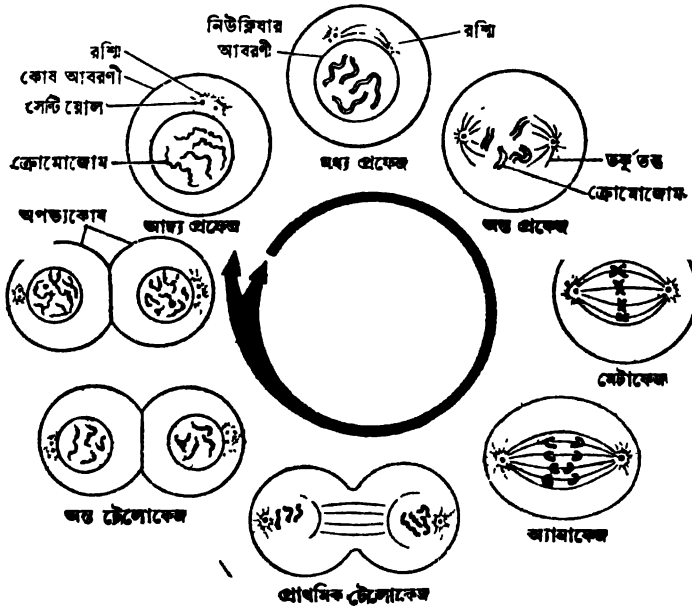
১৯নং চিত্র ॥ প্রাণিকোষের মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের দৃশ্য।

নিউক্লিয়সের মধ্যে ক্রোমাটিন জালিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম সুতোর ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়, এদের ক্রোমোজোম বলে। এই অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলির নিরুদন বা জল বিয়োজন হওয়ায় ক্রোমোজোমের আকার খর্ব ও স্থূল হয়। এই সময়

ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বা অনুদৈর্ঘ্যে সমান দুভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি ভাগকে **ক্রোমাটিড** বলে। দুটি ক্রোমাটিড কেবলমাত্র সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সেন্ট্রোজোমের সেণ্ট্রিওল দুটি বিপরীত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং এই অঞ্চল দুটিকে মেরু (pole) বলে। উভয় সেণ্ট্রিওলের চারপাশে সাইটোপ্লাজমের কিছু অংশ অর্ধতরল কলয়েড জাতীয় বস্তু বা জেলের (gel) আকার ধারণ করে এবং এর মধ্যে বহু অতিসূক্ষ্ম তন্তু উৎপন্ন হয়ে রশ্মির আকারে ঘিরে ধরে। এই তন্তুগুলির মধ্যে অনেকে উভয় মেরুর সাথে এবং কতকগুলি ক্রোমোজোমের সেণ্ট্রিওলের সাথে সংযুক্ত হয়। উভয় মেরুর মধ্যে প্রসারিত তন্তুগুলির প্রসারণের ফলে **বেম** বা **তর্কুর** (spindle) আকার ধারণ করে বলে এই অঞ্চলকে **বেম** এবং **এই** তন্তুগুলিকে বেমতন্তু (spindle fibre) বলে। প্রফেজ পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিয়
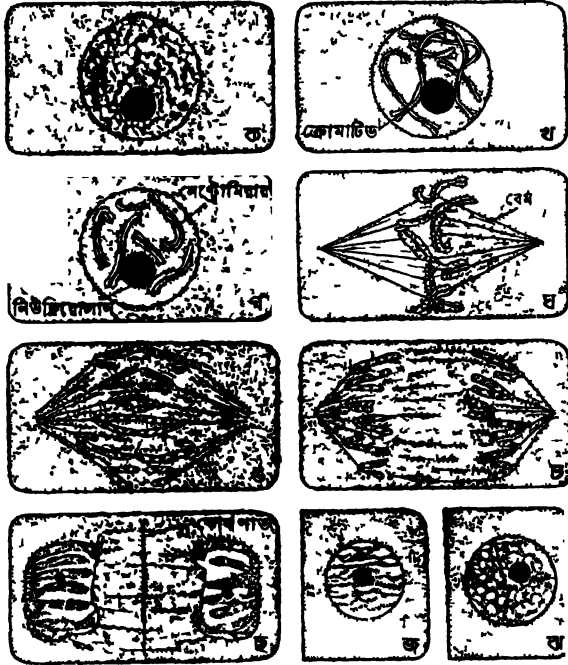
২০নং চিত্র ॥ উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন ঃ—(ক) ইণ্টারফেজ ; (খ, গ) প্রফেজের প্রথম ও শেষ পর্যায় ; (ঘ) মেটাফেজ ; (ঙ, চ) অ্যানাফেজের প্রথম ও শেষ পর্যায় ; (ছ, জ) টেলোফেজের প্রথম ও শেষ পর্যায় ও কোষপাত উৎপাদন ; (ঝ) ইণ্টারফেজ।

আবরণী ও নিউক্লিয়োলাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ক্রোমোজোমগুলি কোষের বিষুব অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়।

(২) **মেটাফেজ** (Metaphase) **: এই পর্যায় প্রফেজ অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী। এবং এই সময় ক্রোমোজোমগুলি বেমের বিষুব অঞ্চলে সজ্জিত হয় এবং ক্রোমোজোমের** মধ্যে সেনট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলির আকার V, L অথবা I-এর মত দেখতে হয়।

(৩) **অ্যানাফেজ** (Anaphase) **:** ক্রোমাটিড বা অপত্য ক্রোমোজোমগুলি মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে। এই সময় সেণ্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়ে অপত্য সেণ্ট্রোমিয়ার উৎপন্ন করে এবং এর সাথে সংযুক্ত উভয় মেরুর বেমতন্তুর সংকোচনের দ্বারা ক্রোমাটিড দুটি বিপরীত মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে। এই সময় উভয় ক্রোমাটিডের মধ্যবর্তী বেমের সম্প্রসারণ দ্বারা সূত্রাকার **স্টেম-বডির** (stem body) সৃষ্টি হয়।

(৪) **টেলোফেজ** (Telophase) **:** অপত্য ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিডগুলি মেরু অঞ্চলে উপস্থিত হওয়ার পর তাদের মসৃণতা ও ঘনত্ব কমাতে থাকে এবং অপত্য ক্রোমোজোমগুলি এলোমেলো জালের আকার ধারণ করে। এই ক্রোমোজোম জালের চারদিকে নিউক্লিয়োলাসের সৃষ্টি হয়।

(৫) **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis) **:** মাইটোসিস কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায় এবং এই পর্যায়ে কোষের বিষুব অঞ্চলে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়। এই খাত গভীরতর হয়ে মাতৃকোষকে দুভাগে বিভক্ত করে এবং অপত্য কোষ (daughter cell) তার নিউক্লিয়স ও অন্যান্য বস্তুসহ পৃথক কোষরূপে জন্ম নেয়।

উদ্ভিদকোষের মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজন : উদ্ভিদকোষের মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন প্রাণিকোষের বিভাজনের অনুরূপ। তবে সমগ্র পদ্ধতির কয়েক স্থানে পার্থক্য দেখা যায়, যথা—উদ্ভিদকোষে সেনট্রোজোম ও সেণ্ট্রিওল না থাকায় নিউক্লিয় বিভাজনের প্রফেজ পর্যায়ের প্রথম অবস্থায় সেণ্ট্রিওল বিভাজন হয় না। কিন্তু শেষের দিকে নিউক্লিয় আবরণী অবলুপ্তির সাথে সাথে বেমতন্তুর সৃষ্টি হয়। এই বেমতন্তুগুলি উদ্ভিদকোষের বিষুব অঞ্চল থেকে উভয়দিকে অভিসারিভাবে (convergently) ধাবিত হয়ে একস্থানে মিলিত হয়ে বেমের মেরু (spindle pole) সৃষ্টি করে। সাইটোকাইনেসিস পর্যায়ে উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে প্রাণিকোষের মত কোনও গভীর খাতের সৃষ্টি হয় না। উদ্ভিদকোষে বেমের বিষুব অঞ্চলে বিন্দু বিন্দু কোষপ্রাকার গঠনকারী প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু সঞ্চিত হতে থাকে। অবশেষে এই বস্তুগুলির সংযুক্তির ফলে পর্দার মত **বিভাজনপাত** (division plate) বা **কোষপাত** (cell plate) তৈরী হয়ে সাইটোপ্লাজমকে দুভাগে বিভক্ত করে। পরে সেলুলোজ জাতীয় বস্তু কোষপাতের সাথে যুক্ত হয়ে **কোষপ্রাচীরে পরিবর্তিত** হয়।

মাইটোসিসের তাৎপর্য :

(১) **মাতৃকোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত অপত্য কোষ সৃষ্টি :** এই প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের ফলে প্রতিটি ক্রোমোজোম অপত্য ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। তার মানে কোন জীবের যদি চার জোড়া বা আটটি ক্রোমোজোম থাকে তারা ষোলটি অপত্য ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে এবং প্রতি অপত্য কোষ তার মধ্যে সমানভাবে আটটি করে অপত্য ক্রোমোজোম পায়।

(২) **মাতৃকোষের সমগুণসম্পন্ন অপত্যকোষ সৃষ্টি :** প্রতিটি ক্রোমোজোমের অর্ধ অংশ অপত্য কোষদুটি পাওয়ার ফলে মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনের দ্বারা অপত্য কোষে সঞ্চারিত হয় এবং অপত্য কোষ মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

(৩) **সদৃশকোষ বিভাজন :** এই প্রকার কোষ বিভাজনে দুটি অপত্যকোষ মাতৃকোষের সমগুণসম্পন্ন হওয়ায়, এই প্রকার কোষ বিভাজনকে **সদৃশকোষ বিভাজনও** বলে।

(৪) **জনন, দেহের আয়তন বৃদ্ধি ও ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের পূরণ :** মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের ফলে যেমন এককোষী ও বহুকোষী নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অযৌন জনন হয় সেরূপ দেহের কোষসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা (প্রোটোপ্লাজম ও ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা) দেহের আয়তন বৃদ্ধি ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পূরণ হয়।

মায়োসিস (Meiosis)

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেহকোষে ঘটে এবং অপত্য কোষগুলি মাতৃকোষের সদৃশ হয়। এই সকল কোষে মাতৃকোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে এবং ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে কোনও গুণগত পরিবর্তন হয় না। আরেক প্রকার কোষ বিভাজন আছে যা উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে যাদের যৌন-গ্রন্থি বা গোনাড (gonad) থাকে এবং যাদের জনন দুটি জনন কোষের মিলনের ফলে সংঘটিত হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই প্রকার কোষ বিভাজনকে **মায়োসিস** বলে। মায়োসিস কোষ বিভাজন যৌন-গ্রন্থির কোষগুলির ক্ষেত্রেই কেবল ঘটে ফলে জনন কোষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জনন কোষগুলির মধ্যে যদি মাতৃকোষের ন্যায় সমসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে তাহলে জনন কোষগুলির মিলনে মাতৃকোষের চেয়েও অপত্যের বা সন্তানের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা দু'গুণ বৃদ্ধি পাবে।

এই সকল অধিক ক্রোমোজোমযুক্ত জীবের জনন কোষগুলির মিলনে যে অপত্যগুলি জন্মাবে তার মধ্যে দু'গুণ ক্রোমোজোম যুক্ত কোষগুলির মিলনে মাতৃকোষের চেয়েও চারগুণ ক্রোমোজোম বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে যে প্রাণীর (মানুষ) ক্রোমোজোম ২৩ জোড়া (৪৬টি) তাদের জনন কোষে (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) যদি ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে তাহলে বিপরীত লিঙ্গের জনন কোষ মিলনে সন্তানের কোষের মধ্যে ২৩ জোড়া +২৩ জোড়া = ৪৬ জোড়া ক্রোমোজোম হবে। এই সকল সন্তানের জননে আবার ৪৬

জোড়া ক্রোমোজোম যুক্ত জনন কোষগুলির মিলনে ৪৬ জোড়া+৪৬ জোড়া=৯২ জোড়া ক্রোমোজোম কোষ সন্নিবেশিত হবে। কিন্তু আমরা জানি যে, কোনও জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট যার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়।

সুতরাং জনন কোষ উৎপাদনে যে প্রকার কোষ বিভাজন হয় তাতে এমন একটি ব্যবস্থা থাকে যাতে জনন কোষগুলির মধ্যে প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের অর্ধেক বাহিত হবে। **মায়োসিস** হচ্ছে সেই প্রকার কোষ বিভাজন এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয় বলে একে **হ্রাসকরণ বিভাজনও** (reduction division) বলে। মায়োসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের সময় প্রতি জোড়া ক্রোমোজোম যার একটি তাদের মাতা এবং অপরটি পিতার নিকট হতে এসেছিল তাদের মধ্যে বস্তুগত বিনিময় ঘটে। ফলে জননকোষে যে ক্রোমোজোম বাহিত হয় তা মাতৃকোষের অনুরূপ হয় না। কারণ প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন জীন যারা বিভিন্ন চরিত্রের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে।

সংজ্ঞা ঃ যে প্রকার কোষ বিভাজনে ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ উৎপন্ন, প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশগত ও গুণগত বিনিময় এবং প্রতি জোড়া ক্রোমোজোম পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অপত্যের মধ্যে নূতন গুণের সন্নিবেশ ঘটে তাকে মায়োসিস বলে।

মায়োসিস কোথায় ঘটে ঃ জীবের যৌন জননে যে অঙ্গে জনন কোষ উৎপন্ন হয় যথা, যৌন গ্রন্থি বা গোনাড (ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়) সেই অঙ্গের মায়োসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন ঘটে।

মায়োসিসের বিভিন্ন পর্যায় ঃ এই প্রকার বিভাজন জনন কোষ উৎপাদনকারী মাতৃকোষের দুবার উপর্যুপরি কোষ বিভাজন দ্বারা ঘটে যার মধ্যে একবার মাত্র ক্রোমোজোম জোড়ার বিভাজন হয়। এর ফলে চারটি অপত্য জনন কোষের সৃষ্টি হয়। মায়োসিস কোষ বিভাজনে মাইটোসিসের মত বিভিন্ন দশা, যথা—প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ ইত্যাদি দশা এবং সাইটোকাইনেসিস দেখা যায়। এই দশাগুলি প্রথম পর্যায়ের কোষ বিভাজনে দুটি অপত্য কোষ উৎপাদনেও যেমন ঘটে সেরূপ দ্বিতীয় পর্যায়ে কোষ বিভাজন দুটি অপত্য কোষের বিভাজনের দ্বারা চারটি অপত্য জনন কোষ উৎপাদনেও ঘটে। সুতরাং বিভাজনের দশাগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে একবার করে মোট দুবার ঘটে।

প্রথম পর্যায়ের বিভাজন ঃ

(১) **প্রফেজ ঃ** মায়োসিস কোষ বিভাজনের এই পর্যায়টি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতর। এই সময় জনন কোষ উৎপাদনকারী মাতৃকোষের শান্ত বা স্থির নিউক্লিয়সের নিউক্লিয়-জালিকার মধ্যে জলীয় অংশ কমতে থাকায় ক্রোমোজোমগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলি অনুদৈর্ঘ্যে বিভক্ত থাকে না। পিতা ও মাতার নিকট হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্রোমোজোমের মধ্যে একই আকার, প্রকার ও গুণসমন্বিত সমসংস্থ

ক্রোমোজোম (homologous) আকর্ষিত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। এই প্রকার অবস্থানকে সাইন্যাপ্‌সিস্‌ (synapsis) এবং প্রতি জোড়াকে বাইভ্যালেণ্ট
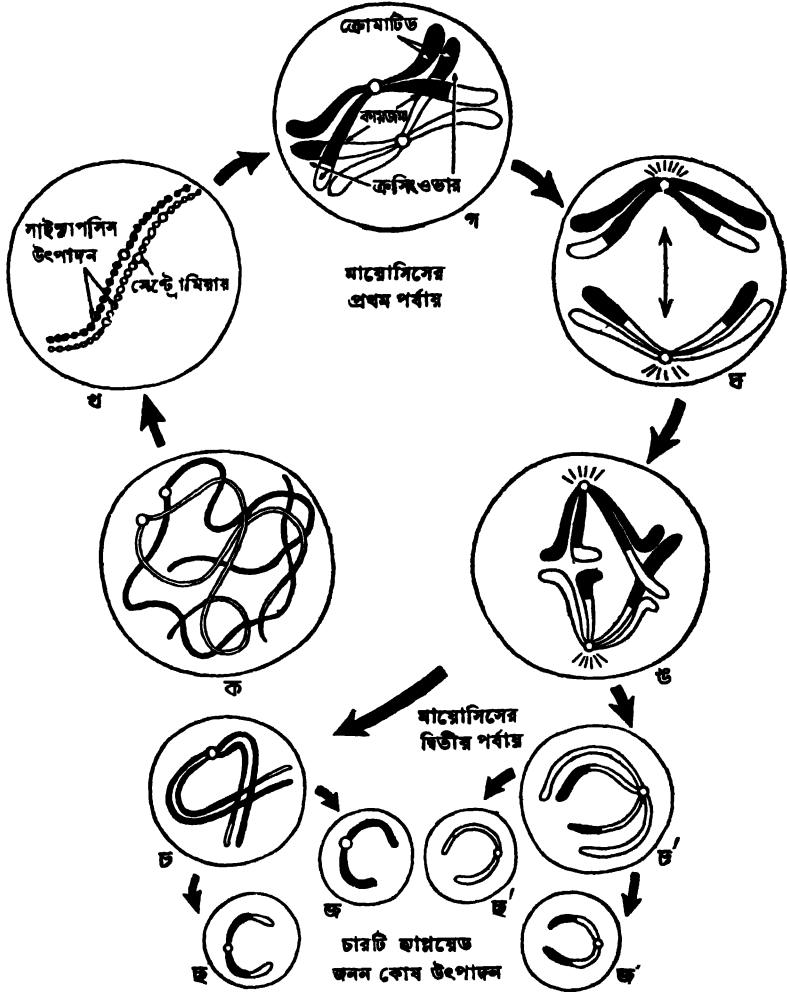
২১নং চিত্র ॥ মায়োসিসের প্রথম পর্যায়ে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অবস্থার দৃশ্য—(ক) (সাদা এবং কালো) দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের আবির্ভাব। (খ) দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একত্রে অবস্থান দ্বারা সাইন্যাপসিসের সৃষ্টি। (গ) উভয় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলির কায়জমা সৃষ্টি এবং উভয়ের অংশ বিনিময় (ক্রসিং ও ভার)। (ঘ) সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মেরুর উভয় দিকে অপসরণ ফলে দুটি নূতন সংমিশ্রণের ক্রোমাটিড উৎপাদন (ডায়াকাইনেসিস)। (ঙ) টেলোফেজ দশা। দ্বিতীয় পর্যায়ে (চ, চ' ; ছ, ছ' এবং জ, জ') চারটি হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রোমোজোমযুক্ত কোষ উৎপাদন।

(bivalent) বলে। বাইভ্যালেণ্টের ক্রোমোজোম দুটি ছোট ও স্ফীতাকার হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে রাখে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিভক্ত হয়ে ক্রোমাটিড উৎপন্ন করে।

কায়াজমা সৃষ্টি ঃ উভয় ক্রোমোজোমের চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে উভয়ের যে-কোনও দুটি ক্রোমাটিডের সংযুক্ত অঞ্চলে ভাঙন দেখা দেয়। এই ভাঙনের ফলে উভয় ক্রোমাটিডের মধ্যে ভাঙা অংশ দুটি বিনিময় হয়ে পুনর্বার সংযুক্ত হয়। এই অবস্থায় উভয় ক্রোমোজোমের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণে পরিণত হয়। এবং একটি ক্রোমোজোম তার দুটি ক্রোমাটিডসহ অপর ক্রোমোজোম ও তার দুটি ক্রোমাটিড থেকে দূরে সরতে থাকায় ×-এর আকার ধারণ করে, একে **কায়াজমা** (chiasma) বলে। উভয় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের অংশ পরিবর্তনকে **ক্রসিং ওভার** (crossing over) বলে।

নিউক্লিয় আবরণী ও নিউক্লিয়োলাস বিলুপ্ত হয়, সেণ্ট্রিয়োল দুটি দুই মেরুতে সরে যায় এবং বেমতন্তু উৎপন্ন হয়। উভয় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের মধ্যে যুক্ত অংশ (কায়জমা) ক্রোমোটিডের প্রান্তের দিকে সরতে সরতে অবশেষে বিযুক্ত হয়ে যায়।

(২) **মেটাফেজ ঃ** বিষুব অঞ্চলের উপর ও নিচে সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোমগুলি অবস্থান করে এবং প্রতিজোড়া ক্রোমোজোমের একটির সাথে এক মেরুর বেমতন্তু এবং অন্যটির সাথে অপর মেরুর বেমতন্তু সেণ্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে। (৩) **অ্যানাফেজ ঃ** উভয় মেরুর বেমতন্তুর আকর্ষণে প্রতি জোড়া ক্রোমোজোম তাদের দুটি ক্রোমাটিডসহ এক এক মেরুর দিকে যেতে থাকে। (৪) **টেলোফেজ ঃ** অবশেষে প্রতিজোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি এক মেরুতে এবং অন্যটি বিপরীত মেরুতে উপস্থিত হওয়ায় ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়। উভয় মেরুতে প্রতি জোড়ার ক্রোমোজোম এই প্রকার একটি করে ক্রোমোজোমের অবস্থানকে হ্যাপ্লয়েড (haploid) বলে। এই সময় নিউক্লিয় আবরণী ও নিউক্লিয়োলাস আবির্ভূত ও বেমতন্তু বিলুপ্ত হয়। (৫) **সাইটোকাইনেসিস ঃ** বিষুব অঞ্চলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গভীর খাত সৃষ্টি হয়ে দুটি অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাজন ঃ এই পর্যায় মাইটোসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের অনুরূপ এবং একইভাবে প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ ও সাইটোকাইনেসিস পর্যায়ে দুটি অপত্যকোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্যকোষের সৃষ্টি করে। প্রথমে নিউক্লিয় আবরণী ও নিউক্লিয়াস বিলুপ্ত এবং বেমতন্তু দ্রুত উৎপন্ন হয় এবং হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলি কেবলমাত্র সেণ্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যুক্ত থাকে। পরে সেণ্ট্রোমিয়ার দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রতি ভাগের সাথে যুক্ত বেমতন্তু তাদের মেরুর দিকে টানতে থাকে এবং হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রোমোজোমের অপত্য ক্রোমোজোমগুলি (ক্রোমাটিড) ক্রোমোজোম জালকে পরিণত এবং নিউক্লিয় আবরণী ও নিউক্লিয়োলাস আবির্ভূত হয়। এইভাবে একটি কোষ থেকে চারটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে কোষ বিভাজনের দ্বারা প্রতি অপত্যকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস হয়ে অর্ধেক হয়ে যায়।

মায়োসিসের তাৎপর্য ঃ

(১) **ক্রোমোজোমের হ্রাসকরণ ঃ** মায়োসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজনের ফলে জনন কোষে (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক (অর্ধেক) ক্রোমোজোম থাকে এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনরায় ডিপ্লয়েড হয়। এইভাবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত না হলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট না থেকে বেড়ে যেত।

(২) **সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময় ঃ** ক্রসিং ওভার এবং কায়জমা উৎপন্ন হওয়ায় বিভিন্ন মাতৃ ক্রোমোজোম জোড়ার দ্বারা উৎপন্ন অপত্য ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিডগুলির মধ্যে বিপরীত ক্রোমাটিডগুলির অংশের বিনিময় ঘটে। এর ফলে ক্রোমাটিডগুলিতে জীনের বিনিময় ঘটে।

(৩) **নূতন চরিত্রের সৃষ্টি ঃ** অপত্য কোষের ক্রোমোজোমে নূতন জীন সংমিশ্রণের ফলে নূতন চরিত্রের উদ্ভব ঘটে—একে প্রকরণ (variation) বলে।

(৪) **মাতৃকোষ থেকে ভিন্ন প্রকারের কোষ সৃষ্টি ঃ** ক্রোমাটিডের অংশের বিনিময়ের ফলে নূতন জীনসংমিশ্রণ ঘটে এবং প্রতিটি অপত্যকোষ মাতৃকোষ থেকে ভিন্নপ্রকার হয়।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের পার্থক্য ঃ

মাইটোসিস	মায়োসিস
(১) এই প্রকার কোষ বিভাজন দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধিতে, অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বা ভ্রূণাণুর (Embryo) বৃদ্ধিতে দেখা যায়।	(১) এই প্রকার কোষ বিভাজন যৌন জননের প্রয়োজনে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উৎপাদনে দেখা যায়।
(২) কোষ বিভাজনের ফলে অপত্যকোষগুলির মধ্যে মাতৃকোষের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। এই প্রকার ক্রোমোজোমের অবস্থানকে ডিপ্লয়েড বলে।	(২) অপত্য জননকোষ—শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর মধ্যে মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। এই প্রকার ক্রোমোজোমের অবস্থানকে হ্যাপ্লয়েড বলে।
(৩) নিউক্লিয়স একবারই চারটি দশায় এবং সাইটোপ্লাজম একটি দশায় বিভাজিত হয়।	(৩) নিউক্লিয়স এবং সাইটোপ্লাজম দুবার উপর্যুপরি বিভক্ত হয়।
(৪) দুটি অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়।	(৪) চারটি অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়।
(৫) অপত্যকোষের ক্রোমোজোমে জীনের (gene) জোটবদ্ধতা (combination) মাতৃকোষের অনুরূপ।	(৫) ক্রসিং ওভারের ফলে অপত্যকোষের ক্রোমোজোমে জীনের জোটবদ্ধতা মাতৃকোষের মত থাকে না।

মাইটোসিস	মায়োসিস
(৬) প্রফেজ দশা মায়োসিসের প্রথম প্রফেজ অপেক্ষা স্বল্পস্থায়ী এবং সাইন্যাপ্-সিস, কায়জমা ও ক্রসিং ওভার প্রভৃতি হয় না।	(৬) প্রথম প্রফেজ দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু উপ-পর্যায়ে ঘটে। সাইন্যাপ্সিস, কায়জমা ও ক্রসিং ওভার প্রভৃতি আবশ্যিক ঘটনা।
(৭) প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ প্রভৃতি দশাগুলি একবারই হয়।	(৭) প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ দশাগুলি দুবার সংঘটিত হয়।

অ্যামাইটোসিস (Amitosis) ঃ বহু নিম্নশ্রেণীর জীবের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়স সরাসরি দুটি অসমান অংশে বিভক্ত হয়, পরে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে অপত্যকোষের সৃষ্টি করে। ব্যাকটিরিয়া, নীল-সবুজ শৈবাল এবং ঈস্টের কোরকোদ্গমে এই প্রকার কোষ বিভাজন লক্ষিত হয়। এই প্রকার বিভাজনে প্রফেজ, মেটাফেজ ইত্যাদি বিভিন্ন দশা দেখা যায় না।

পরিচ্ছেদ **বৃদ্ধি ও জনন** (Growth & Reproduction)

বৃদ্ধি (Growth)

সজীব বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হচ্ছে দেহের বৃদ্ধি। বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের আকার, আয়তন ও ওজনের পরিবর্তন হয় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হয়। এইভাবে বৃদ্ধির ফলে বহুকোষী জীবের দেহে নূতন নূতন কলা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়।

বৃদ্ধির সংজ্ঞা : কোষ বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের বৃদ্ধি এবং কোষের আকৃতির পরিবর্তনের যে স্থায়ী অপরিবর্তনীয় অবস্থা ঘটে তাকে বৃদ্ধি বলে।

বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া : প্রথম প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের ফলে বহু নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। **দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়** এই সকল কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণ দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় ক্ষুদ্র অপত্যকোষগুলির আয়তনের প্রসার ঘটে। **তৃতীয় প্রক্রিয়ায়** কোষগুলির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন কলা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি : উদ্ভিদ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তাদের দেহের কোন-না-কোন স্থানে বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তবে বৃদ্ধির মাত্রা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে হয়। বৃদ্ধির আগে অপত্য কোষগুলির প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা থাকে এবং কোষের অভ্যন্তরে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোষ গহ্বর থাকে না। বৃদ্ধির সময় প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সেলুলোজ কণা উৎপন্ন হয় এবং কোষের আদি প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে স্থূলত্ব বাড়ায়। প্রোটোপ্লাজমের অন্যান্য বস্তুগুলি পরিবেশের বিভিন্ন অজৈব বস্তু সংগ্রহ ও পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয়। এই সকল অজৈব বস্তু যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও নাইট্রেটস ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার সরল বস্তু থেকে দেহের প্রয়োজনীয় জটিল পদার্থ সৃষ্টি সকল সজীব বস্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কোষের আকার বা আয়তন বাড়ার ফলে অনেক উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে। **একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্যাম্বিয়াম কোষ (নালিকা বাণ্ডিলের এক প্রকার ভাজক কলা) না থাকায় কেবলমাত্র কোষের আয়তন বাড়ার ফলে প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কিন্তু ক্যাম্বিয়াম কোষ এবং অগ্রস্থ ভাজক কলা থাকায় কোষের সংখ্যা এবং আয়তনের উভয় প্রকার বৃদ্ধিই ঘটে।**

উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধির স্থান ঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রধান অঞ্চল মূলত্রের এবং কাণ্ডের অগ্রমুকুলের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত। এই অঞ্চলের ভাজক কলার ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে বহু অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই কোষগুলির আয়তন বৃদ্ধির ফলে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটে। দেহের পার্শ্বস্থ কলার বৃদ্ধির ফলে কাণ্ডের এবং মূলের প্রস্থে আয়তনের বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার বৃদ্ধিকে **অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি** বলে।

উদ্ভিদের পাতা, ফল, ফুল এবং আকর্ষ ইত্যাদির বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলে না। এই সকল অংশে বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এইজন্য এই প্রকার বৃদ্ধিকে সীমিত বা **নির্দিষ্ট বৃদ্ধি** বলে।

মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of growth): প্রতি উদ্ভিদের কোষের আয়তন ও বিভাজনের ফলে বৃদ্ধির হার প্রথমে বাড়তে বাড়তে অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং পরবর্তী কালে হ্রাস পেতে পেতে একেবারে থেমে যায়। এর ফলে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। বৃদ্ধি শুরু হওয়া থেকে একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়কে **মুখ্য বৃদ্ধিকাল** বলে। একটি **লেখ কাগজে** (graph paper) উদ্ভিদের যে-কোনও অঙ্গের বৃদ্ধির পরিমাণ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সময় অনুযায়ী ছক রাখলে এই মুখ্য বৃদ্ধিকালের চিত্রটির আকার S-এর মত হবে।

বৃদ্ধির হার মাপবার বিভিন্ন যন্ত্র ঃ (১) একটি গোলাকার সম অংশে বিভক্ত **স্পেইস্ মার্কার** এবং ইণ্ডিয়া-ইঙ্ক নামক কালির দ্বারা মূলের উপর দাগ দেওয়া যায় এবং পরে মূলের বৃদ্ধি হলে কোন্ অঞ্চলের বৃদ্ধি অধিক তা দাগের অন্তর্বর্তী স্থান দেখে নির্ণীত হয়। (২) **আর্কইণ্ডিকেটার** নামক যন্ত্রের সাহায্যে কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়। এই দুটি পদ্ধতি ব্যতীত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক উদ্ভাবিত **ক্রেসকোগ্রাফ** নামক যন্ত্রের সাহায্যেও বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায়।

প্রাণীদের বৃদ্ধি ঃ

উদ্ভিদের মত প্রাণীদের বৃদ্ধি স্থানীয় না হয়ে দেহের সকল অংশে ঘটে। প্রাণীদের দেহের বৃদ্ধিতে সকল কলা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অংশ গ্রহণ করে, তবে সর্বত্র একই পরিমাণে বৃদ্ধি নাও হতে পারে। মানুষের বাল্যকাল থেকে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত দেহকাণ্ড এবং হস্ত-পদাদি যে মাত্রায় বৃদ্ধি পায় মাথা কিন্তু সে মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এর ফলে দেহের অনুপাতের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়।

প্রাণীদের জীবনের অন্য সময় অপেক্ষা জন্মের পরের বৃদ্ধির পরিমাণই অধিক। কিন্তু যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই বৃদ্ধির হার কমতে কমতে পরিণত অবস্থায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের দেহের মৌল বৃদ্ধি তার দেহের অস্থিতন্ত্রের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। অস্থির বৃদ্ধি তার কার্টিলেজ বা তরুণাস্থির অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। এই প্রকার অস্থির বৃদ্ধি মানুষের কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত হয়।

মানুষের আপেক্ষিক বৃদ্ধির মাত্রা ঃ

(১) শিশুদের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুত হয়, পরে কিছুকাল দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ কমে যায়। (২) তিন বৎসর থেকে বার বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় হতে থাকে, কিন্তু আয়তনের বৃদ্ধি হয়। (৩) বয়ঃসন্ধির সময় থেকে বৃদ্ধির মাত্রা পুনর্বার দ্রুত হয়। (৪) বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করার পরে বৃদ্ধির পরিমাণ আবার কমতে থাকে। (৫) পঁচিশ বছর বয়সের পরে অস্থির তরুণাস্থি অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে অস্থিতে পরিবর্তিত হওয়ায় দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু প্রস্থে বৃদ্ধি চলতে থাকে। (৬) বৃদ্ধ বয়সে দেহের সকল কোষের ক্ষয় শুরু হওয়ায় বৃদ্ধি হয় না।
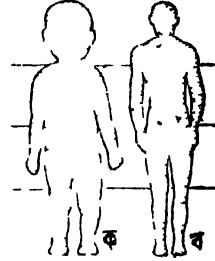
২২নং চিত্র ॥ মানুষের দেহের আপেক্ষিক বৃদ্ধির দৃশ্য—(ক) শিশুর মস্তক সমগ্র দেহের চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু (খ) পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মস্তক সমগ্র দেহের আট ভাগের এক ভাগ।

বৃদ্ধির বিভিন্ন উপাদান ঃ জীবের বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যথা –হরমোন, খাদ্য, বায়ু, জল, আলো এবং তাপমাত্রা।

(১) **হরমোন ঃ** উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহে উৎপন্ন হরমোন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা বিপাকক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ দেহে অক্সিন, জিব্বারেল্লিন, সাইটোকাইনিন এবং প্রাণীদের দেহে পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির S.T.H. ও থাইরক্সিন ইত্যাদি হরমোন বিভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) **খাদ্য ঃ** কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু সংশ্লেষের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুর বৃদ্ধির ফলে কোষ বিভাজন দ্বারা অপত্যকোষের সৃষ্টি হয়ে বৃদ্ধি ঘটে। এজন্য জীবদেহে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। খাদ্য কেবলমাত্র যে প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু সংশ্লেষ করে তাই নয় বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক শক্তিও যোগায়।

(৩) **বায়ু ঃ** বায়ুর অন্যতম উপাদান অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে শ্বেতসার খাদ্য উৎপাদন করে এবং প্রাণীরা উদ্ভিদ থেকে তা খাদ্য-রূপে গ্রহণ করে। বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন কোষের শ্বসন চলে যার ফলে দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তির দ্বারা কোষের প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তার বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে দেহেরও বৃদ্ধি ঘটে।

(৪) **জল ঃ** জলই জীবের জীবন কারণ প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশই জল। জল ব্যতীত উদ্ভিদ মাটি থেকে খাদ্য সংশ্লেষের উপাদান শোষণ এবং সালোকসংশ্লেষ

করতে পারে না। জল ব্যতীত জীবদেহের বিপাকক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ফলে মৃত্যু ঘটে। উদ্ভিদ কোষ জল গ্রহণ করে বর্ধনশীল অঙ্গের রসস্ফীতির দ্বারা চলন ঘটায়।

(৫) **আলো ঃ** উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য সূর্যালোক যেমন প্রয়োজন সেরূপ আলোকবৃত্তীয় চলনের জন্যও প্রয়োজন। আবার আলোর দ্বারা উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজমের সুস্থতাও রক্ষিত হয়।

(৬) **তাপমাত্রা ঃ** জীবকোষের উৎসেচক ক্রিয়া নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিক তাপে উৎসেচক ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় জীবদেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সংশ্লেষ হয় না ফলে বৃদ্ধিও বন্ধ থাকে। আবার কম তাপমাত্রায় প্রোটোপ্লাজমে নিষ্ক্রিয়তার জন্য বৃদ্ধির হার কমে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পার্থক্য ঃ (১) উদ্ভিদের বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে স্থানে ভাজক কলা আছে সেই স্থানের কোষ বিভাজনের দ্বারা ঘটে কিন্তু প্রাণীদের বৃদ্ধি দেহের সকল অংশে হয়। (২) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সারা জীবন ধরে হয় কিন্তু প্রাণীদের বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। / ১০.৭.৫০

/ জনন (Reproduction)

সজীব বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের মত গুণসম্পন্ন ও আকারবিশিষ্ট সজীব বস্তুর সৃষ্টি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেকটি সজীব বস্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচে এবং পরিণত বয়সের [illegible] মৃত্যু হয়। যদি মৃত্যুর আগে এক বা একাধিক সন্তান না রেখে যেতে পারে তাহলে সেই প্রকার জীবের বংশধারা লুপ্ত হয়ে যায়, এজন্য প্রত্যেকটি সজীব বস্তুই নিজের বংশরক্ষার ও বংশবিস্তারের জন্য সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়।

জননের সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় জীব তার সমগুণসম্পন্ন জীবের উৎপত্তি করে তাকে জনন (reproduction) **বলে।**

জননের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের বংশবৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীতে তাদের প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

জীব জগতে বিভিন্ন প্রকার জনন

বিশাল বৈচিত্র্যময় জীব জগতে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী বিশাল বিশাল উদ্ভিদ ও প্রাণীরা আছে এবং এদের জনন প্রক্রিয়াও বিভিন্ন প্রকার। এই সকল জনন প্রক্রিয়া জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও দেহ গঠনের জটিলতা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

জীবের বিভিন্ন প্রকার জননকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—(১) **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction) ঃ এই প্রকার জননে জীবদেহের কোনও অংশ মাতৃদেহ থেকে কোনও ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপযুক্ত পরিবেশে অপত্য জীবের সৃষ্টি করে। (২) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction) ঃ এককোষী জীবের কোষ

বিভাজনের ফলে অথবা জীবদেহের কোনও অংশের কোষের বিভাজনের ফলে উৎপন্ন বহু একক কোষ যাকে রেণু বা স্পোর (spore) বলে তা উৎপন্নের দ্বারা জননকে বোঝায়, (৩) **যৌন জনন** (Sexual reproduction) ঃ হ্রাসকরণ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন জনন কোষ (ডিম্বাণু, শুক্রাণু) মিলনের ফলে ভ্রূণাণু উৎপন্ন হওয়াকে যৌন জনন বলে।

অপুংজনি বা পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) ঃ অপুংজনি বিশেষ প্রকারের জনন যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সচরাচর জীব জগতে দেখা যায় না। স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণুর, পুং জনন কোষ বা শুক্রাণু দ্বারা নিষেক ব্যতীত ভ্রূণাণু উৎপন্ন করাকে অপুংজনি বলে। উদাহরণ—নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ, যথা—স্পাইরোগাইরা, মিউকর। প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ মৌমাছি, বোলতা ও পিঁপড়া ইত্যাদি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

অঙ্গজ জনন

জীব জগতের সবচেয়ে সহজ উপায় বংশবিস্তার অঙ্গজ জননের সাহায্যে ঘটে থাকে। জীবের সাধারণ জৈবিক ক্রিয়াদি করে এমন অংশই জনন কার্য করতে পারে। অঙ্গজ জনন জীব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয়—

১) **মুকুলোদ্গম বা কোরকোদ্গম** (Budding) ঃ বিভিন্ন প্রকার নিম্ন শ্রেণীর জীবের দেহের কোনও অংশের কোষের মাইটোসিস বিভাজনের ফলে কোষ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এই প্রকার কোষ সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাতৃকোষ থেকে অপত্য কোষগুলি দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কখনও কখনও সেগুলি উপবৃদ্ধির আকার ধারণ করে একেই মুকুল বা কোরক বলে। (ক) **উদ্ভিদ** শ্রেণীর মধ্যে ঈস্ট নামক ছত্রাকের দেহের যে-কোনও অংশে এই প্রকার মুকুল দেখা দিতে পারে এবং পর পর মুকুল উৎপন্ন হয়ে মুকুল শৃংখলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে এই মুকুলগুলি মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য ঈস্টের সৃষ্টি করে। এই প্রকার অঙ্গজ জননকে মুকুলোদ্গম বলে। (খ) **প্রাণীদের** মধ্যে হাইড্রা নামক বহুকোষী একনালী দেহী প্রাণীর দেহের যে-কোনও অংশ থেকে স্ফীতাকার উপবৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। এই প্রকার উপবৃদ্ধিকে মুকুল বা কোরক বলে। পরবর্তী সময়ে মুকুলটির দৈর্ঘ্য ও আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে এবং মুকুলের অগ্রবর্তী অঞ্চলে মুখছিদ্র ও কর্ষিকার উৎপত্তি হয়। অবশেষে মুকুলের মাতৃদেহ সংলগ্ন অঞ্চলটি সংকুচিত হয়ে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য হাইড্রার সৃষ্টি করে। হাইড্রার এই প্রকার অপত্য সৃষ্টি মুকুলোদ্গম বা কোরকোদ্গম দ্বারা ঘটে। (২৪নং চিত্র)
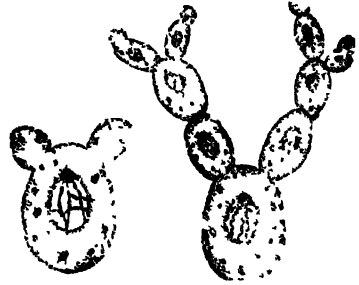
২৩নং চিত্র ।। ঈস্টের মুকুলোদ্গমের দৃশ্য।

(২) **খণ্ডিতকরণ** (Fragmentation) : (ক) নিম্নশ্রেণীর **উদ্ভিদের মধ্যে** বহুকোষী শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, যথা—স্পাইরোগাইরা, ইউলোথ্রিক্স ইত্যাদির সুতোর

২৪নং চিত্র ॥ হাইড্রার অযৌন জননে কোরকোদ্গম দ্বারা অপত্য হাইড্রার সৃষ্টির দৃশ্য।
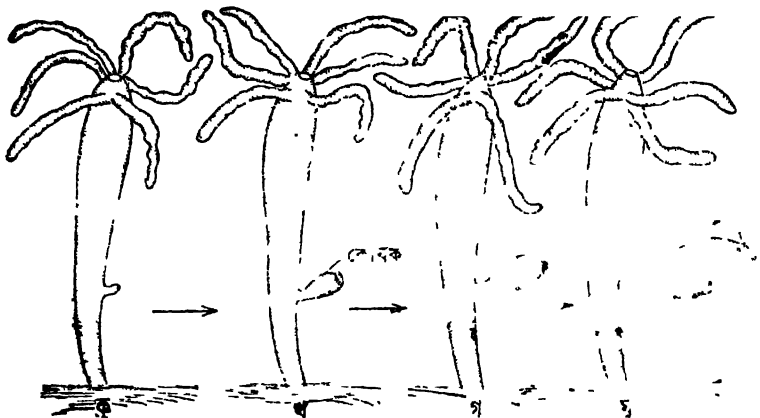
মত দেহের বিভিন্ন অংশের কোষ মৃত হলে বা কোনও কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হলে সেগুলি আবার পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই প্রকার উদ্ভিদ দেহের খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ ও পুনরায় ওই খণ্ড থেকে নূতন উদ্ভিদের জন্মকে খণ্ডিতকরণের দ্বারা জনন বলে।
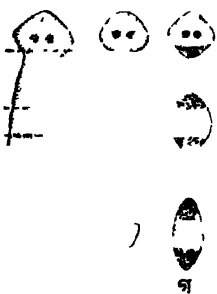
২৫নং চিত্র ॥ প্ল্যানেরিয়া নামক চ্যাপ্টাকৃমি জাতীয় প্রাণী—(ক) সমগ্র দেহকে (খ) তিনটি অংশে বিভক্ত করার পর খণ্ডিত অংশের পুনরুৎপত্তির দ্বারা। (গ, ঘ, ঙ, চ) তিনটি অপত্য প্ল্যানেরিয়ার সৃষ্টির দৃশ্য।

(খ) **প্রাণীদের** মধ্যে হাইড্রাজাতীয়, প্ল্যানেরিয়া নামক এক প্রকার চ্যাপ্টা কৃমি জাতীয় এবং কণ্টকত্বক পর্বের তারামাছ নামক প্রাণীদের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে আবার সেগুলি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে দিলে প্রতি খণ্ড থেকে নূতন অপত্য প্রাণীদের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকেও খণ্ডিতকরণ দ্বারা জনন বলে। প্রাণীদের এই প্রকার বিশেষত্ব তাদের **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতার দ্বারা ঘটে। **পুনরুৎপত্তি হচ্ছে কোনও কোনও জীবের একটি বিশেষ ক্ষমতা। (জীবদেহের কোনও অংশ আঘাত বা অন্য কোনও দুর্ঘটনায় মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের পূরণ অথবা বিচ্ছিন্ন অংশ যদি আবার নূতন জীব সৃষ্টি করতে পারে তাকে পুনরুৎপত্তি বলে)**

(৩) উচ্চশ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদের কাণ্ড, মূল বা পাতাও তাদের স্বাভাবিক কার্য ব্যতীত অঙ্গজ জনন করতে পারে। যথা—

(ক) মূলের সাহায্যে জনন : মিষ্টি আলু, শতমূলী বা ডালিয়া ইত্যাদির সঞ্চয়ী মূল থেকে মুকুল বেরিয়ে নূতন অপত্য উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়।

(খ) কাণ্ডের সাহায্যে জনন : (১) আদা, হলুদ, আলু ইত্যাদির সঞ্চয়ী কাণ্ডের গায়ে বহু চোখ থাকে। এই চোখগুলি প্রকৃতপক্ষে মুকুল এবং প্রতিটি মুকুল থেকে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের দ্বারা নূতন উদ্ভিদ উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে তাদের **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) করার ক্ষমতায় ঘটে। এই ক্ষমতায় উদ্ভিদ তার কোন ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পূরণ করতে বা একটি নূতন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে। (২) **পরিবর্তিত অর্ধবায়ব** (sub-aerial) **কাণ্ডবিশিষ্ট** ধাবক জাতীয় উদ্ভিদ যথা—**শুশনি**, আমরুল, থানকুনি ইত্যাদির কাণ্ড মাটির উপরে বৃদ্ধির সময় মূলকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন মূল, পাতা ও মুকুল উৎপন্ন দ্বারা নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। (৩) **রূপান্তরিত মুকুল**, যথা—গাছ (মেটে) আলুর কাক্ষিক মুকুল রূপান্তরিত হয়ে গোলাকার হয়, একে **বালবিল** বলে। বালবিল পরিণত অবস্থায় মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। রসুন ও কন্দপুষ্প (Globba bulbifera) ইত্যাদির পুষ্প মঞ্জরির নীচের অংশের ফুলগুলি রূপান্তরিত হয়ে বালবিল উৎপন্ন করে। এই বালবিলগুলি মাটিতে পড়লে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। (৪) বিভিন্ন প্রকার কলাগাছ, আখগাছ এবং কোনও কোনও লেবু গাছ বীজ উৎপাদন করে না, কারণ এরা বন্ধ্যা, সেজন্য এদের মূল থেকে কুঁড়ি বের হলে তা কেটে লাগাতে হয়। এই প্রকার অঙ্গজ জনন দ্বারা নূতন কলা, আখ ও লেবুগাছ উৎপন্ন হয়।

(গ) পাতার সাহায্যে জনন : পাথরকুচি পাতা ভিজা মাটিতে পড়লে **ফলকের**

২৬নং চিত্র ॥ উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন—(ক) পাথরকুচি, (খ) গাছ-আলু বালবিল ও (গ) কলাগাছ।

চারধারের খাঁজকাটা অংশ থেকে মূল ও মুকুল সৃষ্টি হয়ে বহু নূতন পাথরকুচি উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়।

অঙ্গজ জনন-পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট জাতের উদ্ভিদের বংশ বিস্তার ঃ বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট জাতের আম, লেবু, পিয়ারা, আপেল ইত্যাদি ফলবান গাছ এবং গোলাপ, ডালিয়া, জবা ইত্যাদি ফুলগাছের কলম দ্বারা নূতন নূতন একই গুণসম্পন্ন গাছ উৎপন্ন করা যায়। এই প্রকার প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে উন্নত জাতের ল্যাংড়া, ফজলি এবং হিমসাগর আম ইত্যাদির কলম উৎপন্ন করে চাষীরা বিক্রি করে। এই সকল উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার উপায়ে কলম তৈরী করা হয়। যথা—

(১) **শাখাকলম ঃ** বেল, যুঁই, হাসনুহানা, গোলাপ এবং জবা ইত্যাদি ফুলগাছের শাখা কেটে ভেজা মাটিতে লাগালে নূতন মূল উৎপন্ন হয়। আখ, সজিনা ইত্যাদি গাছেরও এইভাবে শাখাকলম করা হয়।
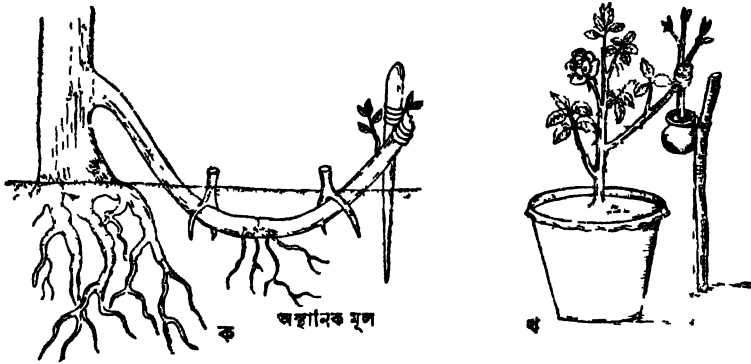
২৭নং চিত্র ॥ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কলম উৎপাদন ক দাবাকলম ও খ জোড়কলম।

(২) **জোড়কলম ঃ** একই জাতের উদ্ভিদের একটি চারাগাছের কাণ্ডের সাথে নির্দিষ্ট উন্নত মানের পরিণত গাছের শাখার কলম বাঁধা হয়। এই সময় উভয় গাছের সংযুক্তির অংশটি একটু পাতলা করে কেটে চেঁচে দিলে, জোড়কলম উৎপন্ন করতে সুবিধা হয়। যে জায়গায় কলম বাঁধা হয় উভয় গাছের কাণ্ড ও শাখা ভালভাবে জড়িয়ে বেঁধে চারদিকে মোম, মাটি, গোবর, কাপড় ইত্যাদির দ্বারা জড়িয়ে রাখতে হয়। পরে উভয় গাছ এক সঙ্গে জুড়ে গেলে জোড়কলমের পরে চারাগাছের কাণ্ড এবং যে গাছের কলম করা হচ্ছে তা আসল গাছ থেকে কেটে ফেলতে হয়। আম, আপেল, লেবু ইত্যাদি গাছের এইভাবে কলম করা হয়।

(৩) **দাবাকলম ঃ** যে গাছের কলম করা হবে তার ভূমি-সংলগ্ন শাখা বা প্রশাখা মাটির মধ্যে নুইয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হয়। পরে মাটি ক্রমাগত জলে ভিজিয়ে রাখলে মূল বেরিয়ে স্থানান্তরে লাগাবার উপযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শাখার যে অংশটি মাটিতে চাপা দেওয়া হয় তার নিচের দিকে ত্বকটি একটু কেটে দেওয়া হয়, এর ফলে মূল

সহজে উৎপন্ন হয়। মূল বেরোলে শাখাটি আদি মাতৃ-গাছ থেকে কেটে অন্যত্র লাগান হয়। লেবু, করবী, হাসনুহানা ইত্যাদি গাছের এইভাবে কলম করা হয়।

অযৌন জনন

এই প্রকার জননে এককোষ বা বহুকোষ বিশিষ্ট মাতৃদেহ দুটি অংশে বা বহু অংশে বিভাজিত হয়, একে বিভাজন বা **ফিসন** (fission) বলে। বহুক্ষেত্রে **মাতৃকোষের** নিউক্লিয়স প্রথমে বারংবার বিভাজিত হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে প্রতি অপত্য নিউক্লিয়সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে, এই প্রকার বহুবিভাজনকে **স্পোর** বা রেণু (spore) উৎপাদন বলে। **স্পোরকে অযৌন জননের একক বলে এবং এরা স্বাধীনভাবে অপত্য জীবের সৃষ্টি করতে পারে।**

(১) **ফিসন** (Fission) বা **বিভাজন :** বিভিন্ন প্রকার **এককোষী উদ্ভিদের** (শৈবাল- ব্যাকটিরিয়া) মাতৃকোষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং অপত্যকোষগুলি নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এই প্রকার বিভাজনকে **দ্বি-ভাজন** (binary-fission) বলে। অনেক শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে একবারের পরিবর্তে **বহু-ভাজন** (multiple-fission) হয় এবং তার ফলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপত্যকোষের সৃষ্টি হয় এবং **এই অপত্যকোষগুলি** বহু নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।
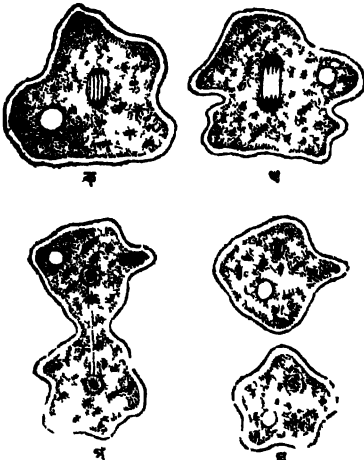
২৮নং চিত্র ॥ অ্যামিবার দ্বি ভাজনের বিভিন্ন পর্যায়—(ক) নিউক্লিয়স বিভাজন শুরু ; (খ, গ) নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজম বিভাজন, (ঘ) বিভাজন সমাপ্ত ও দুটি অ্যামিবার সৃষ্টি।
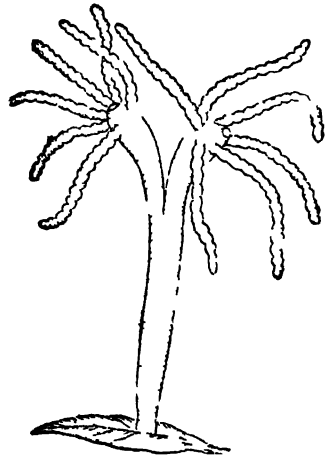
২৯নং চিত্র ॥ হাইড্রার দ্বি-ভাজনের দৃশ্য।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অ্যামিবা, মনোসিস্টিস, প্ল্যাসমোডিয়াম ইত্যাদিতে

সাধারণত অযৌন জনন দেখা যায় এবং অযৌন জনন দ্বি-ভাজন ও বহু-ভাজন উভয় প্রকারের হয়।

দ্বি-ভাজন ঃ অ্যামিবার অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়সের মধ্যভাগে সংকোচন দেখা দেয়। পরে নিউক্লিয়সটি ডাম্বেলের আকার ধারণ করে এবং মধ্যের যোজক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। পরে সাইটোপ্লাজমও দ্বিধাবিভক্ত হয়, ফলে কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও একটি অপত্য নিউক্লিয়সের চারদিকে কোষ আবরণী উৎপন্ন হয়ে একটি করে মোট দুটি অপত্য অ্যামিবা সৃষ্টি করে। এই প্রকার বিভাজনকে দ্বি-ভাজন (binary fission) বলে। বহুকোষী প্রাণী হাইড্রার দেহে অ্যামিবার মত বিভাজন হয়। হাইড্রার এই প্রকার জনন স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না কেবলমাত্র

৩০. চিত্র। ফার্ণ উদ্ভিদের ... [illegible]

পুনরুৎপত্তি ও স্থায়ী কোনো অবস্থান হওয়ার ফলে হাইড্রার দেহ প্রস্থে এবং দৈর্ঘ্যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়।

(২) রেণু বা স্পোর (spore) উৎপাদন দ্বারা জনন ঃ (ক) বহু উদ্ভিদের জনন রেণু বা স্পোর দ্বারা হয়। এই রেণু বা স্পোর উদ্ভিদের **রেণুস্থলী** বা স্পোরাঞ্জিয়ামের (sporangium) মধ্যে রেণু মাতৃকোষের **বহুভাজনের** ফলে রেণু উৎপন্ন হয়। রেণুর চারদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর থাকায় প্রতিকূল আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারে। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রাচীর ভেদ করে রেণুর ভ্রূণ অংকুরোদ্গমের সাহায্যে নূতন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। ফার্ণের পাতার নীচের দিকে বহু গুটি দেখা যায়, এগুলিকে **সোরাস** (sorus) বলে। প্রতি সোরাসের মধ্যে বহু **রেণুস্থলী** (sporangia) থাকে। প্রতি **রেণুস্থলী** প্রায় ৬৪টি রেণু উৎপন্ন করে।

বহু এককোষী বা বহুকোষী শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম বিভাজনের দ্বারা ৪, ৮ বা অধিক অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি অংশ এক একটি চলমান স্পোরে পরিবর্তিত হয়। স্পোরগুলির বাইরে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুলের মত সিলিয়া থাকায়

জলের মধ্যে সাঁতার দিতে পারে এবং কোন স্থানে সংযুক্ত হয়ে নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এই প্রকার স্পোরকে **চলরেণু** বা **জুস্পোর** (zoospore) বলে।

(খ) বহু **এককোষী প্রাণীদের** নিউক্লিয়সের বহু বিভাজনের ফলে রেণু বা স্পোর উৎপন্ন হয়। প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবার দেহের চারদিকে পর পর তিনটি আবরণীর (ত্রিস্তর আবরণীর) সৃষ্টি করে এবং সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়স বহু ভাগে বিভক্ত হয়। প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়সের চারদিকে কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম সঞ্চিত হয়ে এবং একটি **সিউডোপোডিয়োস্পোর** (pseudopodiospore) সৃষ্টি করে। পরে অনুকূল পরিবেশে বাইরের ত্রিস্তর আবরণীর ও অ্যামিবার কোষ আবরণী (প্লাজমালেমমা) ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপত্য অ্যামিবা বেরিয়ে আসে।
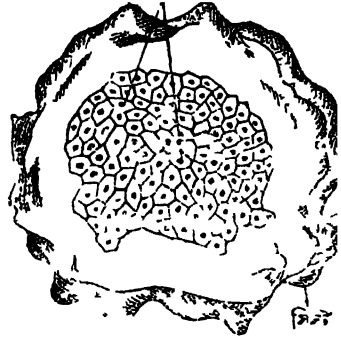
৩১নং চিত্র ॥ অ্যামিবার বহু-ভাজন দ্বারা সিউডোপোডিওস্পোর সৃষ্টির দৃশ্য।

যৌন জনন

এই প্রকার জননে দুটি **জননকোষ বা গ্যামেটের** (gamete) প্রয়োজন এবং জননকোষগুলি রেণু বা স্পোরের মত অতি ক্ষুদ্র আকারের হয়। যৌন জননে দুটি এক আকারের সম জননকোষ বা ভিন্ন আকারের অসম-জননকোষ মিলিত হয়ে **জাইগোট** (zygote) বা **ভ্রূণাণু** উৎপন্ন করে। এককোষী ভ্রূণাণুর কোষ বিভাজনের ফলে ভ্রূণ (embryo) উৎপন্ন হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধির ফলে বহুকোষী উদ্ভিদ বা প্রাণী উৎপন্ন হয়। যৌন জননে দুটি এক প্রকার জননকোষের মিলনকে **সংশ্লেষ** বা **কনজুগেশন** (conjugation) এবং বিষম আকার জননকোষের মিলনকে **নিষেক** (fertilization) বলে। একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর সাথে অপর প্রাণী বা উদ্ভিদের ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর মিলনকে **পরনিষেক** (cross-fertilization) বলে।

যৌন জননে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন জনন অঙ্গ : জীবদেহে জননকোষ উৎপন্নকারী অঙ্গকে জনন অঙ্গ বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংজননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে **পুংস্তবক** (androecium) বলে। ইহা ফুলের পাপড়ি বা দলমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থিত ফুলের তৃতীয় স্তবক। সপুষ্পক উদ্ভিদের স্ত্রীজননকোষ উৎপন্নকারী জনন অঙ্গটি ফুলের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত **স্ত্রীস্তবক** (gynoecium)। প্রাণীদের দেহে পুংজননকোষ বা শুক্রাণু এবং স্ত্রীজননকোষ বা ডিম্বাণু উৎপন্নকারী জনন অঙ্গগুলি যথাক্রমে **শুক্রাশয়** (testes) এবং **ডিম্বাশয়** (ovary)। সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুলের

মধ্যে সাধারণত পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক একত্রে অবস্থান করে - এই প্রকার **ফুলকে উভয়লিঙ্গ** (hermaphrodite) বলে। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের ফুলগুলিতে যে-কোনও একটি জনন অঙ্গ থাকে। এই প্রকার ফুলকে **একলিঙ্গ** (unisexual) বিশিষ্ট ফুল বলে। যথা—কুমড়ো, ঝিঙে, উচ্ছে ইত্যাদি। আবার যে সকল উদ্ভিদ-দেহে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক বিশিষ্ট ফুল উৎপন্ন হয় তাদের উভয়লিঙ্গ উদ্ভিদ বলে। অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদ এই জাতীয়। কিন্তু অনেক উদ্ভিদ যে-কোনও একটি জনন অঙ্গ বিশিষ্ট ফুল উৎপন্ন করে—তাদের একলিঙ্গ উদ্ভিদ বলে। যথা—পটল, পেঁপে, তাল, খেঁজুর ইত্যাদি। প্রাণীদের দেহেও উভয় প্রকার জনন অঙ্গ থাকলে তাদের উভয়লিঙ্গ প্রাণী এবং কেবলমাত্র একটি জনন অঙ্গ থাকলে একলিঙ্গ প্রাণী বলা হয়। উদাহরণ, উভয়লিঙ্গ প্রাণী—কেঁচো, জোঁক, চ্যাপ্টা কৃমি ইত্যাদি। একলিঙ্গ প্রাণী—চিংড়ি, মাছ, ব্যাঙ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী।

যৌন জননের গুরুত্ব ঃ জীবের ক্রম-বিবর্তনে (অভিব্যক্তি) যৌন জনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জননকোষ উৎপাদনের সময়ে হ্রাসকরণ বিভাজনের (মায়োসিস) ফলে জননকোষ উৎপাদনকারী জীবের দেহকোষে অবস্থিত জনক-জননীর নিকট হতে প্রাপ্ত ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশের বিনিময় বা ক্রসিং ওভারের সময় জীনবিন্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে যে জননকোষ উৎপন্ন হয় তার মধ্যে মাতাপিতার বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত হয়। দুটি জীবের জননকোষের মিলনে যে জীব উৎপন্ন হবে তার মধ্যে নূতন চরিত্রের আবির্ভাব হয়। এই প্রকার নূতন নূতন চরিত্রের আবির্ভাবের ফলে জীবের ক্রম বিবর্তন ঘটে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন ঃ

পরাগরেণু ও পুং জননকোষের উৎপাদন ঃ সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে অবস্থিত পুংজনন অঙ্গকে পুংস্তবক বলে। ইহা একাধিক পুংকেশর দ্বারা গঠিত। পুংকেশরের পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণুর মাতৃকোষগুলির প্রত্যেকটি উপর্যুপরি দুবার বিভাজন হয় বলে প্রতি মাতৃকোষ থেকে চারটি করে পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। এই প্রকার কোষ বিভাজন মায়োসিস পদ্ধতিতে হওয়ায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস হয়ে অর্ধেক ($2n$ থেকে n) হয়ে যায়। পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে পরাগ সংযোগের পরে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়।

গর্ভাধানের পূর্বে পরাগরেণুর নিউক্লিয়স দুটি অসমান ভাগে বিভক্ত হয়, এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টিকে **নলিকা বা টিউব নিউক্লিয়স** (tube nucleus) এবং ছোটটিকে **জনন নিউক্লিয়স** (generative nucleus) বলে। পরাগরেণুর বাইরে বহিস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক থাকে এবং বহিস্ত্বক ভেদ করে অন্তস্ত্বক নলিকার আকারে বেরিয়ে আসে, একে **পরাগ নলিকা** (pollen tube) বলে। পরাগ নলিকা গর্ভমুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে ডিম্বাশয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, এই সময় পরাগ নলিকার অগ্রভাগ নলিকা নিউক্লিয়স

ও পশ্চাতে জনন নিউক্লিয়স থাকে। পরে জনন নিউক্লিয়স দু ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি শুক্রাণু উৎপন্ন করে এবং নলিকা নিউক্লিয়সটি বিনষ্ট হয়।
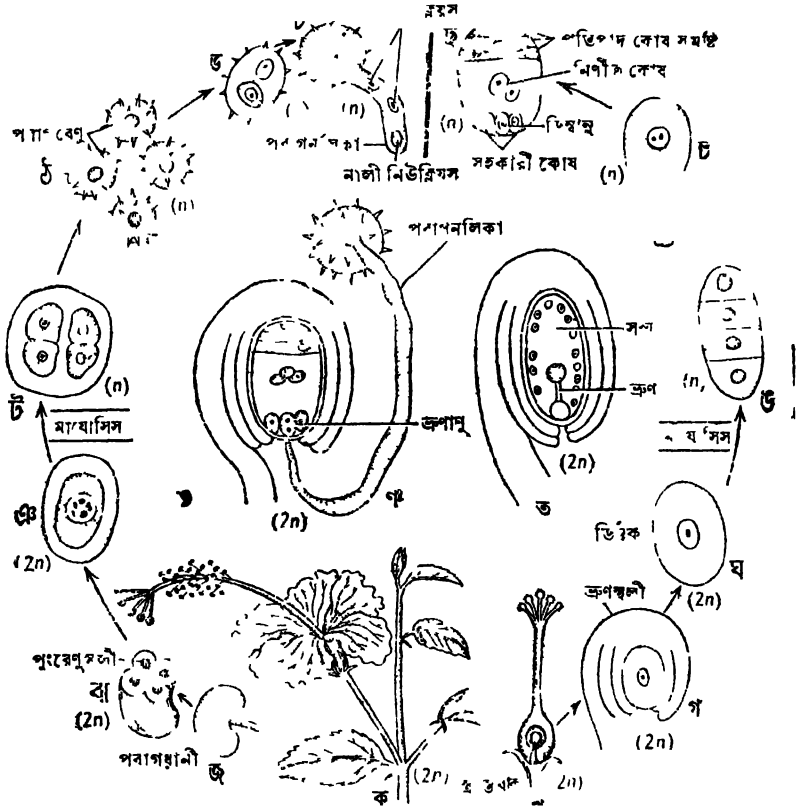
৩২নং চিত্র ॥ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে ক্রোমোজোম সংখ্যার অবস্থিতি এবং জননকোষ উৎপাদনের দৃশ্য। (জ—চ) পরাগরেণু উৎপাদন এবং শুক্রাণুর (জনন নিউক্লিয়স) সৃষ্টি, (খ—ছ) ডিম্বাণু উৎপাদনের দৃশ্য। (গ—ত) নিষেক ও ভ্রূণাণুর সৃষ্টি।

ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর সৃষ্টি : সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফুলের কেন্দ্রে অবস্থিত স্ত্রীজনন অঙ্গকে স্ত্রীস্তবক বলে। স্ত্রীস্তবকের নীচের অংশটি স্ফীত. এই অংশকে ডিম্বাশয় বলে। ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বক (ovule) একটি বৃন্ত বা অমরার (placenta) সাহায্যে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরে সংযুক্ত থাকে। অমরা মাতৃদেহ থেকে ডিম্বকের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু সরবরাহ করে। ডিম্বকেও পরাগরেণুর মত মায়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে অর্ধেক (n) হয়ে যায় এবং চারটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হয়। চারটি অপত্য কোষের মধ্যে

তিনটি অবলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র থাকে। এই কোষটি আবার বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়স উৎপন্ন করে। নিউক্লিয়স দুটি ডিম্বকের উভয় প্রান্তে অবস্থান করে। উভয় নিউক্লিয়সে দুবার উপর্যুপরি বিভাজনের ফলে উভয় প্রান্তে চারটি করে নিউক্লিয়স উৎপন্ন হয়। উভয় প্রান্ত থেকে একটি করে নিউক্লিয়স ডিম্বকের মধ্যভাগে মিলিত হয়, একে **নির্ণীত নিউক্লিয়স** (definitive nucleus) বলে। দুটি নিউক্লিয়সে n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকায় উভয়ের মিলনে ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n$ হয়। ডিম্বক রন্ধ্রের নিকট অবস্থিত তিনটি কোষের মধ্যে একটি **ডিম্বাণু** এবং বাকী দুটিকে **সহকারী কোষ** (synergid) এবং ডিম্বাশয়ের বিপরীত প্রান্তের তিনটি কোষকে **প্রতিপাদ কোষ** (antipodal cell) বলে।

গর্ভাধান (Fertilization) **:** পরাগনলিকা দুটি শুক্রাণুসহ গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে ভ্রূণস্থলীতে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর সাথে একটি শুক্রাণু মিলিত হয়ে **ভ্রূণাণু** (zygote) উৎপন্ন হয়। শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনকে **গর্ভাধান** (fertilization) বলে। অন্য শুক্রাণুটি নির্ণীত নিউক্লিয়সের সাথে মিলিত হয়ে **সস্য নিউক্লিয়স** (endosperm nucleus) সৃষ্টি হয় এবং সস্য নিউক্লিয়স বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে বীজের সস্য (endosperm) উৎপন্ন করে। নির্ণীত নিউক্লিয়সের সাথে দ্বিতীয় শুক্রাণুর মিলনকে **দ্বি-গর্ভাধান** (double fertilization) বলে। $2n$ সংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত নির্ণীত নিউক্লিয়সের সঙ্গে n সংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রাণুর মিলনে সস্য নিউক্লিয়সের ক্রোমোজোম সংখ্যা $(2n+n)=3n$ হয়।

পরাগধানী ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে মায়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে পরাগরেণু ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় এবং কোষগুলির ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় উদ্ভিদের জননের এই পর্যায়কে **হ্যাপ্লয়েড** (n) পর্যায় বলে। পরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণাণু উৎপন্ন করলে ক্রোমোজমগুলি পুনরায় জোড়ায় জোড়ায় হয় বলে পরবর্তী পর্যায়কে **ডিপ্লয়েড** ($2n$) পর্যায় বলে। ভ্রূণাণু থেকে ভ্রূণ এবং পরে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল, ফুল উৎপন্ন হয়, সুতরাং এদের মধ্যেও ডিপ্লয়েড $2n$ সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

প্রাণীদের যৌন জনন : যৌন জননের মূল পদ্ধতি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রায় একই প্রকার। কারণ উদ্ভিদের মত প্রাণীদের প্রায় প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম জোড়ায় জোড়ায় (ডিপ্লয়েড বা $2n$) থাকে এবং শুক্রাণু বা ডিম্বাণু উৎপন্নের সময় মায়োসিস বিভাজনের দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমের জোড়া হ্রাস পেয়ে একক বা অর্ধেক (হ্যাপ্লয়েড বা n) হয়।

প্রাণীর জননকোষ ও নিষেকের বর্ণনা : পুং জননকোষ বা শুক্রাণু (Sperm) : বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর জননকোষ আকার ও আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রাণীদের পুং জননকোষ বা শুক্রাণু (sperm) আয়তনে ডিম্বাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় বহু উৎপন্ন হয়। শুক্রাণুর অতিসূক্ষ্ম লেজ থাকে এবং লেজের সঞ্চালনের সাহায্যে চলাচল করতে পারে।

স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু (Ovum) : ডিম্বাণুর আকার সাধারণত স্ফীত, ডিম্বাকার বা গোলাকার এবং এরা স্থির থাকে, নড়াচড়া করে না। মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পাখীর ডিম্বাণু প্রচুর পরিমাণে কুসুমযুক্ত হয়। সরীসৃপ ও পাখীর প্রতিটি ডিম সচ্ছিদ্র খোলকের (shell) মধ্যে ঢাকা থাকে। বিভিন্ন পাখী ও মানুষের **ডিম্বাণু দেহের মধ্যে আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কোষ।**

নিষেক (Fertilization) : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ভ্রূণাণু উৎপন্ন হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে **নিষেক** বলে। প্রাণীদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন তাদের দেহের বাইরে বা অভ্যন্তরে হয়। অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মৎস্য, ব্যাঙ ইত্যাদি মেরুদণ্ডী প্রাণীরা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জলের মধ্যে পরিত্যাগ করে। একই প্রজাতির প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এর ফলে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন জলের মধ্যে ঘটে। এই প্রকার নিষেককে **বহিঃনিষেক** (external fertilization) বলে। সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের পুরুষ প্রাণীরা স্ত্রী প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরে শুক্রাণু ত্যাগ করে এবং শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষেকের ফলে ভ্রূণাণু উৎপন্ন হয়। এই প্রকার নিষেককে **অন্তঃনিষেক** (internal fertilization) বলে।

কুনো ব্যাঙের জনন (Reproduction in toad) : প্রত্যেক জীবের ন্যায় ব্যাঙেরা তাদের বংশ রক্ষার জন্য নূতন সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। ব্যাঙের **যৌন দ্বিরূপতা** (পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যাঙের বহিরাকৃতির বিভিন্নতা যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী প্রাণীকে চেনা যায়) আছে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ব্যাঙের অগ্রপদের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় স্পঞ্জের মত মাংসল অংশ—**থাম্ব প্যাড** (thumb pad), গলদেশের চামড়া ঈষৎ হলুদ রঙের এবং চামড়ার নীচে কালো রঙের **স্বরথলি** বা **ভোকাল স্যাক** (vocal sac) থাকে। স্ত্রী ব্যাঙের এগুলি থাকে না। **প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ব্যাঙ স্বরথলির মাধ্যমে শব্দ উৎপাদন দ্বারা স্ত্রী ব্যাঙকে আহ্বান করে।**

৩৩নং চিত্র ॥ পুরুষ কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র।

(ক) পুরুষ ব্যাঙের শুক্রাশয় (Testis) : প্রতিটি বৃক্কের অঙ্কীয়-দেশে একটি লম্বা, গোলাকার ও ঈষৎ হলদে রঙের শুক্রাশয় ধারণ-ঝিল্লীর দ্বারা বৃক্কের

সাথে সংযুক্ত থাকে। শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু মাতৃকোষগুলির হ্রাসকরণ বিভাজনের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্রাণুর (n) সৃষ্টি হয় এবং বৃক্কের সংগ্রহ নালীর মধ্যে দিয়ে গবিনীতে পড়ে। পরে গবিনী হয়ে অবসারণী ও অবসারণী ছিদ্রের দ্বারা বেরিয়ে যায়। শুক্রাণুগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ·০২—·০৩ মি মি. এবং একদিকে ঈষৎ স্থূল মস্তক ও পেছনে সুতোর মত পুচ্ছ থাকে। পুচ্ছের সাহায্যে শুক্রাণু জলে সাঁতার কাটে এবং ডিম্বাণুর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিষেক ঘটায়।

(খ) **স্ত্রী ব্যাঙের ডিম্বাশয় (Ovary) :** বৃক্কের উভয়দিকের দেহগহ্বরে পৃষ্ঠের সাথে যুক্ত একটি করে মোট দুটি ডিম্বাশয় আছে। প্রতিটি ডিম্বাশয় ছয়-সাতটি ভাঁজযুক্ত এবং ডিম্বাশয়ের ছোট-ছোট গহ্বরের মধ্যে ডিম্বাণু মাতৃকোষের হ্রাসকরণ বিভাজনের দ্বারা ডিম্বাণু (n) উৎপন্ন হয়। অপরিণত অবস্থায় ডিম্বাশয়ের রঙ হরিদ্রাভ কিন্তু পরিণত অবস্থায় ধূসর বা কালো রঙের হয়। প্রতিটি ডিম্বের আয়তন প্রায় ১৭ মি. মি এবং ডিম্বগুলি প্রচুর কুসুমযুক্ত হয়। মাতৃদেহ হতে প্রাপ্ত কুসুমের মধ্যে প্রচুর বৃদ্ধির উপাদান থাকায় নিষিক্ত ডিম্ব বা ভ্রূণাণুর মাতৃদেহের বাইরে বৃদ্ধির সময় কোনও খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। পরিণত ডিম্বাণু-গুলি ডিম্বাশয়ের আবরণী ফেটে দেহ-গহ্বরের মধ্যে মুক্ত হয় এবং দেহগহ্বরের মধ্যে উপস্থিত অজস্র সূক্ষ্ম রোমের ন্যায় সিলিয়ার দ্বারা ডিম্ব-নালীর ফানেলের মধ্যে প্রবেশ করে।
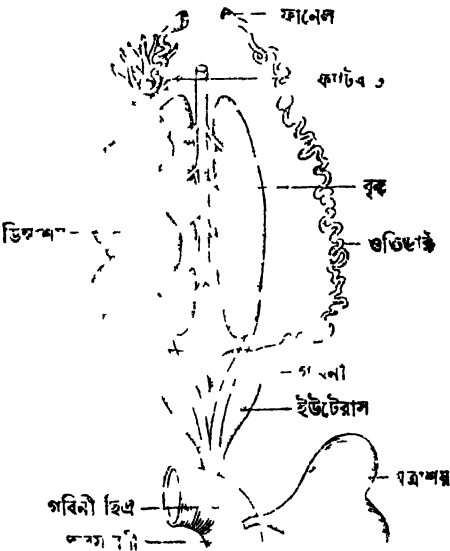
৩৪নং চিত্র ॥ স্ত্রী কুনো ব্যাঙের জননতন্ত্র।

ডিম্বনালীর ফানেলের ভিতর দিয়ে ডিম্বগুলি বাহিত হয়ে ইউটেরাসে সাময়িক সঞ্চিত থাকে এবং পরে অবসারণী ও অবসারণীর ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে।

নিষেক : বর্ষাকালে খানা, ডোবা বা জলা জমিতে পুরুষ ব্যাঙের ডাকে স্ত্রীব্যাঙ আকৃষ্ট হয়ে নিকটে এলে পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রীব্যাঙের পৃষ্ঠদেশে অগ্রপদের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। এই অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত করার পর জলের মধ্যে স্ত্রীব্যাঙ ডিম্বাণু এবং পুরুষ ব্যাঙ শুক্রাণু ত্যাগ করে। শুক্রাণুগুলি জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে এবং এক একটি শুক্রাণু এক একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুগুলি মিলিত হয়ে বহু ভ্রূণাণু বা জাইগোট ($2n$) সৃষ্টি করে। এককোষী

জাইগোট মাইটোসিস্‌ পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহুকোষী ভ্রূণের উৎপত্তি করে। ভ্রূণ নানা পরিবর্তনের দ্বারা **শূক বা লার্ভায়** (larva) পরিণত হয়।

শূক বা লার্ভা কাকে বলে : শূক হচ্ছে কোনও প্রাণীর ভ্রূণাণু থেকে পরিণত প্রাণীতে উপনীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়, যে সময় এগুলির সঙ্গে পরিণত প্রাণীর বহিরাকৃতির কোন সাদৃশ থাকে না, কিন্তু এই সময় এরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং খাদ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে।

কুনো ব্যাঙের জীবন-বৃত্তান্ত : শূক জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে এবং পৃষ্ঠ থেকে অঙ্কীয়দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত **বিজোড় পাখনা**, একজোড়া চক্ষু ও
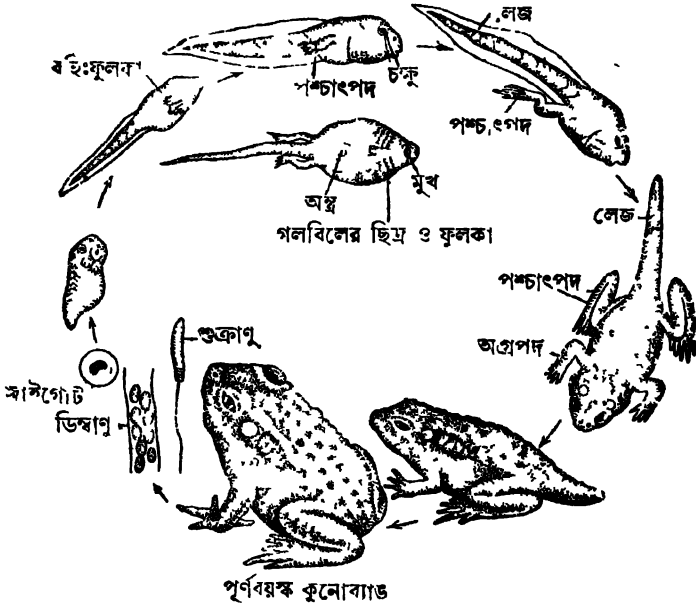
৩৫নং চিত্র ॥ পূর্ণাঙ্গ কুনো ব্যাঙের জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন পর্যায়।

বহিঃফুলকা থাকে। পরে মুখছিদ্র ও পৌষ্টিকনালীর উৎপত্তি হয় এবং এই সময় শূককে **ব্যাঙাচি** বলে। এরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং শক্ত চোয়ালের সাহায্যে জলজ উদ্ভিদ খায় এবং বহিঃফুলকার পরিবর্তে এদের **অন্তঃফুলকার** উৎপত্তি হয়। এই সময় লেজের গোড়ার কাছে একজোড়া **পশ্চাৎপদ** বের হয় এবং অন্তঃফুলকার পরিবর্তে **ফুসফুসের** উৎপত্তি হয়। অবশেষে মস্তকের পেছনে একজোড়া **অগ্রপদের** সৃষ্টি হয়, লেজ ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং ব্যাঙাচি ফুসফুসের সাহায্যে নিশ্বাস নিতে শুরু করায় জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে শুরু করে। ক্রমশ লেজটি অবলুপ্ত হয় এবং ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়। ব্যাঙাচি হতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে উপনীত হওয়ার নানাপ্রকার পরিবর্তনকে **রূপান্তর** (metamorphosis) বলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বংশগতি (Heredity)

যে-কোন জীব তার নিজের আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি করে। কুকুর বা বিড়ালের শাবক কুকুর বা বিড়াল হয়, শিয়াল হয় না। মানুষের শিশুরা তাদের পিতামাতার মত হয়, এমন কি দাদু-দিদিমা, ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার অনেক গুণও পায়। সেই প্রকার আমগাছে আম বা জামগাছে জাম হয়, আমগাছে জাম হয় না। সুতরাং জীবজগতে সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতামাতার বা বংশের গুণ পায়। এমন কি অনেক বংশগত রোগও সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন প্রকার চোখের রোগ, টেরা চোখ, মাথায় টাক বা চোখের তারার রঙ ইত্যাদি সন্তান-সন্ততিরা পিতামাতার কাছ থেকে পায়।

বংশগতির সংজ্ঞা : পিতামাতার বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হওয়াকে বংশগতি (heredity) বলে।

একই পিতামাতার সন্তান-সন্ততি পিতামাতার গুণসম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে, এমনকি কোনও মানুষের প্রত্যেক আঙুলের রেখা তার ভাইবোনের বা অন্য কারও সঙ্গে এক হয় না। সন্তান-সন্ততির মধ্যে এই প্রকার বৈসাদৃশ্যকে **পরিবৃত্তি** (variation) বলে। পিতামাতার সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশগত চারিত্রিক সাদৃশ্যগুলি অনুধাবন করা, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে জানার জন্য জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখাকে **সুপ্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্স** (genetics) বলে।

সুপ্রজনন বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা : চাষ-আবাদ, পশুপালন ইত্যাদির উন্নতি এই বিদ্যায় জ্ঞানলাভ দ্বারা সম্ভব হয়। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা বিভিন্ন পশুপাখীর উন্নতি বিধান দ্বারা দুধ, মাংস বা ডিম ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধিও এই বিদ্যার সাহায্যে করা যায়। মানুষের উন্নত বংশধারার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয়ে সুপ্রজননবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

বংশগতি ও সুপ্রজননবিদ্যা অনুশীলনের ইতিহাস : প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে **চরক, সুশ্রুত** ইত্যাদি ঋষিগণ বংশগতির বিষয়ে অনুশীলন এবং বিভিন্ন বংশগত রোগ বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তী কালে জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী যোসেফ **কোয়লিউটার** (Joseph Köleuter, 1733-1806) এবং অন্যান্যরা, বিভিন্ন প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন সংকর জাতের উদ্ভিদ কৃত্রিম পরাগ সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল-কে (Gregor Johann Mendel, 1822-1884) আধুনিক **'সুপ্রজনন বিদ্যার জনক'** বলা হয়। মেণ্ডেল ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুলাই (বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়ার) হাইনজেনডর্ফ গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতাকে চাষবাসে সাহায্য করতেন। পরবর্তী কালে চাষবাসের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাকে সুপ্রজননের দ্বারা উন্নত মানের উদ্ভিদ জন্মানোর কাজে আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তী কালে তিনি অস্ট্রিয়ার ব্রুন শহরের অগাস্টিনিয়ান মঠে সন্ন্যাসীরূপে যোগদান করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানে তার আগ্রহের জন্য তিনি মঠের সংলগ্ন বাগানে উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটর গাছ নিয়ে তাদের **সংকরায়ন** (hybridization) দ্বারা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ-পরম্পরায় কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন। তার এই সকল পরীক্ষার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত তিনি গবেষণাপত্রের আকারে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে একটি অখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ তৎকালীন বিজ্ঞানীমহলের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রোগভোগের পর আধুনিক প্রজননবিদ্যার জনক এই মহান সন্ন্যাসী-বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

৩৬নং চিত্র॥ গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল

মেণ্ডেলের কাজ কিন্তু বিফলে যায় নি, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনজন বিজ্ঞানী যথাক্রমে— **ডি-ভ্রাইস** (De Vries), **কোরেনস** (Correns) এবং **ভন শারম্যাক** (Von Tschermak) এককভাবে অন্য জাতের উদ্ভিদের সংকরায়নের দ্বারা মেণ্ডেলের অনুরূপ ফলাফল লাভ করেন। তাঁদের চেষ্টার ফলেই মেণ্ডেলের কাজের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে। বর্তমানে মেণ্ডেলের নাম অনুযায়ী তাঁর সকল সূত্রগুলিকে **মেণ্ডেলিজম** বা **মেণ্ডেল-তত্ত্ব** (Mendelism) বলে অভিহিত করা হয়।

মেণ্ডেলের এক-সংকর পরীক্ষা (Mendel's Mono-hybrid cross) :

পরীক্ষার জন্য বস্তু নির্বাচন : মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষায় মটর গাছের বিভিন্ন **বিপরীত-ধর্মী বৈশিষ্ট্য** (contrasting characters)-গুলিকে বিষয়রূপে নির্বাচিত করেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত সাত জোড়া, যথা :—(১) মটর ফুলের লাল ও সাদা

রঙ, (২) মটর গাছের দীর্ঘ ও খর্ব আকার, (৩) মসৃণ ও কোঁচকানো বীজত্বক, (৪) বীজপত্রের হলুদ ও সবুজ বর্ণ, (৫) হলুদ কাঁচা শুঁটি ও সবুজ পাকা শুঁটি, (৬) স্বচ্ছ ও বাদামী বীজত্বক, (৭) স্ফীত ও সঙ্কুচিত শুঁটি।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার পদ্ধতি: মেণ্ডেল এই সকল বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পরাগ সংযোগ দ্বারা বীজ উৎপন্ন করেন। তিনি এই বীজ থেকে উৎপন্ন গাছের মধ্যে কিরূপে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায় তা লিপিবদ্ধ করেন। পরীক্ষার পূর্বে তিনি বংশানুক্রমিকভাবে একই চরিত্র প্রকাশকারী মটর গাছগুলিকে
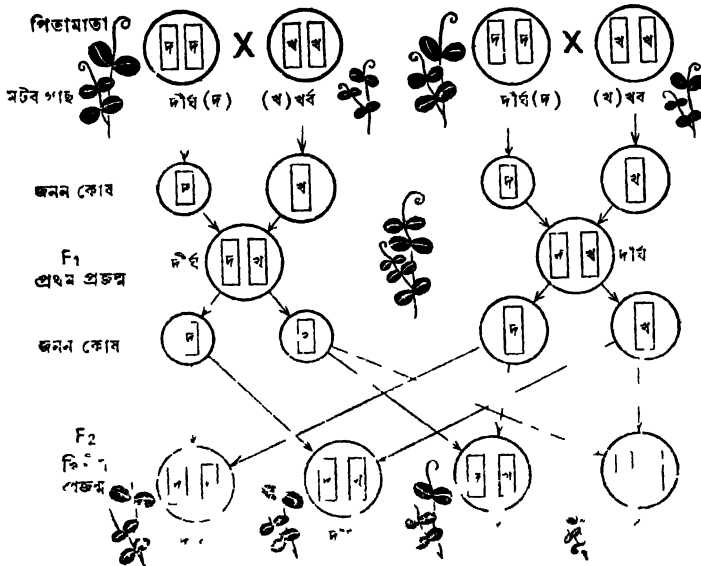
৩৭নং চিত্র। মেণ্ডেলের এক-সংকর পরীক্ষা। দীর্ঘাকার ও খর্বাকার মটর গাছের প্রথম প্রজন্মে সবগুলি দীর্ঘ ও দ্বিতীয় প্রজন্মে দীর্ঘ ও খর্ব মটর গাছের অনুপাত ৩ : ১ হওয়ার চিত্ররূপ।

নির্বাচন করেন। যথা, দীর্ঘাকার গাছ কয়েক প্রজন্মে কেবলমাত্র দীর্ঘাকার এবং খর্বাকার গাছ কয়েক প্রজন্মে কেবলমাত্র খর্বাকার মটর গাছ উৎপন্ন করলে তিনি সেগুলিকে **শুদ্ধ** (pure) গাছ বলেন। প্রথম পরীক্ষায় তিনি একটি দীর্ঘাকার মটর গাছের (প্রায় ২.১৫—৩.৭৫ মিটার) সাথে একটি খর্বাকার (প্রায় ২২—৪৫ সেণ্টিমিটার) মটর গাছের মিলন ঘটান। এই মিলনের জন্য তিনি একটি গাছের দীর্ঘাকার বা খর্বাকার ফুলের পুংকেশরচক্র কেটে দেন এবং ফুলটি থলির মধ্যে ঢেকে রাখেন। পরে তিনি বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছের পরিণত পরাগরেণু তুলির সাহায্যে গর্ভমুণ্ডে লাগিয়ে **পরনিষেক** ঘটান। এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা পুনর্বার মাটিতে বপন করে মটর গাছ তৈরী

করেন। **এই গাছগুলি দীর্ঘ ও খর্ব পিতামাতার চরিত্রের মধ্যে কেবলমাত্র দীর্ঘ চরিত্রসম্পন্ন** হয়েছে দেখেন। এখানে দীর্ঘ ও খর্ব চরিত্রের গাছ দুটিকে **জনক গাছ** বা **পেরেণ্ট** (parents) এবং দীর্ঘ ও খর্ব চরিত্র যুগলকে **অ্যালিলোমর্ফ** (allelomorph) বা **বিপরীত চরিত্র** বলে। দীর্ঘাকার ও খর্বাকার মটর গাছের অপত্যগুলিকে **সংকর** বা হাইব্রিড (hybrid) এবং এই বংশধরগুলিকে **প্রথম প্রজন্ম** বা **ফিলিয়াল ১** (F_1) বলে।

F_1 প্রজন্মের সংকর মটর গাছগুলির মধ্যে মেণ্ডেল স্ব-পরাগসংযোগ দ্বারা বীজ উৎপন্ন করে তাদের পুনর্বার মাটিতে বপন করেন। এই দ্বিতীয় প্রজন্মের (F_2) বীজগুলি থেকে যে গাছগুলি উৎপন্ন হয়েছিল তাদের মধ্যে দীর্ঘ ও খর্ব গাছের অনুপাত ৩ : ১ হয় বলে তিনি লক্ষ্য করেন। তিনি দীর্ঘাকার গাছগুলির মধ্যে স্ব-পরাগসংযোগ দ্বারা উৎপন্ন বীজ থেকে পুনর্বার অধিক সংখ্যক দীর্ঘ ও অল্প সংখ্যক খর্বাকার গাছ এবং খর্বাকার গাছ থেকে কেবলমাত্র খর্বাকার গাছ হয় দেখেন। মেণ্ডেল মটর গাছের একজোড়া বিপরীতধর্মী চরিত্র দ্বারা নিষেকের ফলে উৎপন্ন পরীক্ষাকে **এক-সংকর পরীক্ষা** বলে অভিহিত করেন। এই প্রকারে তিনি দুই জোড়া বা অধিক সংখ্যক চরিত্র দ্বারা সংকর গাছ জন্মানোর পরীক্ষাকে **দ্বি-সংকর** (di-hybrid cross), **ত্রি-সংকর** (tri-hybrid cross) ইত্যাদি নামকরণ করেন।

মেণ্ডেলের সিদ্ধান্ত : (১) মটর গাছের প্রতিটি বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলি কোষের নির্ধারণের জন্য দায়ী বস্তুগুলিকে **'ফ্যাক্টর'** (factor) বলে অবিহিত করেছিলেন। ফ্যাক্টরগুলি জনন কোষের (পরাগরেণু ও ডিম্বক) মাধ্যমে পরবর্তী অপত্য বা বংশধরেরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। বর্তমানে জানা গেছে যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য দায়ী মেণ্ডেলের ফ্যাক্টর ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত **জীন** নামক বংশগতির নির্ধারক বস্তু।

(২) দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রের মধ্যে প্রথম প্রজন্মে (F_1) উভয়ের মধ্যে মিলনে কোন মধ্যবর্তী চরিত্র আবির্ভূত হয় না। যথা, দীর্ঘাকার ও খর্বাকার উদ্ভিদের মিলনে কোন মধ্যমাকৃতির গাছ হয় না। মেণ্ডেল দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রের মধ্যে যেটি F_1 প্রজন্মে প্রকাশ পায় সে চরিত্রকে **প্রকট** বা **ডোমিনেণ্ট** (dominant) এবং যেটি প্রকাশ পায় না তাকে **প্রচ্ছন্ন** বা **রিসেসিভ** (recessive) বলেন। উপরে বর্ণিত এক-সংকর পরীক্ষায় দীর্ঘাকার চরিত্রটি প্রকট ও খর্বাকার চরিত্রটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন।

(৩) মেণ্ডেলের প্রধান সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, **বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলি তার প্রজন্মের মধ্যে পরস্পর মিশে যায় না, তারা আবার জননকোষ উৎপাদনকালে পৃথক হয়ে যায়।** এই সিদ্ধান্তটিকে **মেণ্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র** (Mendel's first law বা Law of segregation) বলে। দীর্ঘাকার ও **খর্বাকার**

মটর গাছের মধ্যে পর্যবেক্ষণের F_1 প্রজন্মে সকল গাছই দীর্ঘ হয় কিন্তু তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে খর্ব চরিত্র থাকে কিন্তু যা ধ্বংস হয়ে যায় না। F_2 প্রজন্মের দীর্ঘ ও খর্ব চরিত্র দুটি বিভিন্ন অনুপাতে পৃথক হয়ে যায়।

ক্রোমোজোম ও জীন তত্ত্বের সাহায্যে এক-সংকর পরীক্ষার ব্যাখ্যা : মেণ্ডেল যে সময় বিভিন্ন মটর গাছের সংকরায়ন দ্বারা বিভিন্ন পরীক্ষা করছিলেন ক্রোমোজোম ও জীন (বংশগতির একক) সে সময় আবিষ্কৃত হয় নি। পরবর্তী কালে ক্রোমোজোমের মধ্যে এক বা একাধিক জীন যে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী তা জানা গেছে। ক্রোমোজোম ও জীনের সাহায্যে মেণ্ডেলের বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যা মেণ্ডেলবাদের সত্যাসত্য প্রমাণিত করেছে।

মেণ্ডেলের এক-সংকর মটর গাছের জনক (parents) দুটির বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘ (tall) ও খর্ব (dwarf) আকার। এই দুটি চরিত্রের জন্য দায়ী জীন তাদের ক্রোমোজোমের মধ্যে আছে। দীর্ঘাকার চরিত্র এক জোড়া সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকায় এদের দ দ (T T) এবং খর্বাকার চরিত্রও এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকায় এদের খ খ (t t) বলে চিহ্নিত করা হ'ল (৩৭ নং চিত্র)। (T—tall ; t—dwart)

কিন্তু দীর্ঘাকার ও খর্বাকার মটর গাছের মধ্যে মেণ্ডেলের নিয়ম অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করলে প্রথম প্রজন্মে সংকর জাতের লম্বা গাছ হবে। এখানে দীর্ঘাকার গাছের পুং বা স্ত্রী জননকোষের সাথে খর্বাকার গাছের পুং বা স্ত্রী জননকোষের মিলনে বংশ উৎপন্ন হয়। এই সকল জননকোষ উৎপাদন মিয়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে হওয়ায় প্রতি জননকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়।

দীর্ঘাকার মটর গাছের পরাগরেণু নিয়ে খর্বাকার গাছের গর্ভমুণ্ডে যদি লাগান হয় তাহলে এই পরাগরেণু থেকে যে শুক্রাণু উৎপন্ন হবে তাদের প্রত্যেকটিতে দ (T —(দীর্ঘাকার চরিত্রের জন্য দায়ী জীন) এবং খর্বাকার গাছের ডিম্বাণুতে খ (t) (খর্বাকার চরিত্রের জন্য দায়ী জীন) থাকবে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ভ্রূণাণুতে (embryo) উভয় জীন দ (T) ও খ (t) যে দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমে অবস্থান করে তাদের সংখ্যা পুনরায় ডিপ্লয়েড হবে। সমসংস্থ ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটিতে বিপরীতধর্মী চরিত্র থাকায় এই প্রকার ক্রোমোজোম জোড়াকে **বিষম চরিত্রযুক্ত** বলা হয়। প্রথম প্রজন্মের (F_1) ভ্রূণাণু পরবর্তী কালে দীর্ঘাকার মটর গাছের সৃষ্টি করে এবং দ দ (T T) জীন যুগলের মধ্যে দ (T) বা দীর্ঘাকার চরিত্র প্রকাশিত হয় বলে এই জীনকে **প্রকট জীন** বলে। কিন্তু খর্বাকার মটর গাছের খ খ (t t) যুগলের খ নামক জীন (t) প্রথম প্রজন্মের মটর গাছে প্রকাশ পায় না বলে একে **প্রচ্ছন্ন জীন** বলা হয়।

F_1 প্রজন্মের মটর গাছগুলি সংকর জাতের হওয়ায় জননকোষ উৎপাদন কালে ক্রোমোজোমগুলির অর্ধেক জননকোষ (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু যাই হোক না) দ জীন যুক্ত এবং অপর অর্ধেক খ জীন যুক্ত হবে। এই সকল উদ্ভিদের মধ্যে জনন ক্রিয়ায় নিষেকের ফলে বিভিন্ন জননকোষের মিলনে দ দ (T T), দ খ (T t) এবং খ খ (t t) জীন যুক্ত ক্রোমোজোমগুলি পুনরায় ভ্রূণাণুর মধ্যে মিলিত হবে। এই সকল ভ্রূণাণুর মধ্যে দ দ (T T), দ খ (T t) এবং খ খ (t t)-গুলির অনুপাত ১ঃ২ঃ১ হলেও বাহ্যিক আকার অনুযায়ী ১ দ দ (T T) ও ২ দ খ (T t) এক প্রকার দীর্ঘ বহিরাকৃতি হওয়ায় দীর্ঘাকার ও খর্বাকারের মধ্যে ৩ঃ১ অনুপাত দেখা যাবে। এই স্থানে প্রথম প্রজন্মের মধ্যে দ (T) ও খ (t) জীনের উপস্থিতিতে কোন মধ্যবর্তী চরিত্র আবির্ভূত হচ্ছে না বা এই দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্র বা অ্যালিলি (allele) মিশছে না। বরং জননকোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় সংকর মটর গাছের মধ্যে বিপরীতধর্মী চরিত্র দুটি পৃথক হয়ে যাচ্ছে, যার দ্বারা মেণ্ডেলের পৃথকীকরণ সূত্রই প্রমাণিত হচ্ছে।

বিভিন্ন ভ্রূণাণুর কোষের ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীনগত ১ দ দ ঃ ২ দ খ ঃ ১ খ খ (1 T T ঃ 2 T t ঃ 1 t t) সংগঠনকে **জীনোটাইপ** (genotype) বলে। কিন্তু ভ্রূণাণুগুলি বীজে পরিবর্তিত হওয়ার পর এবং এই বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গমের ফলে উৎপন্ন ৩ দীর্ঘ ঃ ১ খর্ব অনুপাতে উৎপন্ন বাহ্যিক আকারকে **ফিনোটাইপ** (phenotype) বলে।

মেণ্ডেলের এক-সংকর পরীক্ষার চিত্ররূপ :

F (জনিত্র)	দীর্ঘ মটর গাছ দদ (TT)	খর্ব মটর গাছ খখ (tt)
জনন কোষ	দ (T)	খ (t)

দীর্ঘ মটর গাছ
(দখ—Tt)

$F_1 \times F_1$ (প্রথম প্রজন্ম)	দীর্ঘ দখ (Tt)		দীর্ঘ দখ (Tt)	
জনন কোষ	দ (T)	খ (t)	দ (T)	খ (t)

F_2 (দ্বিতীয় প্রজন্ম)	দ (T)	খ (t)
দ (T)	দদ (TT)	দখ (Tt)
খ (t)	দখ (Tt)	খখ (tt)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্র :

ফিনোটাইপ	জীনোটাইপ	জীনোটাইপের সংখ্যা	ফিনোটাইপের সংখ্যা
দীর্ঘ	দদ (TT) দখ (Tt)	১ ২	৩
খর্ব	খখ (tt)	১	১

বংশগতি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা : মেণ্ডেলের এক-সংকর পরীক্ষার বর্ণনায় কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি প্রজননবিদ্যার বিশেষ বিষয়সংক্রান্ত। এই শব্দগুলির সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(ক) **জীন** (Gene) : **উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনও বিশেষ উপাদান যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাকে জীন বলে।** মটর গাছের দীর্ঘ ও খর্ব চরিত্রের জন্য দায়ী দুটি জীন ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে।

(খ) **অ্যালিলি** (Alleles) : যে সব জীবের ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাদের 'ডিপ্লয়েড' বলে। ডিপ্লয়েড জীবের জীনগুলিও জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং বিশেষ প্রকার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যেমন মটর গাছের দুটি দীর্ঘ (দ দ) বা দুটি খর্ব (খখ) অথবা একটি দীর্ঘ ও একটি খর্ব দখ জীন যথাক্রমে দীর্ঘ ও খর্ব চরিত্র উৎপন্ন করে। **একটি নির্দিষ্ট জীন জোড়ার দুটি স্বতন্ত্র জীনকে অ্যালিলি বলে।**

(গ) **হোমোজাইগাস** (Homozygous) : **কোন জীবের জীন জোড়ার অ্যালিলি অভিন্ন হলে তাকে হোমোজাইগাস বলে।** শুদ্ধ দীর্ঘ বা শুদ্ধ খর্ব মটর গাছে জীন জোড়ায় দদ (TT) অথবা খখ (t) অ্যালিলি থাকায় এরা হোমোজাইগাস।

(ঘ) **হেটারোজাইগাস** (Heterozygous) : কোন জীবের **জীন জোড়ায় বিভিন্ন অ্যালিলি থাকলে তাকে হেটারোজাইগাস বলে।** সংকর দীর্ঘ মটর গাছে দ (T) এবং খ (t) জীন অ্যালিলি থাকায় এরা হেটারোজাইগাস।

(ঙ) **ফিনোটাইপ** (Phenotype) : **জীনগত সংগঠনের উপস্থিতিতে কোনও জীবের বাহ্যিক আকারকে ফিনোটাইপ বলে।** যেমন শুদ্ধ ও সংকর দীর্ঘ মটর গাছের জীনগত সংগঠন দদ (TT) অথবা দখ (Tt) হলেও বাহ্যিক আকার দীর্ঘ হয়।

(চ) জীনোটাইপ (Genotype) : **কোনও জীবের জীনগত সংগঠনকে জীনোটাইপ বলে।** দীর্ঘ বা খর্ব মটর গাছের তিন প্রকার জীনোটাইপ হতে পারে। যথা—দদ (TT), দখ (Tt), এবং খখ (tt)।

মানব কল্যাণে সুপ্রজনন বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা : বংশগতি ও সুপ্রজনন বিদ্যার দ্বারা উন্নত ধরনের ফসল ও গৃহপালিত পশু-পাখীর নির্বাচন করে মানবজাতির খাদ্য-সমস্যা বহুল পরিমাণে সমাধান করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ফলবান বৃক্ষ যথা—অধিক ফলনশীল নারিকেল, আম, আপেল ইত্যাদি ও বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী শস্য যথা—**অধিক ফলনশীল ধান** (জয়া, পদ্মা, আই আর এইট প্রভৃতি), গম (কল্যাণসোনা, সোনালিকা প্রভৃতি), ভুট্টা ইত্যাদি তাদের জংলী বা বন্য পূর্বপুরুষ থেকে সুনির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে। যথা—উন্নত মানের যে কলার চাষ হয় তারা বিচিকলা জাতীয় বন্য কলা থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে। বিচিকলা ভারত ও এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের বহুস্থানে দেখা যায়।

উদ্ভিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় উন্নত মানের বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের জন্য প্রথমে যে উদ্ভিদগুলির চাষ করা হয় কখনও কখনও তাদের মধ্যে কিছু কিছু সাধারণ চরিত্রের ব্যতিক্রম দেখা দেয়। যারা চাষ-আবাদের উন্নতির জন্য অনুশীলন করেন বা কৃষকেরা এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে উন্নত বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য তাদের বীজ পৃথক করে চাষ করেন। এইরূপে যত স্বতন্ত্র চরিত্রের সৃষ্টি হয় পরবর্তী উদ্ভিদগুলি ততই তাদের বন্য বা জংলী পূর্বপুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মিউটেশন দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নূতন চরিত্রের সৃষ্টি : পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ক্রোমোজোমের জীনের গঠনের মধ্যে কোনও কারণে পরিবর্তন হ'লে তাকে **জীন মিউটেশন** (gene mutation) বলা হয়। এর ফলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে পিতামাতার চরিত্র থেকে অন্যপ্রকার চরিত্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই প্রকার জীন মিউটেশনের প্রথম বিবরণ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে পাওয়া যায়। **সেথ রাইট** (Seth Wright) নামে এক কৃষক (১৭৯১ খ্রীঃ) লক্ষ্য করেন যে, তাঁর মেষগুলির মধ্যে একটি মেষের পা-গুলি অস্বাভাবিক রকম ছোট। তিনি বংশানুক্রমিকভাবে এই মেষের চাষ বাড়িয়ে একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করেন। এদের **"অ্যানকন জাতের"** (Ancon breed) মেষ বলা হয়। যে সময় এই প্রকার পরিবর্তন বা মিউটেশনকে নূতন জাতের মেষ সৃষ্টির উৎপাদকরূপে ব্যবহার করা হয় সেই সময় বংশগতি নিরূপণের বিষয় কোনও ধারণাই ছিল না।

মিউটেশন বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন বিখ্যাত ডাচ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী **হুগো ডি ভ্রাইস** (Hugo De Vries. 1848 1935)। তিনি **ইভিনিং প্রিমরোজ** নামে হলুদ ফুলযুক্ত উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে হঠাৎ কোনও নূতন চরিত্রের উদ্ভবকে **মিউটেশন** (mutation) বলে নামকরণ করেন।

সুনির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভিদের মত বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণীদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতের উন্নতমানের প্রাণী নির্বাচন করা হয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হাঁস-মুরগ পালনে সাদা লেগহর্ণ ও রোড আইল্যান্ড রেড মুরগীর মধ্যে পরনিষেকের ফলে যে

সংকর মুরগী জন্মায় তাতে লেগহর্ণের বেশী ডিম দেওয়ার ক্ষমতার সাথে মাংসের মধ্যে রোড আইল্যাণ্ডের সুস্বাদ যুক্ত হয়। পশুপালন কেন্দ্রে অধিক দুধ দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নতমানের গাভীর উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করান হয়। উৎকৃষ্ট জার্সি-ষাঁড় ও হরিয়ানা গাভী এবং হলস্টাইন ষাঁড় ও হরিয়ানা গাভীর প্রজননের ফলে যে গাভী উৎপন্ন হয়েছে তাদের দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষমতা অধিক। পশ্চিমবাংলার হরিণঘাটায় গো-পালন কেন্দ্রে এই ভাবে নূতন জাতের গাভী উৎপন্ন করা হয়েছে।

মেণ্ডেলের কাজের সাথে সকলের পরিচয়ের আগে বিভিন্ন প্রকার সুনির্বাচিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করা হ'ত। এর দ্বারা কখনও সুফল পাওয়া যেত আবার অনেক ক্ষেত্রে বিফলও হ'তে হ'ত। বর্তমানে বংশগতি ও সুপ্রজনন বিদ্যায় গবেষণার দ্বারা এই নির্বাচন বা তার উপায় নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বিশেষত মেণ্ডেলের সূত্র অনুযায়ী কাজ করে পৃথিবীর বহু দেশ চাষ-আবাদ বা পশু পালনে অত্যন্ত সুফল লাভ করেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিব্যক্তি (Evolution)

পৃথিবীর বুকে জীবের আবির্ভাবের পর যে লক্ষ লক্ষ বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। তবুও বর্তমানে যে সকল বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীরা পৃথিবীতে দেখা যায় তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য কম নয়। এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীরা কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের পূর্বপুরুষ কেমন ছিল তা জানার ইচ্ছা মানব মনের এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

পৃথিবীতে জীবজগতের উৎপত্তি বিষয়ে দু' প্রকারের ধারণা ছিল। প্রথম ধারণা হচ্ছে—পৃথিবীর সকল জড় ও জীব যা আমরা বর্তমানে দেখতে পাই যেগুলি অতীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বে সাধারণের মনে ধারণা ছিল যে ভগবান বা কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে একদিনেই সকল জীব সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে—পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি উপাদান থেকে পৃথিবীতে জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীবে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা প্রথম ধারণাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে ও দ্বিতীয় ধারণাটি সঠিক বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে একমাত্র পৃথিবী ব্যতীত বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

জীব সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদ :

পৃথিবী সৃষ্টির বহুদিন পরে পৃথিবীর বাইরের অংশ ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকলে বায়ুমণ্ডল, জল ইত্যাদি পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বাইরের অংশ বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কোন অংশ উঁচু আবার কোনও অংশ নীচু হয়ে যায় এবং এই সব নীচু অঞ্চলে জল জমে সাগরের সৃষ্টি করে। প্রথম অবস্থায় সাগরের জলও গরম ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে তাপের মাত্রা কমে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হলে প্রাণের সৃষ্টি হয়। প্রাণের সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীমহলে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়, তার মধ্যে কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) স্বতন্ত্র সৃষ্টির মতবাদ বা বিসৃষ্টিবাদ (Theory of Special creation) অতীতে আদিম মানুষের বিভিন্ন জাতি বা উপজাতির মধ্যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত ছিল যে, ঈশ্বর বা কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীব সৃষ্টি পর্যায়ক্রমে বা একেবারে সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) **স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি মতবাদ** (Theory of Spontaneous generation) : সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত বা জড়বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বা নিজে থেকেই জীবের জন্ম হয়। তাঁরা মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ পচে গেলে তাতে কীটপতঙ্গ ও কাদার মধ্যে ব্যাঙাচি ইত্যাদি জন্মানোকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি বলে মনে করতেন। পরের দিকে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী **রেডি** ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মৃত বা পচা দেহাবশেষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কীট-পতঙ্গ জন্মাতে পারে না যদি না তাতে কীট-পতঙ্গেরা ডিম পাড়ে। রেডির ধারণা যে অভ্রান্ত তা পরবর্তী কালে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুরের** গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(গ) **গ্রহান্তর থেকে সৃষ্টির মতবাদ** (Cosmozoic Theory) : এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ প্রচার করেন যে, মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহ থেকে কোন সময় পৃথিবীতে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত সরল **জীবরেণু** (স্পোর) আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং এই রেণু থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি হয়। এই তত্ত্ব কিন্তু বিজ্ঞানীরা সমর্থন করেন নি—কারণ মহাশূন্যের অত্যধিক তাপ, শুষ্কতা এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে কোন সজীব বস্তু বাঁচতে পারে না।

(ঘ) **নৈসর্গিক তত্ত্ব** (Naturalistic Theory) : এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে তার বিভিন্ন উপাদান পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে পৃথিবী শীতল হতে থাকলে সেইসব বিচ্ছিন্ন পদার্থ মিলেমিশে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই সব যৌগিক পদার্থের মধ্যে আকস্মিকভাবে একবারই কার্বন ও নাইট্রোজেন মিলে **সায়ানোজেন** (cyanogen) নামে প্রোটীনের পূর্ববর্তী পদার্থ সৃষ্টি করে যা থেকে প্রোটীন ও প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয়। প্রোটোপ্লাজম থেকে কোষ ও সরল প্রকৃতির জীবজন্তুর উৎপত্তি হয়েছিল এবং এই জীববস্তু ব্যাকটিরিয়ার মত নিজেদের খাদ্য নিজেরাই অজৈব বস্তু থেকে প্রস্তুত করতে পারত। পরবর্তী কালে এদের অনেকের মধ্যে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হয় এবং তারা উদ্ভিদের মত সালোকসংশ্লেষ দ্বারা খাদ্য উৎপন্ন করতে থাকে. এরা এককোষী শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ। এই সব শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ আহার করে যারা প্রাণধারণ করত তারা সরল এককোষী প্রাণীর মত ছিল। এই সকল সরল জীব পরিবর্তিত হয়েই পরবর্তী কালে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) **ভাইরাস তত্ত্ব** (Virus Theory) : ভাইরাস হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, যাদের সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না এবং এক বা একাধিক প্রোটীন অণুর দ্বারা গঠিত। এদের জীবনধারা কখনও জীবের মত আবার কখনও জড়ের মত হয়। এরা কেলাসিত হয়ে বা বাতাসে ভেসে বেড়ানোর সময় জড়ের মত ব্যবহার করে আবার জীবদেহের অনুকূল পরিবেশে উপস্থিত হয়ে সজীব বস্তুর মত আচরণ করে। বিভিন্ন

বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ভাইরাস বা ভাইরাসের মত বস্তুর থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে।

জীব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ক্রমিক জটিলতার উদ্ভব ঃ পৃথিবীর সৃষ্টি ঃ বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মত অনুযায়ী পৃথিবী আজ থেকে প্রায় ৪৫০—৫০০ কোটি বৎসর আগে সূর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর সৃষ্টির সময় জলন্ত গ্যাসপিণ্ডের মত ছিল এবং এর তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের অধিক ছিল। কালক্রমে তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হয়ে ভূত্বক, অক্সিজেন ও বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা তারতম্য হওয়ার ফলে ক্রমশ পৃথিবীর ভূত্বকের কোন অঞ্চল উঁচু এবং কোন অঞ্চল নীচু হয়ে পাহাড়, পর্বত ও খাদ ইত্যাদির সৃষ্টি করেছিল।

প্রাণ সৃষ্টির উপাদান গঠন ঃ অবশেষে প্রাণ সৃষ্টির প্রধান মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন ইত্যাদির মধ্যে রাসায়নিক সংযুক্তির ফলে জল, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং অ্যামোনিয়া ইত্যাদি যৌগ পদার্থের সৃষ্টি ঘটেছিল। জল উৎপন্ন হওয়ায় পর মেঘ সৃষ্টি ও বৃষ্টিপাত ঘটতে থাকে। এইভাবে যুগযুগান্তর ধরে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টি-জল পৃথিবীর নীচু অঞ্চলে খাদের মধ্যে জমে সমুদ্র ও নদী-নালার সৃষ্টি হয়। জলের মধ্যে দ্রবীভূত প্রাণ সৃষ্টির উপাদানগুলি এবং বিভিন্ন খনিজ বস্তু দ্রবীভূত হয়ে এক প্রকার অদ্ভুত রাসায়নিক মিশ্রণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রকার রাসায়নিক মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়েছিল। এই সকল জৈব পদার্থই প্রাণ সৃষ্টির উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রাণ ও জীব উৎপত্তির স্থান ঃ অধিকাংশ সরল প্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর জীব সমুদ্রে বাস করে এবং বিভিন্ন প্রাণীর কোষ, দেহ-রস ও রক্তের মধ্যে লবণ থাকায় জীবের উৎপত্তি সমুদ্রের জলে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন প্রকার জীব পরবর্তী কালে সমুদ্র থেকে মিষ্টি-জলের নদী-নালায় প্রবেশ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্থলের উপরে উঠে আসে।

প্রাণ সৃষ্টি ঃ এইভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে কালের প্রভাবে হঠাৎ একদিন প্রাণ সৃষ্টি হ'ল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আজ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী কালে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণবস্তু থেকে আদি জীব জন্মগ্রহণ করে এবং এই সময় আদি জীবের দেহ থলথলে প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকার জড় পদার্থের সংমিশ্রণে প্রাণ পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল।

আদি জীবের সৃষ্টি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উদ্ভব ঃ প্রাণ পদার্থের সৃষ্টির পর ক্রমিক পরিবর্তনে আদি জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম সৃষ্ট আদি জীবের দেহ সরল এককোষী ছিল। এই প্রকার আদি জীব স্বভোজী না পরভোজী ছিল সেবিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতান্তর আছে। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে আদি জীবেরা তাদের

পরিবেশ থেকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করত। পরবর্তী পর্যায়ে আদি কোষের এক শ্রেণীর মধ্যে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হওয়ায় তারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এই প্রকার আদি জীব থেকে উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি হয়। আর যে সকল আদি জীব উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ ক'রে পুষ্টি লাভ করত এবং যাদের দেহে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হ'ল না তাদের থেকে প্রাণীজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল।

আদি জীব থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি ও তাদের বিভিন্নতা : পরবর্তী পর্যায়ে এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিবর্তনের ফলে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হ'ল। উদ্ভিদ জগতের মধ্যে যারা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল তারা হচ্ছে সমাঙ্গদেহী (যাদের মূল, কাণ্ড বা পাতা বলে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ থাকে না) উদ্ভিদ, সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের মধ্যে যাদের দেহে ক্লোরোফিল ছিল তারা হচ্ছে শৈবাল এবং যাদের দেহে ছিল না তারা হচ্ছে ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদ। প্রথমে শৈবাল থেকে একদিকে ছত্রাক এবং অপরদিকে মস জাতীয় ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ থেকে একদিকে ব্যক্তবীজী এবং অন্যদিকে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাব প্রায় ২০০ কোটি বৎসর আগে হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

উদ্ভিদের মত একইভাবে আদি কোষ থেকে আদি প্রাণীকোষের সৃষ্টি এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণীকোষ থেকে প্রাণী জগতের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণী জগতের প্রথম প্রাণীরা হচ্ছে এককোষী আদ্যপ্রাণী যাদের মধ্যে অ্যামিবা অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে এককোষী প্রাণী থেকে স্পঞ্জ জাতীয় ও একনালী দেহী হাইড্রা জাতীয় বহুকোষী প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর বহু পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের সৃষ্টি হতে হতে অবশেষে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে চোয়ালবিহীন ল্যামপ্রে নামক সামুদ্রিক জীব এবং পরে চোয়ালযুক্ত মৎস্য শ্রেণীর প্রাণীদের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে পর্যায়ক্রমে উভচর (ব্যাঙ জাতীয়), সরীসৃপ (সাপ, টিকটিকি ইত্যাদি) এবং সরীসৃপ থেকে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সরল অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জটিল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জল থেকে স্থলে উত্তরণ : জীব সৃষ্টি জলের মধ্যে হয়েছিল এবং বহুযুগ পরে ক্রমশ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা স্থলের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ফলে স্থলের মধ্যে বিস্তার শুরু করেছিল। উদ্ভিদেরা স্বভোজী বলে স্থানীয় পরিবেশ থেকে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে সমর্থ হওয়ায় মূলের সাহায্যে মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রাণীরা পরভোজী হওয়ায় খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিচরণের জন্য মাটির সঙ্গে যুক্ত হতো না। এইভাবে জলের মধ্যে যেমন বহুপ্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছিল সেরূপ স্থলেও তাদের মধ্যে বিভিন্নতার প্রকাশ পেয়েছিল।

অতীতের এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বর্তমানের উদ্ভিদ বা প্রাণীদের **মত ছিল না**। **কালক্রমে সেই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশের প্রতিকূলতায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে** তাদের ক্রমিক পরিবর্তন বা অভিব্যক্তির ফলে যেসব নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আজও বিরাজ করছে।

অভিব্যক্তি ও জীব অভিব্যক্তি (Evolution & organic evolution) : জীব সৃষ্টির পর কালক্রমে আদি জীব থেকে ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রকার কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নূতন জীবের সৃষ্টি—তাকে অভিব্যক্তি বলে। **অভিব্যক্তি বলতে আমরা ক্রমিক পরিবর্তনকেই বুঝি যা কোন বস্তুর সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বুঝায়।** অভিব্যক্তির একটি সার্বজনীন গতি আছে যা জড় বা জীব সকলকেই পরিবর্তিত করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় **মহাজাগতিক অভিব্যক্তি, ভূতত্ত্বীয় অভিব্যক্তি, যান্ত্রিক অভিব্যক্তি** এবং **জীব অভিব্যক্তি** ইত্যাদি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতে বিভিন্ন নক্ষত্রের ও সৌরমণ্ডলের ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, একে মহাজাগতিক অভিব্যক্তি বলে। পৃথিবী সৃষ্টির পর কালক্রমে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে যে বহিঃআবরণী বা ভূত্বকের সৃষ্টি করেছিল তার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কোন অঞ্চল উঁচু হয়ে পাহাড়-পর্বত আবার কোন অঞ্চল নীচু হয়ে নদী-নালার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন এখানেই শেষ হয় নি তা আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। এই প্রকার ভূত্বকের পরিবর্তনকে ভূতত্ত্বীয় অভিব্যক্তি বলে। আরও সহজ করে উদাহরণের সাহায্যে অভিব্যক্তি কাকে বলে তা বুঝানো যায়, যেমন—প্রথম যুগের মোটরগাড়ী ও এরোপ্লেন তৈরীর পর ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নতির দ্বারা উন্নত মানের মোটরগাড়ী ও এরোপ্লেন বর্তমানে তৈরী হওয়া। এই প্রকার উন্নতিও এক প্রকার অভিব্যক্তি যাকে যান্ত্রিক অভিব্যক্তি বলে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, (একটি সরল অবস্থা থেকে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নব অবস্থায় উপনীত হওয়াকে অভিব্যক্তি বলে।)

আদি জীব সৃষ্টির পর ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আজ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের কখনও কখনও শিলীভূত দেহাবশেষ ভূস্তরের মধ্যে জীবাশ্ম বা ফসিল (fossil) অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এই সকল জীবাশ্ম পরীক্ষা করলে এককোষী সরলজীব থেকে বহুকোষী বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অস্তিত্ব অতীতে ছিল তা বুঝা যায়।

জীব সৃষ্টি ও তাদের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার উৎপত্তির ইতিহাস : পৃথিবীতে আদি জীবের সৃষ্টি ও আদি জীব থেকে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টির যে সকল বিভ্রান্তিকর মতবাদ অতীতে প্রচলিত ছিল সেগুলি বহু দার্শনিক ও শিক্ষিত মানুষের নিকট গ্রহণীয় ছিল না। তাঁরা জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন, যদিও তাঁদের ধারণা প্রথমে অস্পষ্ট ছিল কিন্তু পর্যায়-

ক্রমিক অনুসন্ধানের ফলে বর্তমানে সত্য জানা গিয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ছয়শ' বৎসর পূর্বে **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** (Anaximander) নামে গ্রীক দার্শনিক ধারণা করেন যে মানুষ প্রথমে মাছরূপে উৎপত্তি হয়েছিল। পরবর্তী কালে মাছের চর্ম পরিত্যাগ করে মানুষরূপে স্থলে বাস শুরু করে। এরও প্রায় একশ' বৎসর পরে **এমপিডোক্লিস** (Empedocles) নামে আরেক জন গ্রীক দার্শনিক পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ সৃষ্টির পর প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রাণীরা উদ্ভিদের মত মাটির সঙ্গে যুক্ত না থেকে বিযুক্ত ছিল বলে প্রচার করেন। এই সকল দার্শনিকদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। খ্রীস্টপূর্ব তিনশত বৎসর পূর্বে যে গ্রীক দার্শনিক সত্যকার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু করেন তিনি হচ্ছেন **অ্যারিস্টট্‌ল** (Aristotle)। তিনি প্রকৃতিতে জড় ও জীব বস্তুর বিভিন্ন স্তর আছে যার মধ্যে প্রথম জড় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দ্বারা গঠিত বলেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিত্যনূতন পরিবর্তনের ধারাবাহিক গতির প্রভাবে জীবের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ এবং অসুন্দরকে সুন্দর করার প্রবণতা আছে বলে প্রচার করেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিনিয়াস, কুভিয়র প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রচার করেন যে জীবজগতে প্রতিটি প্রজাতির সৃষ্টি পৃথক পৃথক ভাবে হয়েছিল। আধুনিক যুগের প্রথম জীববিৎ ফরাসী বিজ্ঞানী **বাফোঁ** (Buffon, 1707-1778) বিসৃষ্টিবাদ তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলেন। তিনি পরিবেশের প্রভাবে জীবের (প্রাণীদের) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলি একত্রে সঞ্চিত হয়ে বৃহৎ পরিবর্তনের সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি জটিল প্রাণী তার পূর্ববর্তী সরল প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রচার করেন। অভিব্যক্তি বিষয়ে বর্তমানকালে যে দুইজন বিজ্ঞানীর নাম সবচেয়ে আলোচিত তারা হলেন জঁ্যা ব্যাপটিষ্ট ডি ল্যামার্ক এবং চার্লস ডারউইন। এই দুইজন বিজ্ঞানীর মধ্যে ল্যামার্ক তত্ত্ব বহু বিতর্কিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য নয় কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জীব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ (Evidences for Organic Evolution) :

জীব সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বংশানুক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন শ্রেণীর জীব যথা – উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল। জীব অভিব্যক্তি সুদূর অতীত থেকে শুরু হয়ে আজও সমান ভাবে চলছে। জীব অভিব্যক্তি মতবাদ যে অভ্রান্ত সে বিষয়ে বিভিন্ন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় এবং এই বিষয়গুলি হচ্ছে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান, ভ্রূণবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা ও শারীরবৃত্তবিদ্যা ইত্যাদি। নিম্নে এইসব প্রমাণের মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) **তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান** (Comparative morphology) : বিভিন্ন প্রকার জীবদেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অঙ্গসংস্থানের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য অনুযায়ী তাদের অভিব্যক্তি অনুধাবন করা যায়। সকল প্রকার প্রাণীর দেহ প্রোটোপ্লাজম যুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত হওয়ায় মূলগত সাদৃশ্য আছে। যদি বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ভিন্ন

ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হতো তাহলে তাদের প্রত্যেকের আকার বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনো ভাবে সাদৃশ্য দেখা যেত না। কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীদের পরিপাক তন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গাদির বা গ্রন্থির মধ্যে যেমন মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায় সেরূপ রেচনতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। একই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যেমন বৃহত্তর ক্ষেত্রে অঙ্গসংস্থানের সাদৃশ্য দেখা যায় সেরূপ একই প্রজাতির সকল প্রাণীদের সর্বক্ষেত্রেই সাদৃশ্য থাকে। উদাহরণ দ্বারা দেখান যায় যে, সকল প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহ লোম দ্বারা ঢাকা এবং তাদের বহিঃকর্ণ বর্তমান, এর দ্বারা তাদের নৈকট্য বুঝা যায়। সেরূপ সকল প্রকার মানুষের একই আকার ও দেহে অঙ্গসংস্থান থাকায় তাদের নিজেদের মধ্যে নৈকট্য অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের অপেক্ষা অধিক। এইভাবে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য দ্বারা তাদের অভিব্যক্তি কিভাবে এবং কোন্ পূর্ববর্তী প্রাণীদের থেকে হয়েছে তা প্রমাণ করা যায়। অঙ্গসংস্থানের বিভিন্ন প্রকার মৌলিক সাদৃশ্যের মধ্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পদ, হৃৎপিণ্ড এবং ক্ষয়িষ্ণু বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গের বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) **অগ্রপদের সাদৃশ্য :** প্রাণীদেব বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের মধ্যে ব্যাঙ, পায়রা,
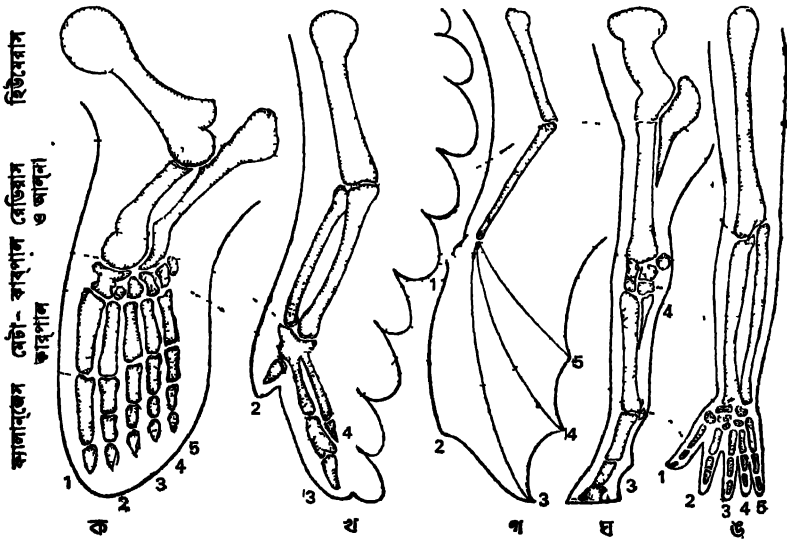
৩৮নং চিত্র ॥ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদেব অস্থির গঠন—(ক) তিমিব ফ্লিপাব, (খ) পক্ষী, (গ) বাদুড়ের ডানা, (ঘ) ঘোড়াব অগ্রপদ এবং (ঙ) মানুষেব হাত ইত্যাদির গঠনের দৃশ্য।

তিমি, গরু, বাদুড় ইত্যাদির অগ্রপদ ও মানুষের হাতের মধ্যে বাইরের আকৃতি এক প্রকার নয়। কারণ পায়রার অগ্রপদ ও বাদুড়ের অগ্রপদ ডানায় এবং তিমির অগ্রপদ ফ্লিপারে (মাছের পাখনার ন্যায় অঙ্গ) পরিণত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গঠন

পর্যালোচনা করলে সকলেরই অগ্রপদের অস্থি ও পেশীর গঠন একই প্রকার এবং এই অঙ্গে একইভাবে স্নায়ুতন্ত্রের বিস্তার ও রক্ত প্রবাহিত হয়েছে দেখা যায়। গঠনের এই সব সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা যায় যে, উন্নত শ্রেণীর প্রাণীরা, যথা—সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের পূর্বপুরুষদের অগ্রপদ উভচর শ্রেণীর (ব্যাঙের) পূর্বপুরুষদের মত ছিল, কিন্তু কালক্রমে পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমবৃত্তিতা ও সমসংস্থা (Analogy and Homology): অনেক জীবের একই প্রকার কাজের উপযোগী অঙ্গ থাকে যদিও গঠনে এগুলি একরূপ নয়—এই সব অঙ্গকে **সমবৃত্তি** (analogous) অঙ্গ বলে। যথা—চিংড়ি ও তিমির লেজের পাখনা এবং পতঙ্গ ও পাখীর ডানা সমবৃত্তি অঙ্গ। চিংড়ি ও পতঙ্গ অমেরুদণ্ডী সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী এবং তিমি ও পাখী যথাক্রমে মেরুদন্ডী স্তন্যপায়ী ও পক্ষী শ্রেণীর প্রাণী। চিংড়ি ও তিমির পাখনা এবং পতঙ্গ ও পাখীর ডানার গঠন একপ্রকার না হলেও পাখনা জলের মধ্যে চলাচলে ও ডানা আকাশে উড়তে সাহায্য করে। আভ্যন্তরিক গঠন এক প্রকার হলেও ঘোড়ার অগ্রপদ মাটির উপরে চলনে, পাখী ও বাদুড়ের অগ্রপদ ডানায় পরিবর্তিত হয়ে উড়তে, তিমির অগ্রপদ ফ্লিপারে পরিবর্তিত হয়ে জলের মধ্যে সাঁতারে এবং মানুষের

৩৯নং চিত্র ॥ বিভিন্ন প্রাণীর হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গঠনের দৃশ্য— ক) মাছ, (খ) ব্যাঙ, (গ) সরীসৃপ এবং (ঘ) পক্ষী ও স্তন্যপায়ী।

হাতের দ্বারা বিভিন্ন কার্য করে—এই সব প্রাণীর অগ্রপদ ও মানুষের হাতকে **সমসংস্থ** (homologous) অঙ্গ বলে। এই সকল সমসংস্থ অঙ্গগুলি একই প্রকার

প্রাণী থেকে উৎপন্নের ফলে এসেছে যদিও কার্য অনুযায়ী এগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে। সমবৃত্তি অঙ্গগুলি এক প্রকারের কার্য করলেও তারা যে সকল প্রাণীদেহে বর্তমান, তারা যে প্রকার পূর্ববর্তী প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তারা কিন্তু ভিন্ন প্রকারের ছিল।

(২) **হৃৎপিণ্ডের সাদৃশ্য ঃ** মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের পরিণত অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রে যথাক্রমে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় (মৎস্য), দুটি অলিন্দ ও একটি নিলয় (উভচর), দুটি অলিন্দ ও দুটি অসম্পূর্ণ নিলয় (সরীসৃপ) এবং দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয় (পক্ষী ও স্তন্যপায়ী) সুনির্দিষ্ট ক্রমিক অভিব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়। এইভাবে প্রাণীদের ধমনীতন্ত্রের বিভিন্ন আর্চ (arterial arches) ও মস্তিষ্কের গঠনও জীব অভিব্যক্তির প্রমাণ।

(৩) **নিষ্ক্রিয় বা ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ** (Vestigial organs) ঃ প্রাণীদেহে যে সব অঙ্গের ব্যবহার হয় না অথচ হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় বর্তমান তাদের নিষ্ক্রিয় বা ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ বলে। জীব বিবর্তনের এক পর্যায়ে এই সকল ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ প্রাণীদের পূর্বপুরুষগণের দেহে কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় ছিল। বিভিন্ন প্রকার গুহাবাসী মাছ ও পতঙ্গদের চক্ষু ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু তাদের সমগোত্রীয় বাইরে মুক্ত অবস্থায় অবস্থানকারী প্রাণীদের চক্ষু সুগঠিত অবস্থায় আছে। পূর্ণবয়স্ক তিমি মাছের দাঁত থাকে না কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় দাঁত দেখা যায়।
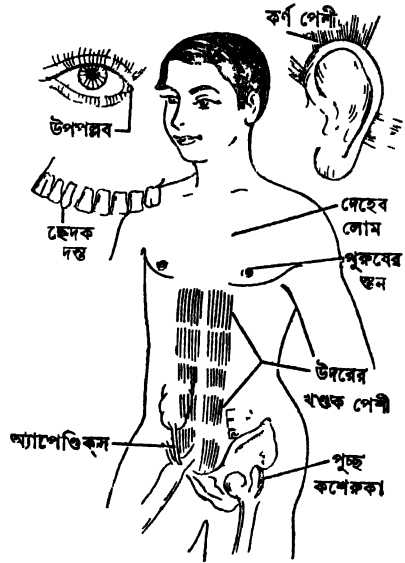
মানবদেহের ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ ঃ মানুষের দেহেও বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ আছে যথা—কান সঞ্চালনের পেশী, চোখের কোণে অবস্থিত সাদা অংশ যাকে উপপল্লব (nictitating membrane) বলে, পুরুষ মানুষের স্তন, শ্বদন্ত (canine teeth), উদর অঞ্চলের খণ্ডীত পেশীসমূহ, মেরুদণ্ডের পশ্চাতে লেজের কশেরুকা এবং অ্যাপেণ্ডিক্‌স ইত্যাদি। এই সকল ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গ মানুষের দেহে অপ্রয়োজনীয় হলেও বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী অবস্থায় বর্তমান। মানুষের কানের পেশী সঞ্চালিত না হলেও গরু, ছাগল প্রভৃতির দেহে এই পেশীর সঞ্চালনে কান নাড়িয়ে মাছি ও মশা

৪০ নং চিত্র ॥ মানুষের দেহে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার নিষ্ক্রিয় অঙ্গ।

ইত্যাদি তাড়াতে পারে। মানুষের দেহে পৌষ্টিকনালীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত নলাকার অ্যাপেণ্ডিক্স কোন কার্য করে না কেবলমাত্র ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিকারক অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। যার ফলে শল্য চিকিৎসার দ্বারা দেহ থেকে বাদ দিতে হয়। কিন্তু গিনিপিগ, খরগোস, গরু ইত্যাদির দেহে অ্যাপেণ্ডিক্সের প্রসারিত অঞ্চল বা সিকামের মধ্যে সেলুলোজ ভঙ্গকারী ব্যাক-টিরিয়া অবস্থান ক'রে খাদ্যের সেলুলোজ অংশকে পরিপাকে সাহায্য ক'রে। মাছ, ব্যাঙ ও বিড়াল ইত্যাদির চক্ষুর তৃতীয় পর্দা বা উপপল্লব কার্যকরী আছে, কিন্তু মানুষের চক্ষুতে এটি অকেজো অবস্থায় থাকে।

এই সকল বিভিন্ন প্রকার নিষ্ক্রিয় বা ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গগুলি বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়ায় এই অঙ্গগুলি অভিব্যক্তির কথাই প্রমাণ করে।

(খ) **প্রত্নজীববিদ্যার দ্বারা প্রমাণ** (Palæontological evidence): পৃথিবী সৃষ্টির বহুদিন পরে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে ভূস্তরের সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে এই প্রথম সৃষ্ট ভূস্তরের উপর প্রাকৃতিক কার্যকারণে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়, এজন্য প্রথম স্তর থেকে উপরের স্তরগুলিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বা যুগে পৃথিবীতে যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মৃত্যুর পর প্রাকৃতিক কার্যকারণে অনেকেরই দেহাবশেষ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, এই সব প্রস্তরীভূত জীবদেহাবশেষকে **জীবাশ্ম** (Fossil) বলে। পৃথিবীর বহুস্থানে খননকার্যের ফলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক সময় নিম্নের স্তর দৃশ্যমান হলে এই সকল জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এই সকল জীবাশ্ম স্তর ও যুগ অনুযায়ী পরীক্ষা ক'রে
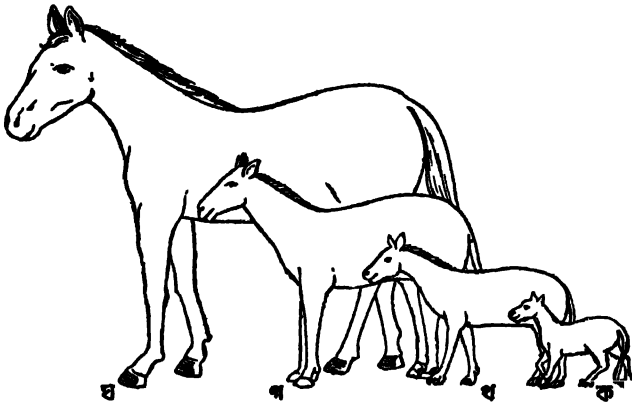
৪১নং চিত্র ॥ (ক) ইয়োহিপ্পাস, (খ) মেসোহিপ্পাস, (গ) মেরিচিপ্পাস এবং (ঘ) ইকুস।

বর্তমান প্রাণীদের সাথে অতীতের বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং জীব বিবর্তনের ধারা বিষয়েও জানা যায়। বর্তমানের এক-আঙুলবিশিষ্ট সুন্দর দীর্ঘদেহী

ঘোড়ার পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম আবিষ্কারের ফলে তাদের প্রথম পূর্বপুরুষ **ইয়োহিপ্পাস** একাধিক আঙুলযুক্ত কুকুরের মত আকার-বিশিষ্ট প্রাণী ছিল বলে জানা গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে অভিব্যক্তির ফলে ইয়োহিপ্পাস পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত বড় আকারে মেসোহিপ্পাস, মেরিচিপ্পাস এবং বর্তমান কালের ঘোড়া ইকুসে পরিণত হয়েছে। একইভাবে বর্তমান পাখীদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে **আরকিয়োপটেরিক্স** নামে একটি পাখীর জীবাশ্ম আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে, বর্তমানকালে পাখীদের দাঁত ও ডানায় নখর না থাকলেও তাদের পূর্বপুরুষদের দাঁত ও নখর ছিল।

৪২নং চিত্র ॥ বর্তমান কালের পাখীর পূর্বপুরুষ আরকিয়োপটেরিক্সের জীবাশ্ম।

এইভাবে আরও বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে জীব অভিব্যক্তির ধারণা সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

জীব অভিব্যক্তির বিভিন্ন মতবাদ ঃ—

(ক) **ল্যামার্কের অর্জিত গুণ উত্তরাধিকারতত্ত্বের মতবাদ** (Lamarck's Theory of Inheritence of Acquired Character)

জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট ডি ল্যামার্ক (Jean Baptiste de Lamarck, 1744-1829) নামে প্রসিদ্ধ ফারসী বিজ্ঞানী ডারউইনের আগে জীব অভিব্যক্তি ধারণার প্রবর্তন করায় সম্মান লাভের যোগ্য বলে বিজ্ঞানীমহলে বিবেচিত হন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর মতবাদ যুক্তিহীন ও অসার বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন। ল্যামার্ক তাঁর মতবাদ ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে **ফিলসফি জুওলজিক** (Philosophie Zoologique) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাঁর মতবাদের প্রধান বিষয়গুলি যথাক্রমে—

৪৩নং চিত্র ॥ জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক।

(১) **পরিবেশের প্রভাব ঃ** ল্যামার্কের মতবাদের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে প্রধান

হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে পরিবেশের, যথা—জল, মাটি ও আলোর প্রভাব আছে এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে বেশ ভালভাবেই মানিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান যে, ছোট অগভীর নদীতে খরস্রোতের জন্য যে উদ্ভিদের পাতার ফলক কাটা কাটা হয়, নদীর চরে সেই উদ্ভিদেরই পাতার ফলক সম্পূর্ণ থাকে। ল্যামার্ক জলের পরিবেশে বাস করার জন্য হাঁসের পায়ের পাতা প্রসারিত হয়ে লিপ্তপাদে পরিবর্তিত হয়েছে এবং যার ফলে হাঁস লিপ্তপাদের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটতে পারছে বলে মনে করতেন। এইভাবে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বহু নূতন নূতন সংযোজন যাকে **অভিযোজন** (adaptation) বলে সেগুলি পরবর্তী বংশধরেরা অর্জন করে বলে প্রচার করেন।

(২) **ব্যবহার ও অব্যবহার ঃ** প্রাণীদের ক্ষেত্রে ল্যামার্ক মনে করতেন কোনও অঙ্গের ব্যবহারে সেই অঙ্গের উন্নতিসাধন ও বৃদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু ব্যবহার না করলে অঙ্গটি দুর্বল ও আকারে ছোট হতে হতে অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারের
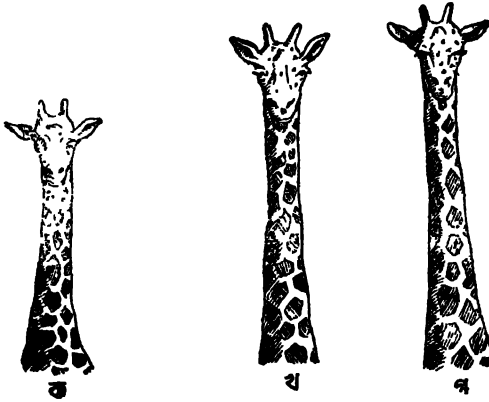
৪৪নং চিত্র ॥ জিরাফের গলার ক্রমিক বৃদ্ধির দৃশ্য—(ক)-পূর্বাবস্থা, (খ)-মধ্যমাবস্থা, (গ)-বর্তমান অবস্থা।

ফলে কামার বা শ্রমিকের সন্তান-সন্ততির সুগঠিত ও পেশীবহুল হাত এবং অব্যবহারের ফলে সাপের পা বিলুপ্ত হওয়ার কথা তিনি বলেন। তাঁর তত্ত্বের অপর একটি প্রধান উদাহরণ হচ্ছে জিরাফের লম্বা গলা। এর কারণস্বরূপ তিনি জিরাফের পূর্বপুরুষদের গলা পূর্বে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল এবং আশপাশের দীর্ঘ গাছগুলি থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার অসুবিধা হতো বলে তারা গলা লম্বা করার চেষ্টা করত বলে বলেন। জিরাফের পূর্বপুরুষদের এই চেষ্টার ফলে তাদের গলার দৈর্ঘ্য পরবর্তী কালে কিছু পরিমাণ বাড়ে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এই চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। এই প্রকারে চেষ্টা করার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে জিরাফের বংশধরদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক

গলা লম্বা করার চেষ্টা করায় অবশেষে পরবর্তী বংশধরদের গলা লম্বা হয়েছে বলে ল্যামার্ক মনে করতেন।

(৩) **পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অর্জিত গুণের উত্তরাধিকারিত্ব :** অর্জিত গুণগুলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রকাশ পায় বলে ল্যামার্ক মনে করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর অভিব্যক্তি মতবাদে এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি পরিবেশের প্রভাব বা ব্যবহার ও অব্যবহার ফলে প্রাণীর মধ্যে যে সকল পরিবর্তন দেখা যায় তা তার পরবর্তী বংশধরেরা উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করে এবং ক্রমান্বয়ে পরবর্তী বংশে অনুশীলনের ফলে এই গুণগুলির উন্নতি হয় বলেন। আবার অনুশীলনের অভাবে বিভিন্ন গুণ ক্রমশ বিনষ্টও হয় তাও ল্যামার্ক মনে করতেন।

ল্যামার্ক তত্ত্বের সমালোচনা : ল্যামার্কের মতবাদ বা তত্ত্ব কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী পরীক্ষার মাধ্যমে ভুল বলে মত দিয়েছেন। (১) জার্মান বিজ্ঞানী **অগাস্ট ভাইসম্যান্** একই বংশজাত ইঁদুরের লেজের কিছু অংশ কুড়ি পুরুষ ধরে কেটেও পরে তাদের বংশের সন্তানদের মধ্যে সম্পূর্ণ লেজ বেরোতে দেখেছেন। (২) বহু হিন্দু ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতির মধ্যে কয়েকশ' বছর ধরে মেয়ে ও পুরুষের কান ফুটো করা একটি ধর্মীয় ব্যাপার এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কিন্তু কেউই ফুটো কান নিয়ে জন্মায় না। (৩) চীন দেশের অধিবাসীরা পা-এর আকার ছোট রাখার জন্য ছোট মাপের জুতা পরে। এইভাবে কয়েক পুরুষ ধরে ছোট জুতা ব্যবহার করেও তাদের সন্তানেরা ছোট আকারের পা সহ জন্মায় না। (৪) গরু, ঘোড়া বা মেষ ঘাস বা বিচালী খাওয়ার ফলে তাদের দাঁত ক্ষয়ে যায়। পুরুষানুক্রমে তাদের দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সন্তানদের দাঁতের আকার ছোট হয় না। আরও অজস্র প্রমাণের সাহায্যে ল্যামার্কের মতবাদ যে ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে। ল্যামার্কের অর্জিত গুণ উত্তরাধিকারিত্বের মতবাদে কোন জীব তার জীবদ্দশায় যে গুণগুলি অর্জন করে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বাহিত হয়। এই সকল গুণ কিভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে বাহিত হয় সে বিষয়ে ল্যামার্ক জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁর সময়ে বংশগতির ধারক ও বাহক ক্রোমোজোম বা জীন আবিষ্কৃত হয় নি। পরবর্তী কালে প্রখ্যাত জার্মান জীববিজ্ঞানী অগাস্ট ভাইসম্যান্ (A. Weismann, 1834-1914) তাঁর **জার্মপ্লাজম তত্ত্বের** দ্বারা ল্যামার্কের তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ করেন।

ভাইসম্যান্ তাঁর মতবাদে বহুকোষী জীবের দেহ জননকোষ উৎপন্নকারী কোষ—**জার্মপ্লাজম** (germplasm) এবং দেহকোষ উৎপন্নকারী কোষ—**সোমাপ্লাজম** (somaplasm) দ্বারা গঠিত বলেন। দুটি বিভিন্ন লিঙ্গের জননকোষের মিলনে যে ভ্রূণাণু (zygote) ও ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তার কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট কোষগুলির কতকগুলি জার্মপ্লাজম এবং বাকীগুলি সোমাপ্লাজম সৃষ্টি করে। ভাইসম্যানের মতে জার্মপ্লাজম অমর এবং জীব সৃষ্টির প্রত্যূষকাল থেকে জীবপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নভাবে জার্মপ্লাজম প্রবাহিত হয়ে আদি জীবকুলের সাথে বর্তমান জীবকুলের যোগসূত্র রক্ষা করে

চলেছে। তাঁর মত অনুযায়ী সোমাপ্লাজম জার্মপ্লাজমকে কেবলমাত্র আশ্রয়, পুষ্টিবিধান ও রক্ষা করে অবশেষে বিপরীত জননকোষের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। ফলে নূতন সৃষ্ট ভ্রূণাণু আবার জার্মপ্লাজম ও সোমাপ্লাজম সৃষ্টি করে—এই প্রক্রিয়া আবহমান কাল থেকে চলছে। সুতরাং ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন জীবের দেহ-কোষের পরিবর্তন তার জার্মপ্লাজমকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে জীবের অর্জিত গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না।

চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ (Darwin's Theory of Natural Selection) : বিজ্ঞানী এরাসমাস ডারউইনের পৌত্র **চার্লস ডারউইন** ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরেই অভিব্যক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা, তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞানী ল্যামার্ক তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের প্রবক্তারূপে পূর্ববর্তী অন্যান্য বিজ্ঞানী এবং তাঁর পিতামহকেও অতিক্রম করায় অনেকে তাঁকে জীববিদ্যার নিউটন বলে বর্ণনা করেন। চার্লস ডারউইন প্রথমে এডিনবরায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা শুরু করেও এই বিদ্যার প্রতি অনুরাগ না থাকার জন্য পরবর্তী কালে ধর্মযাজক হবেন বলে স্থির করে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রবেশ করেন। জীবনে অন্যান্য বিষয়ের চেয়েও তাঁর আবাল্য প্রকৃতিপ্রেম অধিক হওয়ায়, কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরে সুযোগ আসা মাত্রই তিনি "বিগল" নামক জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার জন্য যোগ দেন। এই প্রদক্ষিণে বিভিন্ন নূতন নূতন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের জন্য তিনি প্রকৃতিবিদ্‌রূপে নির্বাচিত হন। পাঁচ বৎসর এই ঐতিহাসিক পরিভ্রমণ কালে তিনি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং জীবজগতে বৈচিত্র্য যে তাঁকে শুধুমাত্র বিস্মিত করে তাই নয় তার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটনেও আকৃষ্ট করে। এরই ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে জীববিবর্তনে গবেষণার উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির সৃষ্টি'** (Origin of Species by Natural Selection) ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪৫নং চিত্র ॥ চার্লস ডারউইন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাঁর বন্ধু **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (Alfred Russel Wallace, 1823-1913) নামে একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাঁর কাছে প্রজাতি সৃষ্টির তত্ত্ব বর্ণনা ক'রে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ

পাঠান। এই সময় তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ে গবেষণাকার্যে নিরত ছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় তিনি প্রজাতি সৃষ্টি বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার সঙ্গে ডারউইনের সিদ্ধান্ত এক হওয়ায় ডারউইন তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশে বিরত থাকা সঙ্গত মনে করেন। পরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বন্ধুদের অনুরোধে তাঁরা দু'জন একত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের উপর লিখিত গবেষণাপত্র **"রয়েল লিনিয়ান সোসাইটির"** সভায় উপস্থাপিত করেন। ওয়ালেস পরের বছর (১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে) ডারউইনের অসাধারণ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে অত্যন্ত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে নিজের নাম গবেষণা প্রবন্ধ থেকে প্রত্যাহার করেন।

ডারউইনের তত্ত্বের ব্যাখ্যা ঃ ডারউইন যে সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁর তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন সেগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—**প্রথমত**, জীবজগতে একই প্রকার জীবের মধ্যে পারস্পরিক সামান্য পরিমাণে বৈসাদৃশ্য থাকে, এই প্রকার ভিন্নতাকে **পরিবৃত্তি** (variation) বলে। এই প্রকার পরিবৃত্তি অবিরাম জীবজগতে চলছে এবং পরিবৃত্তিগত বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বর্তায়। তবে যে সব পরিবৃত্তি জীবের পক্ষে অনুকূল কালানুক্রমে সেগুলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে এবং প্রতিকূল পরিবৃত্তি জীবের অবলুপ্তি ঘটায়। **দ্বিতীয়ত,** অধিকাংশ জীবের **বংশবৃদ্ধির হার অত্যধিক** (prodigality of production) হলেও খাদ্যের অপ্রতুলতা, বাসস্থানের অভাব এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের আবশ্যিক বিষয়গুলির সীমাবদ্ধতা হেতু পরস্পর জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে অতি অল্পসংখ্যক জীবই বেঁচে থাকে। একেই **জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম** (struggle for existence) বলে। **তৃতীয়ত,** প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত জীবের অবলুপ্তি এবং যোগ্যতম জীবের আবির্ভাব হয়। যোগ্যতর প্রাণীদের অনুকূল পরিবৃত্তিজাত গুণগুলি অপত্যেরা অধিগত করে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত জীব বা **প্রজাতির** সৃষ্টি করে। এই সকল প্রজাতির অনুকূল পরিবৃত্তিগুলি তাদের পরিবেশের সাথে সফলভাবে মানিয়ে নিয়ে বাঁচতে ও বংশবিস্তার দ্বারা আরও উন্নত জাতের জীবের সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, একেই ডারউইন **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) বলে অভিহিত করেছেন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সমালোচনা ঃ ডারউইন জীবজগতে কিরূপে ভিন্নতা বা পরিবৃত্তি ঘটে বা কিরূপে পরিবৃত্তি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় সেগুলির ব্যাখ্যা করেন নি। এজন্য ডারউইনের নির্বাচনতত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভিযোজন
(Adaptation)

জীবজগতের অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যময় পরিবেশের মধ্যে বাস করে। পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীব আহার সংগ্রহ, বংশবৃদ্ধি, আত্মরক্ষা, বাসস্থান এবং বিস্তারণ ঘটাচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে এই সকল কার্যের জন্য তাদের দেহের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তীয় কার্যধারাকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এই প্রকার পরিবেশের পরিবর্তন যেমন জলজ উদ্ভিদ ও জলচর প্রাণীর দেহে পরিবর্তন করে আবার যে সকল প্রাণী উড়ে বেড়ায় তাদেরও দেহের পরিবর্তন হয়। মরুভূমিতে উট এবং ক্যাকটাস পরিবেশের সাথে যেরূপ মানিয়ে নিয়েছে সেরূপ কিন্তু অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ পারে না বলে তাদের মরুভূমিতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে জীবজগতের সর্বত্র এই প্রকার মানিয়ে চলার চেষ্টা চলছে—যে সকল জীব মানিয়ে চলতে পারে তারা পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে আর যারা পারে না তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। পরিবেশের সাথে জীবজগতের এই মানিয়ে চলাকেই অভিযোজন বলে।

অতীতে পৃথিবীতে বহু প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মেছে আবার কালের বিবর্তনে তাদের মধ্যে অনেকে পরিবেশের সাথে না মানাতে পারায় অবলুপ্ত হয়েছে। এই প্রকার অনভিযোজিত প্রাণীদের মধ্যে ব্রনটোসোরাস, ডাইনোসোরাস ইত্যাদি বিশালাকার সরীসৃপের জীবাশ্ম দেখে বুঝতে পারা যায় যে এই সকল প্রাণী পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে না নিতে পারায় অবলুপ্ত হয়েছে।

অভিযোজনের সংজ্ঞা : বিভিন্ন জীবের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে বাঁচতে ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বাহিত হয়ে তাদেরও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে তাদের অভিযোজন বলে।

অভিব্যক্তি ও অভিযোজনের সম্পর্ক : ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির সৃষ্টিতে 'বাঁচার বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার' এই দু'টি তত্ত্বকে প্রায়শই ভুল বোঝা হয়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালী জীব কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল জীবকে পরাজিত বা ধ্বংস করে নিজেরাই বেঁচে থাকে মনে করলে ভুল হবে। এ প্রসঙ্গে মানুষের ক্ষেত্রেও অপরকে শোষণ ও বঞ্চনা দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ করাও ডারউইনের মতবাদের পরিপন্থী। যদিও অনেক মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং যোগ্যতমের বাঁচার অধিকারকে ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা নিজেদের কার্যকে সমর্থন করে।

প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা নির্ধারণে আক্রমণাত্মক মনোভাব জীবজগতের একটি অংশের বৈশিষ্ট্য হলেও তা অত্যন্ত সীমিত এবং এই সঙ্গে আরও বহু কার্যকারণ দ্বারা যুক্ত। যোগ্যতম বলতে জীববিজ্ঞানের যে ধারণা তা কিন্তু কোনও জীবের অধিকসংখ্যক পরিণত বংশধর বা সন্তান-সন্ততি উৎপাদনকেই বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার বলতে ডারউইন সেই সকল জীবের কথাই বলেছিলেন যারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মানিয়ে নিয়ে অধিক সংখ্যায় পরিণত বংশধর রেখে যেতে পারে। আর বেঁচে থাকা (survival) বলতে জীবের জনন ক্রিয়ার দ্বারা সন্তান-সন্ততির উৎপাদনের সক্ষমতার সময়কেই বোঝায়। এই সক্ষমতা নির্ধারণের যে বৈশিষ্ট্য তা কোন জীবের তার অন্য প্রজাতি অপেক্ষা বংশবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাব্যতাকে অধিক বাড়িয়ে সে জীবকে তার অন্য প্রজাতি অপেক্ষা যোগ্য বিবেচিত করে। এই প্রকার সক্ষমতা বা যোগ্যতা নির্ধারক চারিত্রিক বিশিষ্ট্যগুলিকেই অভিযোজন বলা হয়।

জীবের অভিযোজন তাদের দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন যথা—বাহ্যিক আকার, শারীরবৃত্তীয় অথবা স্বভাব ইত্যাদির পরিবর্তন দ্বারা ঘটতে পারে। যদিও হিংস্র প্রাণীর দৈহিক শক্তি, থাবা, নখর এবং বিষদাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোজন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায় তবুও এই প্রকার অভিযোজনগুলি জীবজগতের অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত অল্প ভূমিকা গ্রহণ করে। এই তুলনায় অনেক কম লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন জীবকে বাঁচার ক্ষেত্রে অধিক সক্ষম করে। উদাহরণের সাহায্যে এই প্রকার অভিযোজন বর্ণনা করা যায়—যথা, গাছের শুকনো পাতার সাথে সাদৃশ্যসম্পন্ন প্রজাপতি, বহু উদ্ভিদের দেহে জাত সবুজ শুঁয়াপোকা, লাউডগা সাপ ইত্যাদির দেহের বর্ণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাদৃশ্যতা থাকায় সহজেই এই সকল জীব তাদের শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পায়। বাঘের গায়ের চামড়ার হলদে কালো ডোরা দাগ ঘাসের জঙ্গলে বা বনের পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকতে সাহায্য করে। এই প্রকার মিশে থাকার জন্য দেহ-বর্ণের পরিবর্তনের ফলে যে অভিযোজন তাকে অনুকৃতি (mimicry) বলে। এই অভিযোজনগুলি কম লক্ষণীয় হলেও এগুলি জীবের বাঁচার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতপক্ষে যে সকল পরিবর্তনের ফলে দেহের কোনও যন্ত্রের কার্যক্ষমতার উন্নতি ঘটে তা জীবের বেঁচে থাকার ক্ষমতা বাড়ায়। অভিযোজন এইভাবে বিভিন্ন উপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিব্যক্তির সহায়তা করে।

প্রাণীদের অভিযোজন

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে বিভিন্ন পরিবেশের প্রাণীদের মধ্যে বহু প্রকারের অভিযোজন দেখা যায়। এই সকল অভিযোজন প্রাণীদের আহার, বাসস্থান এবং আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়। ফলে তারা জীবন-সংগ্রামে

যোগ্যতমরূপে বিবেচিত হওয়ায় বংশবিস্তার দ্বারা পূর্ণবয়স্ক অপত্য বা বংশধর রেখে যেতে পারে।

অভিসারী ও অপসারী অভিযোজন ঃ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রাণী একই পরিবেশে বাস করার সময় তাদের মধ্যে একই প্রকারের অভিযোজন দেখা যায়। জলের পরিবেশে প্রাথমিক জলচর প্রাণী মাছ এবং গৌণ জলচর প্রাণী তিমি মোটামুটি একই প্রকারের আকারসম্পন্ন হয়। এই প্রকার বিভিন্ন পরিবেশের প্রাণী একই পরিবেশে থাকার ফলে যে প্রকার অভিযোজন হয় তাকে **অভিসারী অভিযোজন** (converging adaptation) বলে।

আবার স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে তিমি জলে, বাদুড় অন্তরীক্ষে, ইঁদুর ও বেজী মাটির মধ্যে এবং বানর বৃক্ষে বাস করার জন্য তাদের মধ্যে যে প্রকার অভিযোজন দেখা যায় তাদের **অপসারী অভিযোজন** (diverging adaptation) বলে।

(ক) **রুই মাছের জলজ অভিযোজন** (Aquatic adaptation) ঃ জলই জীবের জীবন এবং জলেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রাণী জল থেকে স্থলে বসবাস শুরু করে। কিন্তু **প্রাথমিক জলজ প্রাণী রুই মাছ** চিরকাল জলের মধ্যে বাস করে বলে এদের প্রাথমিক জলজ প্রাণী বলে। রুই মাছের অভিযোজনের বর্ণনা করলে মোটামুটি অন্যান্য মাছেরও অভিযোজন কিরূপ তা বোঝা যায়। তবে অনেক প্রাণী স্থলে খাদ্যাভাব এবং আত্মরক্ষার অভাব হেতু স্থল ত্যাগ করে জলের মধ্যে স্থায়িভাবে ফিরে আসে, যথা—তিমি ও জলের মধ্যে বাসকারী সামুদ্রিক সাপ ইত্যাদি। আবার অনেক প্রাণী জলে ও স্থলে উভয় পরিবেশেই অস্থায়িভাবে বাস করে এবং এদের মধ্যেও জলজ অভিযোজন কিছু পরিমাণে দেখা যায়, যথা—ব্যাঙ, হাঁস, কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদি।

রুই মাছের অভিযোজন ঃ (১) দেহের গঠন ঃ (ক) দেহের আকার—রুই মাছের
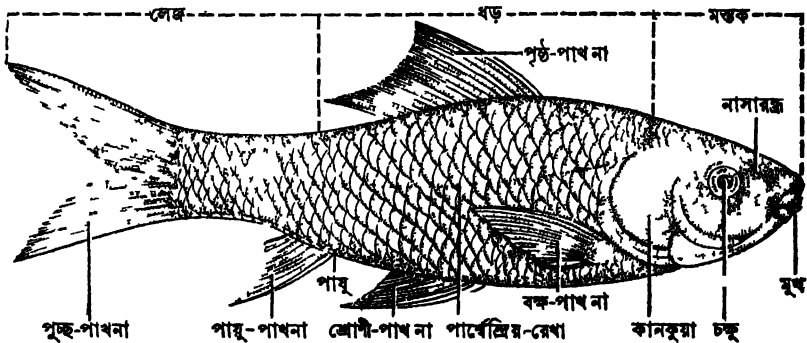
৪৬নং চিত্র ॥ রুই মাছের জলজ অভিযোজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অঙ্গের দৃশ্য।

দেহের আকার মাকু বা পটলের মত। দেহের অগ্রবর্তী মুখ অঞ্চল ও লেজের দিক সরু

এবং দেহের মধ্যভাগ স্ফীত। রুই মাছের এই প্রকার আকার হওয়ায় জলের মধ্যে চলাচলে জলের বাধা অনায়াসে সে অতিক্রম করতে পারে। (খ) **দেহের আঁশ** ও ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার শ্লেষ্মা উৎপাদনকারী গ্রন্থি—রুই মাছের দেহ আঁশের দ্বারা ঢাকা ও ত্বকের গ্রন্থি থেকে পিচ্ছিল শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ হওয়ায় দেহ জল-প্রতিরোধী হয়। (গ) **কানকুয়া**—মস্তকের নিকটে ফুলকাগুলি কানকুয়ার দ্বারা এরূপে ঢাকা থাকে যে, দেহের বহিরাকৃতিতে কোন বর্ধিত অংশ থাকে না। কানকুয়াগুলি দেহের পার্শ্বে সংযুক্ত থাকায় জলের মধ্যে গমনে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। (ঘ) **চক্ষুর অবস্থান**—মস্তকের উভয় পার্শ্বে দুটি চক্ষুর অবস্থিতি এরূপে থাকে যাতে জলের মধ্যে গমনের সময় কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।

(২) **গমন** ঃ (ক) বিভিন্ন পাখ্না—দেহের অগ্রবর্তী অঞ্চলে মধ্যভাগে কানকুয়ার দ্বারা ঢাকা ফুলকা ছিদ্রের পশ্চাতে একজোড়া পেকটোরাল বা বক্ষ পাখ্না, অঙ্কীয় দেশে এক জোড়া পেলভিক বা শ্রোণী পাখনা, পায়ুছিদ্রের পশ্চাতে অবস্থিত পায়ু পাখ্না এবং লেজের অবস্থিত পুচ্ছ পাখ্না আছে, এই সকল পাখ্না সঞ্চালনের দ্বারা রুই মাছ তাদের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং গমনের সময় দিক পরিবর্তন করতে পারে। (খ) দেহের বিভিন্ন **পেশী**—দেহের মধ্যভাগে অবস্থিত বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রুই মাছ জলের মধ্যে এঁকে-বেঁকে গমন করতে পারে।

(৩) **শ্বসন** ঃ রুই মাছ প্রাথমিক জলজ প্রাণী হওয়ায় এদের শ্বাসকার্য ফুলকার সাহায্যে জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সাধিত হয়।

(৪) **বায়ুস্থলী বা পটকা** ঃ রুই মাছের পৌষ্টিকনালীর অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে উৎপন্ন এবং দেহগহ্বরের পৃষ্ঠ দেশে কিন্তু মেরুদণ্ডের অঙ্কীয় অঞ্চলে অবস্থিত থলিকে বায়ুস্থলী বলে। বায়ুস্থলীর মধ্যে সরবরাহিত রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা বায়ুস্থলী ফুলে ওঠে। ফলে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কম হওয়ায় রুই মাছ জলের উপরের স্তরে ভেসে ওঠে, আবার রক্তের মধ্যে অক্সিজেন শোষণ করায় বায়ুস্থলী সংকুচিত হয়ে মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয় ফলে জলের চেয়েও মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হওয়ায় মাছ জলের গভীর অংশে ডুবে যায়।

(৫) **পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখা** (Lateral line sense organ) ঃ রুই মাছের দেহের উভয় পার্শ্বে কিন্তু পৃষ্ঠদেশের নিম্নে এবং মস্তকের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘরেখাকে পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখা বলে। এই রেখা স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। জলের মধ্যে কোনও প্রকার আলোড়ন সৃষ্টি হলে পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখার স্নায়ুকোষগুলিতে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তা পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখার স্নায়ুসূত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হয় এবং মাছ জলের আলোড়ন বুঝতে পারে। এইভাবে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে মাছ স্থান ত্যাগ ক'রে জলের অন্য অঞ্চলে চলে যায়।

(৬) **মুখছিদ্রের আনুভূমিক অবস্থিতি :** রুই মাছ সাধারণত জলের মধ্যস্তরে অবস্থান করে এবং জলের এই স্তর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এর ফলে তাদের উপরোষ্ঠ ও নিম্নোষ্ঠ দ্বারা গঠিত মুখছিদ্র আনুভূমিক হয়।

মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র : অধিকাংশ মাছ জলের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে যদিও ফুলকা মাছের প্রধান শ্বাসযন্ত্র তবুও কয়েক প্রকার মাছ ফুলকা ব্যতীত অন্য প্রকার শ্বাসযন্ত্র দ্বারা বায়ু থেকে অক্সিজেন শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে, এই প্রকার শ্বাসযন্ত্রকে **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (accessory respiratory organ) বলে। বিভিন্ন মাছের এই প্রকার অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় জল যদি কোনও কারণে দূষিত হয় অথবা জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠে তাহলেও এরা মরে না। কয়েকটি অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রযুক্ত মাছের মধ্যে শিঙি, মাগুর ও কই মাছ সকলেরই বিশেষ পরিচিত। (ক) **শিঙি** মাছের ফুলকা ব্যতীত পৃষ্ঠদেশের উভয় দিকে লম্বা নলাকার বায়ুস্থলী বা বায়ুনল আছে। জলের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে ভেসে উঠে অথবা ডাঙায় উঠলে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই বায়ুনলের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। (খ) **মাগুর** মাছেরও ফুলকা ব্যতীত ফুলকা প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। (গ) **কই** মাছেরা শুকনো ডাঙায় কানকুয়ার সাহায্যে চলার জন্য বিখ্যাত এবং এদেরও ফুলকার উপরের দিকে বহু ভাঁজযুক্ত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে থাকে।

৪৭নং চিত্র ।। (ক) কই, (খ) মাগুর ও (গ) শিঙি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

(খ) **পায়রার বায়বীয় অভিযোজন** (Volant adaptation of Pigeon)

পরিবেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের দেখা যায় এবং পরিবেশ অনুযায়ী তাদের অভিযোজনের নামকরণ হয়। অন্তরীক্ষ বা বায়ুতে যে সকল প্রাণী উড়তে পারে তাদের অভিযোজনকে **বায়বীয় অভিযোজন** বলে। এই প্রকার অভিযোজনের জন্য

প্রাণীদের দেহে বিশেষ প্রকার অঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার অঙ্গকে ডানা বলে। পাখীরা প্রকৃত আকাশচারী (নভশ্চর) বলে এদের দেহের আকার বাতাসের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে দ্রুত উড়বার জন্য উপযোগী। পাখীদের মধ্যে পায়রা দ্রুত উড়বার জন্য বিখ্যাত। এজন্য অতীতে যুদ্ধক্ষেত্রে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ আদান-প্রদানে "পায়রা ডাকের" ব্যবস্থা ছিল। পায়রার দেহে বায়বীয় অভিযোজনের জন্য নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা যায়। এই সকল অভিযোজন প্রধানত পায়রার অগ্রবর্তী পদের ডানায় রূপান্তর, ডানাকে আন্দোলিত করে উড়বার জন্য দেহে অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদন, দেহের ওজন হাল্কা করে বায়ুতে ভাসা এবং দেহকে আকাশের বিভিন্ন দিকে পরিচালনা এবং ভারসাম্য রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই প্রকার বিভিন্ন অভিযোজন যা আমরা পায়রার মধ্যে দেখতে পাই তার সঙ্গে মানুষের হাতে গড়া অ্যারোপ্লেন বা উড়োজাহাজকে তুলনা করা যায়।

(১) **পায়রার দেহের আকার ঃ** পায়রার দেহের আকার অনেকটা মাকু বা নৌকার ন্যায়। এই প্রকার আকার হওয়ার জন্য পায়রা বায়ুর প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে দ্রুত উড়তে পারে।

(২) **ডানা ঃ** পায়রার অগ্রপদ ডানায় পরিবর্তিত হয়েছে। এই প্রকার পরিবর্তনে অগ্রপদের হিউমেরাস নামক অস্থিটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। কব্জি, তালু ও অঙ্গুলির বিভিন্ন অস্থির মধ্যে অনেকগুলি অবলুপ্ত এবং অনেকগুলি অত্যন্ত সুগঠিত হয়েছে।

(৩) **পালক ঃ** একমাত্র পক্ষীশ্রেণীর প্রাণী ব্যতীত জীবজগতের অন্য কোনও প্রাণীর পালক থাকে না। পায়রার সারা দেহ পালকে এরূপে ঢাকা থাকে যে, দেহটি অত্যন্ত মসৃণ দেখায় ফলে বায়ুতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। পালক শীততাপ নিয়ন্ত্রক ও জলনিরোধক হওয়ায় পায়রা আকাশের উচ্চতায় শীতলতর পরিবেশে এবং বৃষ্টি ভেজার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ডানার পালকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং একে অপরকে অংশত আবৃত করে প্রশস্ত আবরণের সৃষ্টি করে। এর ফলে ডানা প্রসারিত করে পায়রা বায়ুর উপর ভাসতে বা আন্দোলিত করে বায়ুতে যে গতির সৃষ্টি করে তার ফলে পায়রা দ্রুত উড়ে যায়। পুচ্ছ অঞ্চলের পালকগুলি প্রসারিত ক'রে দেহের গতি বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে নৌকার হালের মত দিক পরিবর্তন বা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

(৪) **বায়ুস্থলী** (Air sac) **ঃ** পায়রার ফুসফুসে প্রসারিত ব্রংকাস বা ক্লোমশাখার (bronchus) অগ্রবর্তী অঞ্চল প্রসারিত হয়ে দেহগহ্বরের মধ্যে বায়ুস্থলী সৃষ্টি করেছে। দেহের গ্রীবাদেশ থেকে উদর অঞ্চলে এরূপ নয়টি বায়ুস্থলী আছে। বায়ুস্থলীগুলি বায়ু সঞ্চয়ের জন্য আধারের কার্য করে। দেহের তাপে বায়ুস্থলীতে উপস্থিত প্রশ্বাসবায়ু উত্তপ্ত হয়ে লঘু হওয়ায় দেহের ওজন কমে যায়। এইভাবে বায়ুস্থলী গরম বাতাসে ফুলে ওঠায় বায়ুপূর্ণ বেলুনের মত পাখীকে উর্দ্ধে উড়তে সাহায্য করে।

(৫) **দৃঢ়ভাবে পরস্পর সংযুক্ত লঘুভার অস্থি ঃ** পায়রার দ্রুত গতিবেগ সৃষ্টি, পেশীসমূহের সজোরে সংকোচন ও প্রসারণের ফল, এজন্য দেহের অন্তঃকংকাল অত্যন্ত সুগঠিত। দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্থিগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি সুদৃঢ় কাঠামোর সৃষ্টি করে। এই সঙ্গে অস্থিগুলির মধ্যে বায়ুস্থলীর অংশ প্রবেশ করায় অস্থিগুলি অত্যন্ত হালকা হয়। এই প্রকার একত্রে যুক্ত হালকা অস্থি পায়রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন।
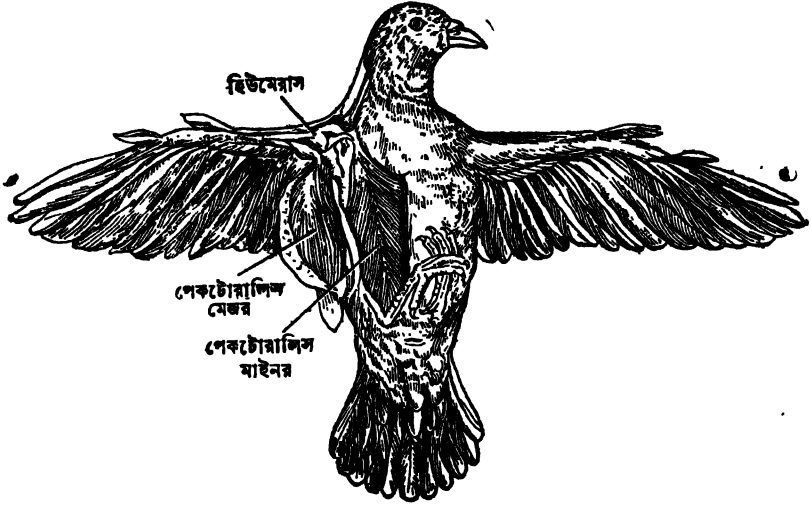
৪৮নং চিত্র ॥ পায়রার বিভিন্ন উড্ডয়ন—পেশীর সাহায্যে ডানা আন্দোলন দ্বারা উড়বার দৃশ্য।

(৬) **উরঃফলক বা বক্ষাস্থি** (Sternum)ঃ পায়রার উরঃফলক নৌকার ন্যায় আকার-বিশিষ্ট হয়। উরঃফলকে বিভিন্ন উড্ডয়ন পেশী যুক্ত থাকে।

(৭) **উড্ডয়ন পেশী** (Flight muscles)ঃ পায়রার ডানার প্রসারন ও আন্দোলন দ্বারা বায়ু কাটিয়ে উড়বার জন্য পেকটোরালিস মেজর, পেকটোরালিস মাইনর ইত্যাদি বিভিন্ন সুগঠিত পেশী থাকে।

(৮) **প্রভূত শক্তি উৎপাদনে পৌষ্টিকতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের পরিবর্তন ঃ** স্থলচর জীবের গমনে যে পরিমাণ শক্তির ব্যয় হয় আকাশে উড়বার জন্য পায়রার তদপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োজন। এজন্য দ্রুত খাদ্য পরিপাকের দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ এবং এই শোষিত খাদ্যবস্তুর দ্রুত দহন দ্বারা প্রচুর শক্তির উৎপাদন প্রয়োজন। পায়রার পৌষ্টিকতন্ত্র এরূপে গঠিত যে খাদ্যদ্রব্য দ্রুত পাচিত হয়। পাচিত খাদ্যদ্রব্য পৌষ্টিকতন্ত্রের অন্ননালীর প্রাচীরে উপস্থিত প্রচুর রক্তবাহের মাধ্যমে এবং পায়রার দেহের অনুপাতে বৃহৎ হৃৎপিণ্ডের দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়। প্রশ্বাসে গৃহীত অধিক পরিমাণে বায়ু বায়ুস্থলীর মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং অধিক অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে কোষে

সরবরাহের দ্বারা অধিক পরিমাণ খাদ্যকে জারিত ক'রে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করে। অধিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পায়রার বিপাক ক্রিয়ার হার অধিক এবং এজন্য পায়রার দেহের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্থলচর প্রাণী অপেক্ষা অধিক (প্রায় ৪৫° সেণ্টিগ্রেড) হয়।

(৯) **মূত্রস্থলীর অনুপস্থিতি ঃ** পায়রার দেহের ওজন হালকা করার জন্য মূত্রস্থলীর বিলুপ্তি ঘটেছে।

(১০) **পায়রার চক্ষুতে অবস্থিত পেকটেন** (Pecten) ঃ পায়রার চোখের ভিতরে অক্ষিপটে অবস্থিত পেকটেন নামক চিরুণির মত যন্ত্র পায়রাকে দূরবর্তী বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে।

পায়রার মত কাক, চিল ও অন্যান্য বহু পাখী উড়তে পারে। এদের নৌকোর আকারের উরঃফলক বা স্টার্ণাম (Sternum) থাকায় এদের **ক্যারিনেটি** (Carinatae) বর্গের পাখী বলে। আবার অনেক পাখী আছে যারা উড়তে পারে না। এদের দেহের ওজন অধিক, ডানা অপরিণত। পালকগুলির অংশ পরস্পর যুক্ত না হওয়ায় উড়তে পারে না, তবে দ্রুত দৌড়াতে পারে। এই প্রকার জীবিত পাখীর মধ্যে উটপাখী সর্বাপেক্ষা আকারে বড় এবং এদের আফ্রিকার মরু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এমু এবং ক্যাসোয়ারী ইত্যাদি পাখীও উড়তে পারে না। এই প্রকার পাখীদের উরঃফলক চ্যাপ্টা বলে এদের **র‍্যাটিটি** (Ratitae) বর্গের পাখী বলে।

উদ্ভিদের অভিযোজন

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে বিভিন্ন পরিবেশের উদ্ভিদের মধ্যে বহু প্রকারের অভিযোজন দেখা যায়। এই সকল অভিযোজন উদ্ভিদের দেহে জৈবিক ক্রিয়ার প্রয়োজনে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন আনে। পরিবেশের মধ্যে জলের পরিমাণ ও গুণগত উপস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন হয়। আবার উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের অক্ষমতার জন্য পরজীবীরূপে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যও অভিযোজন দেখা যায়। নিম্নে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজনের বর্ণনা করা হচ্ছে।

জলসরবরাহ ও জলের গুণ অনুযায়ী উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন ঃ

জলই জীবের জীবন কিন্তু অধিক বা অল্প জল উহার মধ্যে ক্ষতিকারক বস্তুর উপস্থিতি জীবকে প্রভাবিত করে। এইজন্য বিভিন্ন পরিবেশে জলের উপস্থিতির পরিমাণ বা জলের গুণাগুণ ও উদ্ভিদের অভিযোজন অনুযায়ী উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) প্রয়োজনীয় জলের উপস্থিতিতে স্থলের বিভিন্ন প্রকার সাধারণ উদ্ভিদকে স্থলজ উদ্ভিদ বা **মেসোফাইটস্** (Mesophytes), (খ) জলাভূমি, পুকুর, ডোবা, নদী ইত্যাদি অঞ্চলের উদ্ভিদকে **জলজ** বা **হাইড্রোফাইটস** (Hydrophytes), (গ) কম বা অত্যল্প জলযুক্ত ডাঙাজমি বা মরুভূমির উদ্ভিদকে **জাঙ্গল বা জেরোফাইটস্** (Xerophytes), (ঘ) **লবণাক্ত জলযুক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ**

বা **হ্যালোফাইটস্** (Halophytes) এবং (ঙ) অন্য কোনও উদ্ভিদের উপর আশ্রয় লাভকারী উদ্ভিদকে **পরাশ্রয়ী** বা **এপিফাইটস্** (Epiphytes) বলে।

(১) **জলজ উদ্ভিদ—পদ্মের অভিযোজন ঃ** পদ্ম এক প্রকার স্বাদু জলের উদ্ভিদ। এই প্রকার উদ্ভিদ পুকুর, ডোবা, দিঘি ইত্যাদির অপেক্ষাকৃত গভীর জলে জন্মায়। জলের মধ্যে জন্মানোর জন্য এদের দেহের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন দেখা যায়—এদের কাণ্ড জলের তলায় পাঁকের মধ্যে থাকলেও পাতা ও ফুল জলের উপরে থাকে। জলজ উদ্ভিদ পদ্মের অভিযোজনকে **জলজ অভিযোজন** বলে।

(ক) **মূল ঃ** (১) পদ্মের মূল বা মূল থেকে উৎপন্ন শাখা এবং প্রশাখা মূল সুগঠিত হয় না। (২) পদ্মের মূল কর্দম বা পাঁকের মধ্যে অক্সিজেন অল্প পরিমাণে পাওয়ার জন্য শ্বসন করতে পারে না। এজন্য মূলের মধ্যে বায়ুগহ্বর থাকে এবং
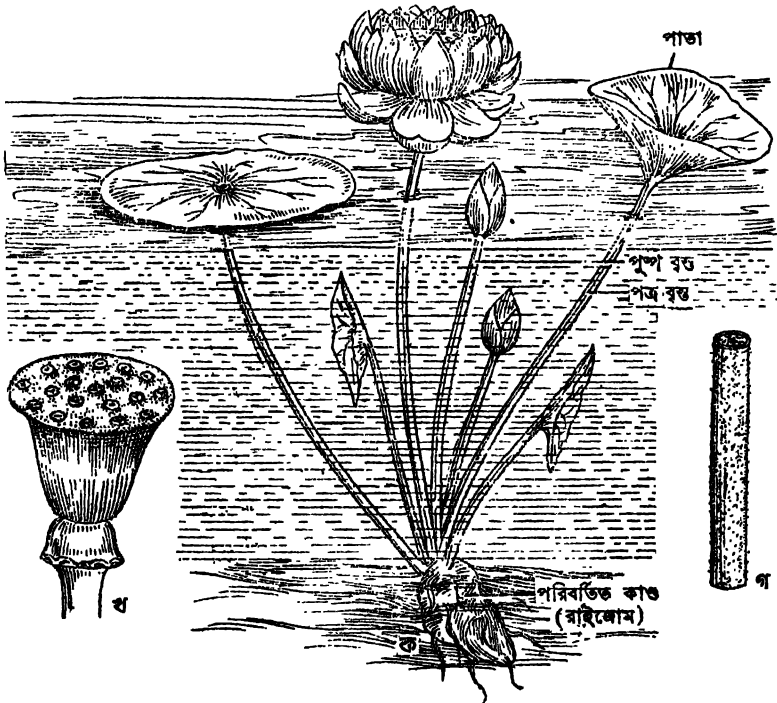
৪৯নং চিত্র ॥ পদ্মের অভিযোজন –(ক) কাদার মধ্যে পদ্মের মূল, জলের মধ্যে বৃন্ত এবং জলের উপরে পাতার ফলক ও পুষ্পের অবস্থানের দৃশ্য, (খ) পদ্মের পুষ্পাক্ষ এবং (গ) পত্র ও পুষ্প বৃন্তে কাঁটা এবং অভ্যন্তরে বায়ু নলের অবস্থানের দৃশ্য।

কাণ্ডের বায়ুগহ্বরের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহ হয়। (৩) বহু স্পঞ্জের মত নরম অস্থানিক মূল থাকে।

(খ) **কাণ্ড ঃ** পদ্মের কাণ্ডটি পরিবর্তিত মৃদগত কাণ্ড। এই প্রকার কাণ্ডে পর্ব-সন্ধি ও পর্বমধ্য সুস্পষ্ট এবং কাণ্ডের উর্পরিভাগ থেকেও অস্থানিক মূল জন্মায়। (১) এই প্রকার কাণ্ডকে রাইজোম (আদার কাণ্ডের মত আকারের) বলে। (২) কাণ্ডের মধ্যে বায়ু গহ্বর থাকায় এবং জাইলেম এবং অন্যান্য যান্ত্রিক কলা (যে কলা উদ্ভিদ দেহের কাষ্ঠল অংশ উৎপন্ন করে) অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় কাণ্ড স্পঞ্জের মত নরম। (৩) পদ্ম বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ হওয়ায় এদের বংশবিস্তার কাণ্ডের অঙ্গজ জননের সাহায্যে ঘটে। (৪) গ্রীষ্মের তাপে পুকুর, ডোবার জল শুকিয়ে গেলে পদ্মের মৃদগত কাণ্ডটি মাটির নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং বর্ষায় জল জমলে কাণ্ড থেকে পাতা বেরোয়। (৫) প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচার জন্য কাণ্ডে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকায় পদ্মের কাণ্ডটি স্থূল হয়।

(গ) **পাতা ঃ** পদ্মের পাতা দীর্ঘপত্রবৃন্ত এবং গোলাকার (মণ্ডলাকার) ফলক দ্বারা গঠিত। **পত্রবৃন্ত**—(১) সরু নলাকার এবং স্পঞ্জের মত নরম। (২) পত্রবৃন্তের অভ্যন্তরে কোষগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে বহু বায়ুগহ্বর সৃষ্টি করেছে। বায়ু-গহ্বরগুলি একত্রে সংযুক্ত হয়ে পত্রবৃন্তের অভ্যন্তরে বহু ফাঁপা বায়ুনলের সৃষ্টি করে। (৩) বৃন্তের বায়ুনলগুলির মধ্যে বায়ু থাকায় জলের মধ্যে লম্বভাবে ভেসে থাকে। (৪) পত্র ও পুষ্প বৃন্তের বহিঃস্ত্বকে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা থাকায় উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। (৫) পুকুর, ডোবা বা দিঘির জল বাড়লে বা নূতন পাতা বা ফুলের কুঁড়ি উৎপন্ন হ'লে বৃন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে জলের স্তরের উপরে বায়ুর মধ্যে পাতা বা ফুলকে ভাসিয়ে রাখে। (৬) বৃন্তের বহিঃস্ত্বকে কিউটিকল না থাকায় সহজেই জল শোষণ করতে পারে, এজন্য পদ্ম মূলের দ্বারা জল শোষণের উপর নির্ভর করে না। **পাতার ফলক ঃ** (১) গোলাকার (মণ্ডলাকার) এবং ফলকের উপরে পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটাগুলি থাকায় বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়। (২) পাতার ফলকের উপরিভাগে মোম জাতীয় পদার্থযুক্ত কিউটিকল আবরণী থাকায় পাতা জলের দ্বারা ভিজে যায় না। পাতার মোম জাতীয় বস্তু জলনিরোধক, এজন্য জলের বিন্দুগুলি একত্রে যুক্ত হয়ে পাতার এক জায়গায় জড়ো হয় এবং পত্ররন্ধ্রগুলিকে অবরুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করে (৩) ফলকের অভ্যন্তরে কোষগুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে বহু বায়ুগহ্বর আছে। বায়ুগহ্বরগুলি সংযুক্ত হয়ে বৃন্তের গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। (৪) বায়ুগহ্বর থাকায় পাতা স্পঞ্জের মত নরম হয় এবং পাতা জলের উপর ভেসে থাকে। (৫) পাতার বায়ুগহ্বর যথাক্রমে জলে নিমজ্জিত বৃন্ত, কাণ্ড এবং মূলের বায়ুগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড চলাচলে সাহায্য করে।

(ঘ) **পুষ্প ঃ** (১) পদ্মের ফুল জলের উপরে উঠে থাকে তাতে পরাগ সংযোগের সুবিধা হয়। (২) পদ্মের পুষ্পাক্ষটি লাটিমের মত আকার-বিশিষ্ট এবং পুষ্পাক্ষের মধ্যে বায়ুগহ্বর থাকায় পুষ্পাক্ষটি জলে ভাসতে পারে। (৩) পুষ্পাক্ষের মধ্যে

পদ্মের ফল এবং ফলের মধ্যে বীজগুলি নিহিত থাকে এবং পুষ্পাক্ষটি জলস্রোতে ভাসতে ভাসতে দূরবর্তী অঞ্চলে ফল ও বীজের বিস্তার করে। (৪) পদ্মবীজের বীজ-বহিঃত্বকটি (testa) শক্ত আবরণীর সৃষ্টি দ্বারা বীজটিকে অধিক তাপমাত্রায় বা আর্দ্রতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং বীজ ২-৪ বৎসর পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

(৬) **পদ্মের বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ঃ** পদ্ম গাছের মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্পবৃন্ত, জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকায় এবং দেহের বহিঃত্বক পাতলা হওয়ায়, পদ্মগাছ সহজেই জল, জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ বস্তু, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের মধ্যে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এজন্য পদ্ম মূলের সাহায্যে জল শোষণের উপর নির্ভর করে না। আবার এই প্রকার উদ্ভিদ দেহের সব অঞ্চল দিয়ে জল শোষণ করতে পারে বলে এদের সংবহনকলা (জাইলেম) অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পত্র ও পুষ্পবৃন্ত এবং পাতা উদ্ভিদের প্রধান অংশ এবং এই অংশগুলিতে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ মোটামুটি সর্বত্রই ঘটে, এজন্য এদের খাদ্য সংবহনের কলা (ফ্লোয়েম) সুগঠিত নয়।

(২) **ক্যাকটাসের অভিযোজন ঃ** পৃথিবীর বহু অঞ্চলে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাটির স্তরে জলের পরিমাণ এত অল্প পরিমাণে থাকে যে এই সকল অঞ্চলে কোন গাছপালা জন্মায় না। এই প্রকার অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত এবং গাছপালা-বিহীন শুষ্ক অঞ্চলকে মরুভূমি বলে। আবার বৃষ্টিপাত হলেও জল যদি মাটির অধিক গভীরে চলে যায় তাহলেও মাটি শুকিয়ে উদ্ভিদের জীবন ধারণের অনুপযুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের কোন কোন খরা অঞ্চল ইত্যাদিতে এই প্রকার পরিবেশ দেখা যায়। আবার এমন অনেক অঞ্চল আছে যে, অঞ্চলের মাটিতে জল থাকলেও তা উদ্ভিদের পক্ষে অনুপযুক্ত বা গ্রহণীয় হয় না তাহলেও মরুভূমি অঞ্চলের মত অবস্থার সৃষ্টি করে। এই সকল বিভিন্ন অঞ্চলের শুষ্ক পরিবেশে যে প্রকার উদ্ভিদ জন্মায় তাদের জলসংগ্রহ, জলসঞ্চয় এবং জলক্ষয় নিবারণ ইত্যাদির জন্য অভিযোজিত হতে হয়। এই প্রকার মরুভূমি বা শুষ্ক ডাঙা অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশে যে প্রকার অভিযোজন হয় তাকে **জাঙ্গল অভিযোজন** বলে। পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রকার শুষ্ক মরুভূমির পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়, কারণ এই প্রকার পরিবেশের জন্য তাদের দেহের অভিযোজন ঘটেছে। ক্যাকটাসের অভিযোজনের যে সকল প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হচ্ছে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য—(ক) জল শোষণের নিমিত্ত তাদের মূলের পরিবর্তন, (খ) জল সঞ্চয়ের জন্য দেহ রসালো হওয়া, (গ) জলক্ষয় নিবারণের জন্য বাষ্পমোচন হ্রাস করা এবং এজন্য উদ্ভিদদেহের পরিবর্তন ইত্যাদি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে প্রকার ক্যাকটাস প্রধানত দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে ফণিমনসা। কিন্তু বিভিন্ন মরুভূমি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের বিভিন্ন রসালো ক্যাকটাস জন্মায় এবং অনেকে ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন

বৈচিত্র্যময় আকারের ক্যাকটাস টবে লাগিয়ে রাখেন। ক্যাকটাসের অভিযোজনগুলি নিম্নলিখিত পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে—

৫০নং চিত্র ॥ বিভিন্ন প্রকার ক্যাকটাসের অভিযোজন—(ক) ফণিমনসা এবং (খ ও গ) দীর্ঘ ও গোলাকার ক্যাকটাস।

(ক) মূল : যে সকল অঞ্চলের মাটিতে জল উপরের স্তরে থাকে না সেই অঞ্চলের ক্যাকটাসের মূল মাটির গভীর স্তরে বিস্তারিত হয়ে জল শোষণ করে। কিন্তু যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং জল উপরের স্তরে থাকে সেই অঞ্চলের ক্যাকটাসের মূল মাটির গভীরে যায় না।

(খ) কাণ্ড : ক্যাকটাসের যে অঙ্গের অভিযোজনটি সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় তা হচ্ছে কাণ্ড। কারণ অধিকাংশ ক্যাকটাসের কাণ্ড চ্যাপ্টা, গোলাকার বা বিভিন্ন কোণাকৃতির এবং বিভিন্ন আয়তনের হয়। ফণিমনসার কাণ্ডটি পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা এবং প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় সবুজ দেখায়। কাণ্ডের এই প্রকার রূপান্তরকে পর্ণকাণ্ড (phylloclade) বলে। জল সঞ্চয়ের জন্য কাণ্ডের অভ্যন্তরে বহু জলসঞ্চয়ী কোষ থাকায় কাণ্ড রসালো (succulent) হয়। অ্যামেরিকার অ্যারিজোনা অঞ্চলে স্ফীত পিপার আকার-বিশিষ্ট বৃহৎ ক্যাকটাস প্রভূত পরিমাণে জল সঞ্চয় করে রাখে। সকল প্রকার ক্যাকটাসের ভবিষ্যতে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জল সঞ্চয় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্যাকটাসের কাণ্ডের মাধ্যমে বাষ্পমোচন হ্রাস করার জন্য বহিঃস্তরকে দৃঢ় কিউটিকল আবরণ এবং কিউটিকলের উপর ঘন মোমজাতীয় পদার্থের আবরণী থাকে। কাণ্ডের বহিঃস্তরকের অভ্যন্তরে ইতস্তত ছড়ানো নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র (sunken stomata) থাকায় বাষ্পমোচন অল্প হয়। কাণ্ডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এবং

শুষ্ক মরসুমে জলসঞ্চয়ী কোষ থেকে জল গ্রহণ ক'রে সালোকসংশ্লেষ দ্বারা ক্যাকটাস খাদ্য উৎপন্ন করে।

(গ) **পত্র** ঃ ক্যাকটাস বাষ্পমোচন হ্রাস করার জন্য তাদের পাতাকে **পত্রকণ্টকে** (spine রূপান্তরিত করেছে। কারণ পাতায় উপস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ জল উদ্ভিদদেহ থেকে বেরিয়ে গেলে জলাভাবে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটতে পারে। পত্রকণ্টক বাষ্পমোচন হ্রাস করা ব্যতীত উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কার্যেও সাহায্য করে।

(ঘ) **প্রোটোপ্লাজমের অভিযোজন** ঃ বিভিন্ন প্রকার ক্যাকটাসে জলাভাব ঘটলেও যে বাঁচতে পারে তার কারণ হচ্ছে যে, তাদের কোষের প্রোটোপ্লাজমের জলাভাব সহ্য করার ক্ষমতা অন্যান্য উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু অন্যান্য উদ্ভিদের কোষের প্রোটোপ্লাজম সামান্য পরিমাণে জলের অভাব ঘটলে মারা যায়।

(৩) **সুঁদুরী (সুন্দরী) বৃক্ষের অভিযোজন** ঃ পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল যার পশ্চিমে হুগলী নদী এবং পূর্বে বাংলাদেশের মেঘনা নদীর অন্তবর্তী অঞ্চলে ঘন বনাঞ্চল আছে। এই বনাঞ্চলের নাম সুন্দরবন। এই বনে প্রচুর পরিমাণ সুঁদুরী গাছ জন্মায় বলে সুন্দরী গাছের নাম অনুযায়ী এর সুন্দরবন নাম হয়েছে। এই অঞ্চলের নিচু জমি জোয়ারের সময় নদী ও খাঁড়ির জলে ডুবে যায় এবং ভাটার সময় জল চলে গেলে জমি আবার ভেসে ওঠে। জোয়ার ভাটার জল যাওয়া আসায় জমি কর্দমাক্ত এবং সমুদ্র নিকটে হওয়ায় নদীর লবণাক্ত জলে মাটির মধ্যে লবণের আধিক্য হয়। জলে ডুবে যায় বলে এই প্রকার জমির মাটিতে সাধারণত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয় এবং লবণের
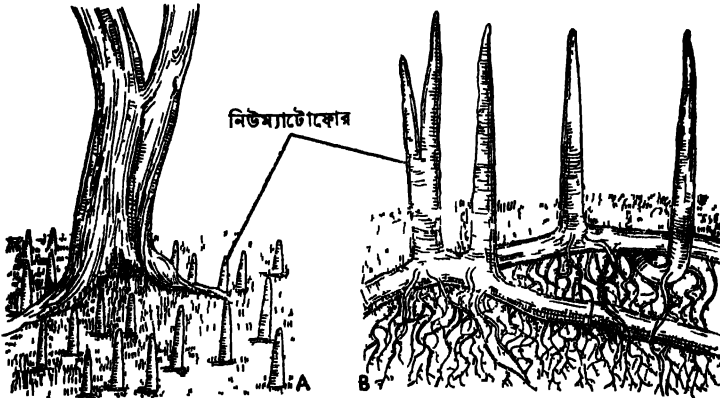
৫১নং চিত্র ॥ সুঁদুরী গাছের শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর উৎপন্নের দৃশ্য।

আধিক্যের জন্য উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই প্রকার মাটিকে 'লাবণিকবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা' বলে। এই প্রকার জমিতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন দেখা যায়। এই প্রকার নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে যে প্রকার বনাঞ্চল গড়ে ওঠে তাকে

ম্যানগ্রোভ (mangrove) বলে। এই প্রকার বনাঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরীর অভিযোজন বিশেষ প্রকার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে, যথা—

(ক) **সুন্দরীর আকার ঃ** গম্বুজাকার এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০ মিটার পর্যন্ত হয়। ডালপালা ঘন সবুজ চকচকে পাতায় ঢাকা থাকে।

(খ) **শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর ঃ** নরম কর্দমাক্ত মাটিতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার জন্য মূল বহু শাখা-প্রশাখাসহ মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মাটি জোয়ারের জলে পর্যায়ক্রমে ডুবে যাওয়ায় এবং কর্দমাক্ত হওয়ায় মাটির অভ্যন্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। এজন্য মূল অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকার্য করতে পারে না বলে শলাকার আকারে মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এই প্রকার মূলের অগ্রবর্তী সূচালো অঞ্চলে বহু ছিদ্র থাকে। এই প্রকার ছিদ্রকে শ্বাসছিদ্র বলে এবং এই শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে মূল বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য করে। এই প্রকার শলাকাকার মূলকে **শ্বাসমূল** (pneumatophores) বলে।

(৪) **মটর গাছের আরোহণের জন্য অভিযোজন ঃ** মটর গাছ রোহিণী জাতের বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের কাণ্ড সরু এবং নরম। এই সকল উদ্ভিদ মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না—মাটির উপরে লতিয়ে থাকে, এজন্য এদের দেহে অন্য কোন আশ্রয়ের উপর ভর করে আরোহণের নিমিত্ত কোনও অঙ্গের অভিযোজন হয়। মটর গাছের পাতা যৌগিক এবং পাতার ফলক বহু পত্রকে বিভক্ত হয়। পাতার অগ্রবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি পত্রক দীর্ঘ নলাকার আকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে কোন আশ্রয়ের চারদিকে জড়িয়ে উদ্ভিদের আরোহণে সাহায্য করে। এই প্রকার রূপান্তরিত পত্রককে **পত্রাকর্ষ** বলে। পত্রাকর্ষ কোন বস্তুর সংস্পর্শে অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় যখনই কোন পার্শ্ববর্তী বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখনই তাদের চারদিকে পাকিয়ে মটর গাছকে আরোহণ করতে সাহায্য করে। ফলে মটর গাছ তার শাখা-প্রশাখাসহ ঊর্ধ্ব দিকে উঠে প্রয়োজনীয় সূর্যালোক ও বাতাস পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন করতে পারে। মটর গাছের এই প্রকার অভিযোজনকে **স্থলজ** আরোহণের জন্য **অভিযোজন** বলে।

৫২নং চিত্র ॥ মটর গাছের পত্রাকর্ষের সাহায্যে আরোহণের দৃশ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র (Carbon cycle, Nitrogen cycle and Oxygen cycle)

পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সঙ্গে মাটি, জল এবং বায়ুর যে সম্পর্ক দেখা যায় তার দ্বারা জৈব এবং জড় জগৎ যে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তা বোঝা যায়। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের জীবনযাত্রা এবং স্থায়িত্ব প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক মৌলিক পদার্থগুলির ছয় ভাগের এক ভাগের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। এই সকল মৌলিক পদার্থ বা এদের যৌগগুলির ব্যবহারে জীবের বিপাক, বৃদ্ধি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা পূর্বেই সূর্যালোক হ'তে সংগৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার জড় পদার্থ এবং সূর্য থেকে প্রাপ্ত সৌরশক্তির অতি অল্প অংশই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জৈবিক কার্যে ব্যবহৃত হয়। তবে পৃথিবীতে উদ্ভিদের প্রাচুর্যের জন্য তাদের মাধ্যমে জড় পদার্থ ও সূর্যালোক হ'তে প্রাপ্ত শক্তিপ্রবাহের পরিমাণ কম নয়। এই প্রকার জড়বস্তু ও শক্তিপ্রবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে যে, এই প্রকার প্রবাহ জীব ও জড়বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়।

পরিবেশের মধ্যে জৈব এবং অজৈব বস্তুর সম্পর্ক বিভিন্ন চক্র বা আবর্তের দ্বারা বুঝান হয়। পরিবেশের মধ্যে বহুপ্রকার চক্র আছে। যথা—**নাইট্রোজেন চক্র** বা **আবর্ত**, **কার্বন চক্র** বা **আবর্ত**, **অক্সিজেন চক্র** বা **আবর্ত**, ফসফরাস আবর্ত, জল আবর্ত ইত্যাদি। এই সকল চক্র প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন যাতে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মাটি ইত্যাদি সকলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদিও এই সকল চক্রকে সহজে বুঝবার জন্য আলাদা করে বর্ণনা করা হয় তথাপি প্রতিটি চক্র একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই চক্রগুলি সর্বদা চলছে। চক্র বা আবর্ত কথাটি বলতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে শুরু করে আবার সেই অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনকে বুঝায়, কিন্তু স্থান এবং অবস্থাভেদে অনেক সময় এগুলির ব্যতিক্রম হয়।

(১) কার্বন চক্র বা আবর্ত (Carbon cycle)

বিভিন্ন চক্রের মধ্যে কার্বন চক্র অতি সরল চক্র। বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের পরিমাণ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাতে অতি অল্প, শতকরা প্রায় 0·03। কিন্তু বায়ুমন্ডলে যদিও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অল্প তবুও এর পরিমাণ হিসাব করলে প্রায় ২,৫00 লক্ষ কোটি টন হবে যার মধ্যে কার্বনের পরিমাণ প্রায় ৬00 লক্ষ কোটি টন। বায়ুর মধ্যে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড হ'তে স্থলজ উদ্ভিদ প্রায় ১৬ শত কোটি টন কার্বন সালোকসংশ্লেষে গ্রহণ করে। এই কার্বন প্রায় ৬0 লক্ষ কোটি টন কার্বন

ডাই-অক্সাইডের মধ্যে থাকে। ক্রমাগত বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষে গৃহীত হ'লে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃশেষিত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একই পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রকৃতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চয়ঃ

যদিও বায়ুর কার্বনের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকে তবুও কিছু পরিমাণ কার্বন সরাসরি বায়ুতে পুনরায় প্রত্যাবর্তিত না হয়ে বিভিন্ন প্রকারে মাটির অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষে আত্তীকরণ করে যে বিভিন্ন প্রকার জৈববস্তু উৎপন্ন করে তা কোষের মধ্যে সঞ্চিত রাখে। প্রাণীরা উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করে নিজেদের দেহে বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তু সংশ্লেষ করে। কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ধ্বংস হয়ে মাটির মধ্যে চাপা পড়ে এবং বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা কয়লা, পেট্রল ও অন্যান্য খনিজ তৈল হিসাবে প্রাকৃতিক সঞ্চয়রূপে মাটির অভ্যন্তরে থাকে। বর্তমানে হিসাব ক'রে দেখা হয়েছে যে এই প্রকার প্রাকৃতিক কার্বনের সঞ্চয় বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন আছে তার থেকে প্রায় ১০,০০০ গুণ অধিক হবে। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, বোদ মাটির স্তর এবং তৈল উৎপাদক কোমল স্লেট মাটির স্তরের মধ্যেও কার্বন সঞ্চিত হচ্ছে। তথাপি বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত অপরিবর্তিত আছে তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রত্যাবর্তন।
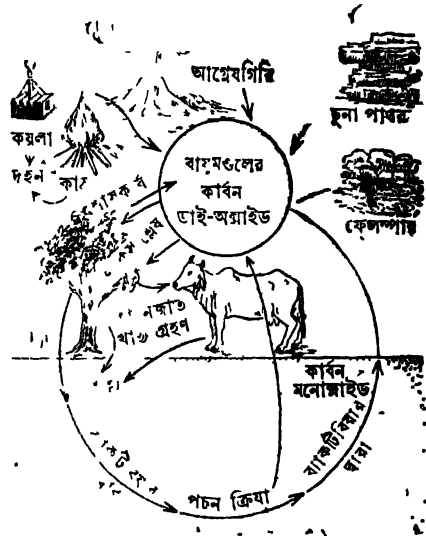
৫৩নং চিত্র ॥ কার্বন চক্র।

সমুদ্র-জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাণ্ডার এবং বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নির্দিষ্ট রাখাঃ বর্তমানে জানা গিয়েছে যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ৫০—১০০ গুণ অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড সমুদ্রের জলের মধ্যে সঞ্চিত আছে। সমুদ্র-জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের এই বিরাট সঞ্চয় থেকেই বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত বা ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে।

উদ্ভিদ কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ: প্রকৃতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখবার ব্যবস্থা থাকলেও উদ্ভিদ ক্রমাগত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করতে থাকে। বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ দেহে শ্বেতসার পদার্থ সৃষ্টির দ্বারা সঞ্চিত হয়।

প্রাণী উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণের ফলে উদ্ভিদের দেহজাত শ্বেতসার খাদ্যবস্তু প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয়। বায়ুমণ্ডল থেকে এইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়াও মন্দীভূত হতে পারে।

পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মুক্তি: উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবেশে মুক্তি ঘটে। আবার কাঠ, কয়লা ও খনিজ তৈল পোড়ানোর ফলেও কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশে মুক্তি পায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করে। তবে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যুতে বিপুল পরিমাণ ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক পচন ক্রিয়ার দ্বারা জীবদেহে আবদ্ধ কার্বন ডাই-অক্সাইডের মুক্তি সাধন করে।

এইভাবে বারংবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি প্রাকৃতিক চক্র বা আবর্তের মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত এবং মুক্ত হচ্ছে। বহু যুগযুগান্তর ধরে আমাদের দেহের কার্বন ডাই-অক্সাইড সারা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের মধ্যে চিরন্তন আবর্তের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রাণিদেহে এবং প্রাণিদেহের পচনক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর মাধ্যমে আবার উদ্ভিদ দেহে আবর্তিত হচ্ছে। এইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের জীব জগৎ ও জড়বস্তুর মধ্যে চক্রাকার প্রত্যাবর্তনকে **কার্বন চক্র বা কার্বন আবর্ত** বলে।

(২) নাইট্রোজেন চক্র বা আবর্ত (Nitrogen cycle)

জীবদেহের কোষের ভৌত ভিত্তিস্বরূপ প্রোটোপ্লাজম গঠনের উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন। ইহা ব্যতীত প্রাণীর প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রোটীন গঠনে নাইট্রোজেন অত্যাবশ্যক উপাদান।

বায়ুমণ্ডলেব শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকলেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না। তারা মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন জাতীয় খনিজ লবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোম দ্বারা শোষণ করে নাইট্রোজেনের অভাব মিটায়। অনেক প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত লবণ উদ্ভিদ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, সেই লবণগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা সরল নাইট্রোজেন লবণে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণীয় হয়। এইভাবে আবহমান কাল ধরে নাইট্রোজেন মাটি থেকে ক্রমাগত উদ্ভিদ দ্বারা গ্রহণের ফলে এর সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং মাটি বন্ধ্যা হয়ে যাবে যদি না এর পূরণের কোনও ব্যবস্থা থাকে।

মাটিতে নাইট্রোজেনের ক্ষয়পূরণ :

(ক) **নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ** (Nitrogen fixation) : বিভিন্ন প্রকার মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়া এবং এক জাতের নীল-সবুজ শৈবাল বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটরূপে নিজেদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে। এদের মৃত্যুর পর তাদের দেহজাত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই সব ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের (ছোলা, মটর, ধঞে ইত্যাদি) মূলে বাসকারী রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটিরিয়া মূলজ অর্বুদ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বায়ুর নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে রাখে। শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদেরা মারা গেলে মূলজ অর্বুদ মাটিতে পচে গলে মিশে যায় এবং মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(খ) **বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা :** আবহমণ্ডলে বিদ্যুৎপাতের ফলে নাইট্রোজেন নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির জলে মিশে বিভিন্ন বস্তুর সাথে বিক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকায় নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে।
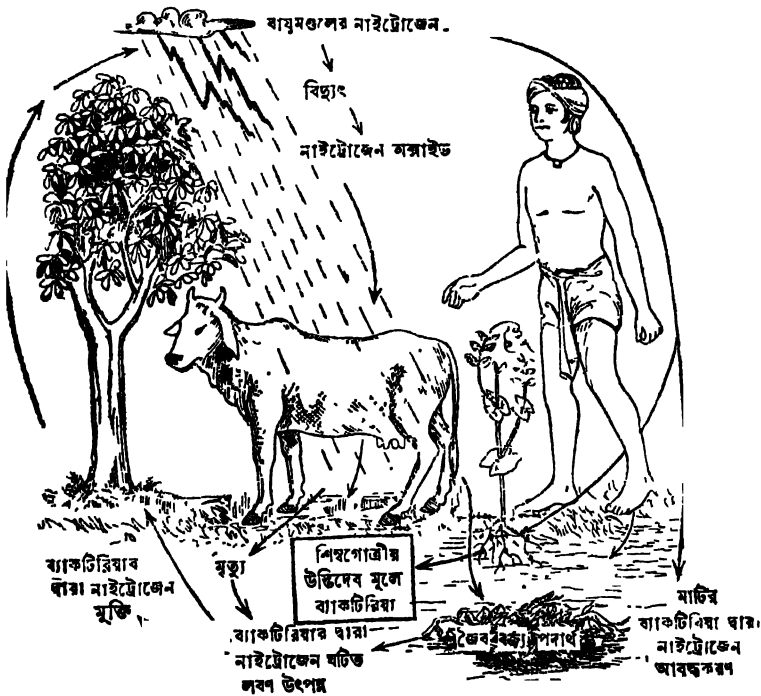
৫৪নং চিত্র ॥ নাইট্রোজেন চক্র।

(গ) **মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর পচন দ্বারা :** মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের পচনের ফলে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ মাটিতে মিশে যায় এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

অনেক ব্যাকটিরিয়া আবার মাটির মধ্যে থেকে মৃত জীবজন্তুর পচাগলা দেহাবশেষ থেকে নাইট্রেট জাতীয় লবণকে নাইট্রাইটস ও অ্যামোনিয়ায় এবং পরে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করে। নাইট্রোজেন পুনর্বার বায়ুতে মিশে যায়—এই প্রক্রিয়াকে **ডিনাইট্রিফিকেসন** (Denitrification) বলে। এই উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হয়।

(ঘ) **নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ দ্বারা ঃ** কৃষিকার্যে মাটিতে যে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাও বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করে।

এই সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন মাটিতে সঞ্চিত হয়ে উদ্ভিদের দেহের মধ্যে প্রোটীন উৎপন্নে সাহায্য করে। শাকাশী প্রাণীরা উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে যে প্রোটীন উৎপন্ন করে মাংসাশী প্রাণীরা শাকাশী প্রাণীদের আহার সেই সেই প্রোটীন দ্বারা নিজেদের দেহের প্রোটীনের প্রয়োজন মেটায়। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে মিশে উদ্ভিদদেহে এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণিদেহের প্রয়োজনে লাগে, পরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর নাইট্রোজেন মাটিতে ও বায়ুতে মিশে যায়। সমগ্র প্রক্রিয়াকে **নাইট্রোজেন আবর্ত বা নাইট্রোজেন চক্র** (nitrogen cycle) বলে।

(৩) অক্সিজেন চক্র বা আবর্ত (Oxygen cycle)

অক্সিজেন ব্যতীত কোন জীব বাঁচতে পারে না, কারণ শ্বাসকার্য ও শক্তি উৎপাদনে অক্সিজেন সর্বদা প্রয়োজন হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত অক্সিজেনেরও নির্দিষ্ট
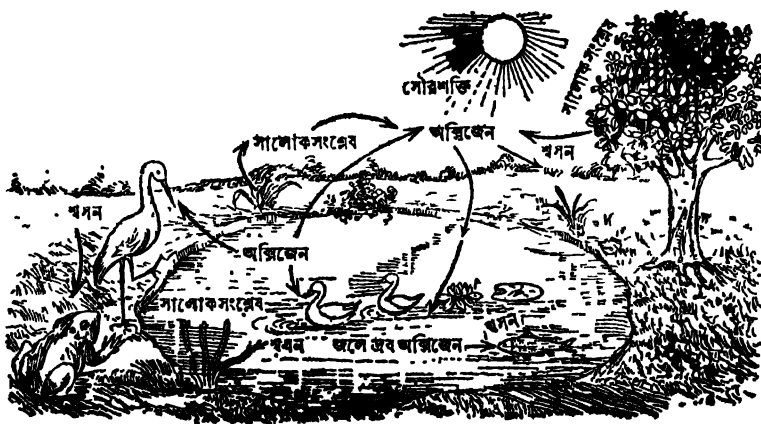
৫৫নং চিত্র ॥ অক্সিজেন চক্র।

চক্র আছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্বের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২১ ভাগ এবং বায়ুমণ্ডল ব্যতীত জলের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে। বিভিন্ন প্রকার

জীবদেহের খাদ্যবস্তু দহনের জন্য ' াজন হয়। জীবদেহে খাদ্যবস্তু ব্যতীত বহু জৈব ও অজৈব বস্তুর দহনের জন্য অক্সিজেন ' য়াজন এবং অক্সিজেন সহযোগে বহু মৌল বস্তুর অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন সক প্রকার কার্বন যৌগের মধ্যে প্রধান উপাদান। এইজন্য অক্সিজেন চক্র কার্বন চক্রের স ' পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই প্রকার দুটি চক্র জীব-জগতের সৃষ্টি ও রক্ষাকার্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য চক্ররূপে পরিগণিত হয়। অক্সিজেন চক্র বিষয়ে আলোচনা করার আগে অক্সিজেনের উৎস এবং কিভাবে ইহা ব্যয়িত হয় সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত।

(ক) **অক্সিজেন ব্যয়**—(১) প্রাণী এবং উদ্ভিদের জৈবিক কার্যে শক্তির প্রয়োজন এবং এই শক্তি জীবদেহে সঞ্চিত খাদ্য জারণের ফলে উদ্ভূত হয়। পরিবেশের অক্সিজেন শ্বাসকার্যে গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ দ্বারা জীবদেহের খাদ্যের জারণ সম্পন্ন হয়। এইভাবে জীবের শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের ব্যয় হয়। (২) বিভিন্ন প্রকার দাহ্যবস্তু, যথা—কাঠ, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদির দহনকার্যেও অক্সিজেন প্রয়োজন। (৩) সমুদ্রনিকটবর্তী অঞ্চল এবং পর্বতচূড়ায় তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা যে **ওজোন** (Ozone—O_3) গ্যাস উৎপন্ন হয় তার দ্বারাও অক্সিজেন ব্যয় হয়। পরে ওজোন অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সেই সব বস্তুকে জারিত করেও পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের মুক্তি ঘটায়। (৪) মাটির নাইট্রাস অক্সাইড অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। এই নাইট্রেট লবণ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলের সাহায্যে গ্রহণ করে পুষ্টি সাধন করে। এই উপায়েও পরিবেশের অক্সিজেন ব্যয়িত হয়।

(খ) **অক্সিজেনের উৎস:** (১) বায়ুমণ্ডলে ওজোন উৎপাদন যেমন অক্সিজেন ব্যয়ের ফলে ঘটে সেইরূপ একই উপায়ে অক্সিজেনের মুক্তি ওজোনের বিভিন্ন বস্তুর সাথে বিক্রিয়া এবং বিজারণ দ্বারা সংঘটিত হয়। (২) মাটির মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জীব (ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাক) মৃত জীবদেহে পচনক্রিয়া দ্বারা পরোক্ষভাবে অক্সিজেনের মুক্তি ঘটায়। (৩) **উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে সমপরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন করে।** এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে সব থেকে বেশী পরিমাণে O_2 মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষায় অক্সিজেন একদিকে যেমন ব্যয়িত হচ্ছে আবার অন্যদিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার মুক্তিও ঘটছে। প্রকৃতিতে এই প্রকার O_2 ব্যয় ও পূরণ ক্রমাগত চলছে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে **অক্সিজেন আবর্ত** বা **অক্সিজেন চক্র** বলে।

নবম পরিচ্ছেদ

ইকোসিস্টেম ও কনজারভেশান সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি

(General idea about Eco-system and Conservation)

প্রত্যেক সজীব বস্তু যথা, সরলতম ব্যাকটিরিয়া হ'তে অত্যন্ত জটিল বৃহৎ প্রাণী হাতী পর্যন্ত প্রত্যেকেই বিশেষ প্রকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। জীবনযাত্রা পরিচালনায় প্রতিটি সজীব বস্তু তার দেহের আকার, আয়তন, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া এবং যে পরিবেশে বাস করে তার উপর নির্ভরশীল। পরিবেশে জড় ও জৈব বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তার বিভিন্ন প্রকার কার্যকারণগুলি ভিন্ন ভিন্ন সর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে জড় ও জৈব বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের স্থলভাগ ও সমুদ্র অঞ্চলের পরিবেশ অপরিবর্তনীয়, তবে ঋতু অনুযায়ী স্থলভাগে তাপমাত্রার, বাতাসের আর্দ্রতার ও সূর্যালোকের তারতম্য ঘটে। **পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবকে সেই স্থানের জলবায়ু** (climate) বলে। স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাবে সেই স্থানের সজীব বস্তুর জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়।

কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ এককভাবে বাঁচতে পারে না। তারা সম্মিলিতভাবে পরস্পর নির্ভরশীল যৌথ সুবিধাভোগী **সজীব সম্প্রদায়** (living community) গড়ে তোলে। **প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার সজীব বস্তুর আচার, ব্যবহার ও জীবনধারণ-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাকে বাস্তুসংস্থান বা বাস্তব্যবিদ্যা** (Ecology) বলে। বাস্তব্যবিদ্যায় পরিবেশকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) জড় পরিবেশ, (খ) জৈব পরিবেশ।

(ক) **জড় পরিবেশ** (Physical environment): **জড় পরিবেশ মাটি, জল, বায়ু, তাপ ও আলো ইত্যাদি উপাদান দ্বারা গঠিত।** এই সকল জড় বস্তুর প্রভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের **বিস্তারণ** (distribution) ও জীবনযাত্রা পরিচালিত হয়। জড় বস্তুগুলির একক প্রভাব সজীব বস্তুতে অনুভূত হলেও এদের সম্মিলিত প্রভাবই প্রধান। যেমন, সূর্যালোকে যে তাপ বিকিরণ হয় তার ও বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ ঘটে এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় এবং জৈব পরিবেশকে উত্তপ্ত করে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণে সহায়তা করে।

(খ) **জৈব পরিবেশ** (Living environment): **জীব পরিবেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা গঠিত** এবং এই পরিবেশে একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং নির্ভরশীল। প্রাণীরা জীবিত অবস্থায় বেশীর ভাগ সময় পরস্পরের সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং সঙ্গীর

জন্য প্রতিযোগিতায় বা পরস্পরের স্বার্থে সহযোগিতা বা একে অপরের পক্ষে ক্ষতিকর সম্বন্ধ সৃষ্টি করে কাটায়।

সুতরাং জীব সম্প্রদায় এবং জড় পরিবেশের মধ্যে বিবিধ প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় পরিবেশ ও জীবের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হয়। জীবসম্প্রদায় এবং জড় পরিবেশের সম্পর্ককে ইকোসিস্টেম বা বাস্তব্যতন্ত্রের (eco-sys.em) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বিশাল আয়তনের পৃথিবীর সর্ব অংশে বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবসম্প্রদায় এবং জড় পরিবেশের সম্পর্কের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি ইকোসিস্টেম সর্বাঙ্গীণভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত এবং স্বঅস্তিত্বে বিরাজিত হয়। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ইকোসিস্টেম বর্ণনা করা যায়, যথা—কোন বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পরিবেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে যে প্রকার ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে তা আবার শ্রেণীকক্ষের পরিবেশে অন্য প্রকার হয়। আবার ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীর পরিবেশে যে প্রকার ইকোসিস্টেম গঠিত হয় তা বিদ্যালয়ের ইকোসিস্টেমের থেকে ভিন্ন প্রকার। কোন শহরের লোকজন গাড়ী, ঘোড়া, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা যে ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে তা আবার পল্লীগ্রামের ফাঁকা মাঠ, গাছপালা, বিভিন্ন প্রকার পশু, পক্ষী নদীনালার দ্বারা গঠিত ইকোসিস্টেম থেকে অন্য প্রকারের হয়। এইভাবে কোন নির্দিষ্ট গভীর জলাশয়ের জল, জলে দ্রবীভূত জৈব এবং অজৈব বস্তু, পোকামাকড়, বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ, শামুক এবং মাছ ইত্যাদির দ্বারা গঠিত ইকোসিস্টেম অন্য কোনও অগভীর জলাশয়ের ইকোসিস্টেম থেকে ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। পরিবেশ যেমন অকলুষিত বা সুস্থ হলে জীবজগতও সুস্থ ও স্বচ্ছন্দভাবে বাঁচতে পারে তেমনই প্রাণী ও উদ্ভিদ পরিবেশকে দূষিত ক'রে নিজেদের ধ্বংসের পথ সহজ করে। **ইকোসিস্টেম হচ্ছে এক প্রকার অবাধ বা সার্বভৌম একক যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্মেলনের ফলে এবং তাদের সঙ্গে জড় পরিবেশের সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয়।**

ইকোসিস্টেমের উপাদান ঃ প্রতিটি ইকোসিস্টেমের উপাদান যথাক্রমে—**জীবসম্প্রদায় এবং জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়।** (ক) **সজীব উপাদান ঃ** ইকোসিস্টেমে জীবসম্প্রদায় **উৎপাদক** (স্বভোজী উদ্ভিদ), **ভক্ষক** (পরভোজী উদ্ভিদ ও প্রাণী) এবং **পচনকারীদের** দ্বারা গঠিত। (খ) **জড় উপাদান ঃ** কোন ইকোসিস্টেমের জড় পরিবেশ তাদের ভৌত পরিবেশের বিভিন্ন মৌল পদার্থ ; যথা—জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং অন্যান্য উপাদান দ্বারা জৈব এবং অজৈব উপাদানে গঠিত হয়। জীবসম্প্রদায় এবং অজৈব পরিবেশ পরস্পর নির্ভরশীল এবং এদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী জাল বিস্তার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা ঃ যে-কোন ইকোসিস্টেমে জীবসম্প্রদায়

এবং তাদের চারপাশে জড় পরিবেশ থাকে। এই জীবসম্প্রদায়কে ইকোসিস্টেমের **সজীব উপাদান** এবং বাদ বাকী সকল বস্তুকে **জড় উপাদান** বলে।

(১) **জড় উপাদান ঃ** ভৌত পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা জড় উপাদান গঠিত এবং এই বস্তু সকল জৈব উপাদানের নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি যথাক্রমে বিভিন্ন অজৈব, জৈব এবং ভৌত বস্তুর দ্বারা গঠিত।

(ক) **অজৈব বস্তু ঃ** অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস এবং ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম-ঘটিত বিভিন্ন খনিজ লবণ এবং জল ও মাটির দ্বারা গঠিত।

(খ) **জৈব বস্তু ঃ** জৈব বস্তুগুলি বিভিন্ন মৃত জীবদেহের উৎপন্ন প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট এবং বিভিন্ন প্রকার বর্জ্যবস্তু ইত্যাদির দ্বারা গঠিত। এই সকল পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হিউমাসে অধিক পরিমাণ জৈব বস্তু বর্তমান। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাক জৈব বস্তুগুলিকে ভেঙে সরল অজৈব লবণে পরিণত করে। এই সকল সরল অজৈব লবণ সবুজ উদ্ভিদ মূলের দ্বারা শোষণ করে পুষ্টিক্রিয়া ঘটায়। বিভিন্ন প্রকার জৈব উপাদান ইকোসিস্টেমের সজীব ও জড় উপাদানের মধ্যে সংযোগ সাধনের কার্য করে।

(গ) **ভৌত উপাদান ঃ** বিভিন্ন পরিবেশে তাপ ও আলো সূর্যের দ্বারা সরবরাহ হয়। সূর্যের আলোর দ্বারা উদ্ভিদের সবুজ ক্লোরোফিল সক্রিয় হয়ে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া চালায় এবং বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি হতে গৃহীত জল দ্বারা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ায় **সৌর শক্তি খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে জীবনধারণে সাহায্য করে।**

(২) **সজীব উপাদান ঃ** ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদান হচ্ছে—জীবসম্প্রদায় এরা জীবনধারণ এবং বংশবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কার্যের জন্য খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন দ্বারা তার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত করে তা অন্যান্য যে সকল প্রাণী খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তার দ্বারা প্রাণীদের মধ্যে ঐ শক্তি বাহিত হয়। এইরূপে সৌরশক্তি স্বভোজী উদ্ভিদ থেকে অন্যান্য প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রকার স্থানান্তরকরণকে **শক্তির প্রবাহ** (Energy flow) বলে। সজীব উপাদান-গুলির মধ্যে যথাক্রমে—উৎপাদক, ভক্ষক এবং পচনকারী ইত্যাদির বর্ণনা করা হচ্ছে।

(ক) **উৎপাদক ঃ** (Producer) ঃ প্রকৃতিতে বিভিন্ন স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদই একমাত্র খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে অন্যান্য জীবকে সরবরাহ করে। এই সকল উদ্ভিদকে উৎপাদক বলে।

(খ) **ভক্ষক** (Consumer) ঃ পরভোজী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপন্ন খাদ্যগ্রহণের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বলে এদের জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ষক বলে। ভক্ষকদের মধ্যে যারা ঘাস ও শাকসব্জী ইত্যাদি খাদ্য খায় তাদের **শাকাশী**

বলে, যথা—গরু, ছাগল ইত্যাদি প্রাণী। যে সকল প্রাণী অন্যান্য প্রাণীকে খেয়ে জীবনধারণ করে তাদের **মাংসাশী** প্রাণী বলে; যথা—বাঘ, সিংহ, শেয়াল, হায়না ইত্যাদি। খাদ্যগ্রহণের পর্যায় অনুযায়ী ভক্ষক বিভিন্ন প্রকার। যথা—

প্রথম সারির ভক্ষক (Primary consumer)—এরা কেবলমাত্র উদ্ভিদখাদ্য গ্রহণ করে। উদাহরণঃ বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়, গরু, ছাগল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সারির ভক্ষক—এই প্রকার প্রাণী উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রথম সারির ভক্ষককে খাদ্যরূপে অথবা শুধুমাত্র প্রথম সারির ভক্ষককে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে; যথা—ছোট মাছ, ব্যাঙ, বিড়াল, কুকুর, সাপ, নেকড়ে ইত্যাদি।

সর্বোচ্চ ভক্ষক—এই সকল প্রাণী প্রথম বা দ্বিতীয় সারির ভক্ষকগুলিকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। যথা—বোয়াল মাছ, ভেটকি মাছ, কুমীর, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

(গ) **পচনকারী** (Decomposer): উৎপাদক বা ভক্ষকের মৃতদেহ বা বর্জ্যবস্তু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পচনকারী, যথা—ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক কর্তৃক পচনক্রিয়ার দ্বারা বিভাজিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয়। এইভাবে পচনক্রিয়ার দ্বারা মৃত জীবদেহে এবং বিভিন্ন বর্জ্যবস্তুগুলি নাইট্রোজেন এবং ফসফেটস্ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই সকল বস্তু সবুজ উদ্ভিদেরা পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করে। **এইভাবে পরিবেশ থেকে গৃহীত বস্তু পুনর্বার পরিবেশের মধ্যে মুক্তি পায় এবং জীবের প্রয়োজনে পুনর্বার ব্যবহৃত হয়।**

খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain): জীবজগৎ খাদ্য ব্যতীত বাঁচতে পারে না বলে বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে পারস্পরিক একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে খাদ্য বলতে সেই বস্তুকেই বুঝায় যার মধ্যের সঞ্চিত শক্তি জীব গ্রহণ করে দেহ গঠন ও পরিপোষণের বিভিন্ন উপাদান লাভ করে এবং শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করতে পারে।

বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষে মাটি থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে এবং সৌর-শক্তির দ্বারা খাদ্য উৎপন্ন করে। এইজন্য উদ্ভিদকে জীবজগতের **উৎপাদক** বলে। এইভাবে সৌরশক্তি খাদ্যের মধ্যে সুপ্ত শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। খাদ্যের সাথে উৎপাদক হতে জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভক্ষকের মধ্যে বাহিত হতে থাকে। উৎপাদক কর্তৃক উৎপন্ন খাদ্যবস্তু পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভক্ষকের মধ্যে বাহিত হওয়ার সময় **প্রতিক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ শক্তি তাপরূপে ক্ষয় হতে থাকে।** এইভাবে উৎপাদক হতে খাদ্য পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন ভক্ষকে বাহিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে খাদ্যানুযায়ী একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোন অঞ্চলের জীব সমষ্টিভুক্ত **বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে খাদ্য সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত সম্পর্ককে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।** সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রাণী উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে নিজের দেহে খাদ্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত সুপ্ত সৌরশক্তি লাভ করে ও অন্য কোন প্রাণীর দ্বারা

খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। ফলে খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত সৌরশক্তি এই দ্বিতীয় ভক্ষকের দেহে প্রবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সুন্দরবনের জীবসম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। সুন্দরবনে হরিণ ঘাস ও লতাপাতা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে আবার নিজেরা বাঘের খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদক জীব (উদ্ভিদ) শাকাশী প্রাণী (প্রথম সারির ভক্ষক) কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। যথা—গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদিকে **প্রাথমিক ভক্ষক** বা **প্রথম সারির ভক্ষক** বলে। পরে এই শাকাশী প্রাণীরা মাংসাশী প্রাণী, যথা—বাঘ কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয় বলে বাঘ **দ্বিতীয় সারির ভক্ষক**। প্রকৃতিতে তৃতীয় এবং চতুর্থ সারির ভক্ষক প্রাণীরাও আছে। তবে স্থলের জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহৎ শাকাশী প্রাণী থাকায় খাদ্য শৃঙ্খল ক্ষুদ্র হয় এবং এতে কেবলমাত্র দুটি বা তিনটি মধ্যবর্তী ভক্ষক থাকে, যথা—**শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলের খাদ্য শৃঙ্খল** যথাক্রমে **ঘাস—গরু, ছাগল—মানুষ** ; কিন্তু পশ্চিমবাংলার আর্দ্র অঞ্চলে খাদ্য শৃঙ্খল যথাক্রমে **ঘাস—ফড়িং-ব্যাঙ—সাপ** হয়। কিন্তু রাজস্থান অঞ্চলে **সাপ** আবার **ময়ূর** কর্তৃক গৃহীত হয়ে পাঁচটি পর্যায়ে সংযুক্ত হয়। **জলাশয়** বা **পুকুরের** খাদ্য শৃঙ্খল আবার অনেকগুলি পর্যায়ে সংযুক্ত। যথা—**শৈবাল**→ আদ্যপ্রাণী — **ক্ষুদ্র কীট** → **ক্ষুদ্র জলজ পতঙ্গ** → **বৃহৎ জলজ পতঙ্গ** — **ক্ষুদ্র মাছ** → **বৃহৎ মাছ** ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে হয়।

খাদ্য জাল (Food web) : একটি বিশেষ জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল থাকতে পারে। এই প্রকার বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন জীবসম্প্রদায় পরস্পর কোনো প্রজাতির দ্বারা সংযুক্ত থাকতে পারে যার মধ্যে কোন প্রজাতি বহু শৃঙ্খলেই মাধ্যমিক ভক্ষক হিসাবে কাজ করে। কোন অঞ্চলের এই প্রকার বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খল প্রজাতির দ্বারা সংযুক্ত হয়ে জালের মত হয় ; একেই **খাদ্য জাল** বলে।

শক্তির প্রবহণ (Energy flow) : সূর্যই সকল শক্তির উৎস এবং সূর্যালোক হতে প্রাপ্ত শক্তি ব্যতীত কোন জীব পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১১২) যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জড় পদার্থের মৌল বা যৌগিক উপাদানের সরবরাহ ও সূর্যালোকের মধ্যে নিহিত শক্তির মাধ্যমে জীবজগতের সকল প্রকার জৈবিক কার্য পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকার বিভিন্ন জড় উপাদান জীবের দেহ গঠনে এবং সৌরশক্তি জৈবিক কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করায় জীবজগৎ বেঁচে আছে। কিন্তু কেবলমাত্র জড় উপাদান দ্বারা যেমন জীব বাঁচতে পারে না সেরূপ সৌরশক্তির সরবরাহের দ্বারাও জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। কারণ জীবের দেহ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠনের জন্য যেমন শক্তি প্রয়োজন হয় সেরূপ দেহের বিভিন্ন জৈবিক কার্য পরিচালনার জন্যও শক্তির প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে—মোটর গাড়ীর বিভিন্ন যন্ত্রাংশাদি একত্রে যুক্ত করে মোটর গাড়ী তৈরী করলেই তাকে চালনো যায় না যদি না পেট্রোলকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা হয়। জীবজগতে স্বভোজী জীব—উদ্ভিদ তার ক্লোরোফিল দ্বারা সূর্যালোক ও জলের সাহায্যে যে শ্বেতসার বা অন্যান্য খাদ্য উৎপন্ন করে সে সময়—সৌরশক্তিকে রাসায়নিক

শক্তিরূপে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে পরভোজী জীব প্রধানত প্রাণীরা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য আহরণ করে এবং খাদ্যের মাধ্যমে সৌরশক্তি এক জীব থেকে অন্য জীবে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন জীব যথাক্রমে উৎপাদক, ভক্ষক এবং পচনকারী তাদের শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্যে সঞ্চিত সৌরশক্তিকে ATP (অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট) নামক রাসায়নিক যৌগ পরিবর্তিত করে। এর ফলে ATPতে সঞ্চিত শক্তি জীবের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রকার জৈবিক ক্রিয়া পরিচালিত করে। এই প্রকার ATP উৎপাদন এবং জীবের বিভিন্ন প্রকার জৈবিক কার্যে ATP'র ব্যবহারে কিছু পরিমাণ শক্তি তাপরূপে নির্গত হয়ে নষ্ট হয়। আবার সকল প্রকার জৈবিক কার্যেও সৌরশক্তি জীবদেহ থেকে তাপরূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সকল প্রকার জীবে শক্তি ব্যয়িত হওয়ার পর তা পূরণের নিমিত্ত ব্যবস্থা আছে। কারণ সবুজ উদ্ভিদেরা সর্বদা সৌরশক্তি খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে এই শক্তিকে ধারাবাহিকভাবে ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন পর্যায়ের জীবে সরবরাহের দ্বারা প্রবাহিত করে। এইভাবে উদ্ভিদ থেকে সৌরশক্তি পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন জীবে প্রবাহিত করে এবং অবশেষে তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়ে শক্তিপ্রবাহের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখে। এই প্রকার শক্তির একদিকে (সৌরশক্তি—উৎপাদক→ভক্ষক পচনকারী → তাপ শক্তি) প্রবাহকে **শক্তির প্রবহণ** বলে।

খাদ্যস্তর বা **ট্রফিক লেভেল** (Trophic level): কোনো **বাস্তুতন্ত্রের** (Ecosystem) মধ্যে উৎপাদক এবং ভক্ষকের পারস্পরিক বিন্যাস বা খাদ্যের গঠন-প্রণালীকে **ট্রফিক গঠন** (Trophic structure) এবং প্রতি খাদ্য ঘনত্ব অনুযায়ী যে স্তর সৃষ্টি হয় তাকে খাদ্যস্তর বা **ট্রফিক লেভেল** (Trophic level) বলে। উদাহরণ—খাদ্য শৃঙ্খলের সবুজ উদ্ভিদ প্রথম, শাকাশী প্রাণী দ্বিতীয় এবং মাংসাশী প্রাণী ইত্যাদি তৃতীয় খাদ্যস্তর বা ট্রফিক লেবেল। বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলের মধ্যে জীব বস্তুর ওজনের পরিমাণ অথবা বিভিন্ন প্রকার জীব, যথা—উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংখ্যাকে **নির্ধারিত ফসল** (standing crop) বলে। নির্ধারিত ফসলকে প্রতি একক অঞ্চলে সংখ্যা অথবা পরিমাণে প্রকাশ করা যায়। এই প্রকার জীব বস্তুর পরিমাণকে **বায়োমাস** (biomass) বলে। বায়োমাস মাপতে উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবিত অবস্থায় ওজন, শুষ্ক অবস্থায় ওজন, কার্বনের পরিমাণের ওজন বা তাপশক্তি নির্ধারণের দ্বারা করা যায়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইকোসিস্টেম: বিভিন্ন প্রকার ইকোসিস্টেমের মধ্যে পুকুরের ইকোসিস্টেম অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সমুদ্র বা মরুভূমির ইকোসিস্টেম অত্যন্ত বৃহৎ হবে। চিরতুষারে আবৃত মেরু অঞ্চল ও পর্বতের সুউচ্চ চূড়া ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই জীব বাস করে। প্রকৃতিতে কোন বৃহৎ অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস্তুতান্ত্রিক দল গঠনকে **বায়োম** (biome) বলে।

বিভিন্ন প্রকার বায়োম: (১) সামুদ্রিক—সমুদ্রতীর, সমুদ্র এবং নদীর মোহানা ইত্যাদি। (২) স্বাদু জল—পুকুর, ডোবা, হ্রদ ও নদী। (৩) বনাঞ্চল—গ্রীষ্মমণ্ডল,

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং টাইগা (জলাভূমির পাইন গাছের বন)। (৪) তৃণভূমি—নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল, গ্রীষ্মমণ্ডল, মরুভূমি এবং তুন্দ্রা অঞ্চলে (তুষারাবৃত মেরু প্রান্তর) ইত্যাদি। বায়োমের প্রকৃতি এবং বিস্তার বৃষ্টিপাতের বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের, মাটির এবং প্রাকৃতিক বাধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কয়েকটি ইকোসিস্টেমের (বাস্তুতন্ত্রের) বর্ণনা ঃ ইকোসিস্টেম প্রধানত দুটি—একটি জলের ও অন্যটি স্থলের। স্থলের মধ্যে আবার বনভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদি আছে।
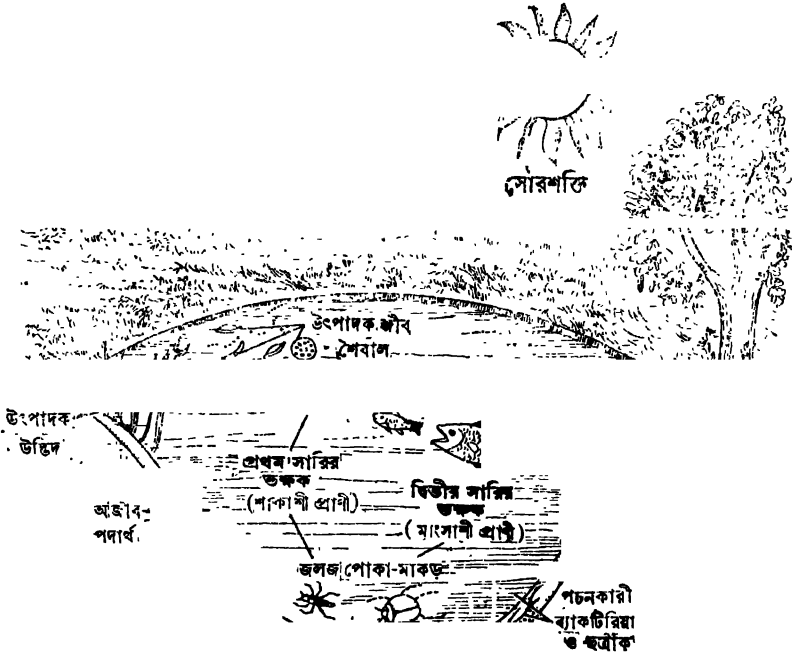
৫৬নং চিত্র ॥ জলাশয়ের ইকোসিস্টেমের দৃশ্য।

জলের ইকোসিস্টেম—একটি জলাশয়ের বর্ণনা ঃ একটি পুকুরে বা জলাশয়ে বিভিন্ন প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদ যেমন থাকে সেইরূপ অপেক্ষাকৃত বড় উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জলাশয়ের জলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। বিভিন্ন উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষে খাদ্য উৎপাদন করে বলে এদের উৎপাদক বলা হয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ এই খাদ্য গ্রহণ করে; এদের প্রথম সারির ভক্ষক বলা হয়। এই সকল কীট-পতঙ্গকে ছোট ছোট মাছ এবং ব্যাঙ খায় বলে এদের দ্বিতীয় সারির ভক্ষক বলে। ছোট ছোট মাছকে

আবার বড় বড় মাছ, বক এবং মাছরাঙা ইত্যাদি খায় বলে এদের তৃতীয় সারির ভক্ষক বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্যের ফলে পরিত্যক্ত CO_2 উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষে গ্রহণ করে এবং পরিবর্তে O_2 ত্যাগ করে। জীবেরা ঐ O_2 শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে। অবশেষে প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু হলে জলাশয়ের মধ্যে বিভিন্ন পচনকারী জীব ঐ মৃতদেহে পচনক্রিয়ার মাধ্যমে অজৈব বস্তুর মুক্তি ঘটায়।

স্থলের ইকোসিস্টেম (তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রের ইকোসিস্টেম): এই প্রকার পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদনকারী তৃণ, ঘাস ও ছোট ছোট উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে—এজন্য এদের উৎপাদক বলে। বিভিন্ন প্রকার কীট-পতঙ্গ, ছাগল, গরু, খরগোস, এমন কি মানুষ শস্য ও শাকসব্জী খায় বলে এদের প্রথম সারির ভক্ষক বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পতঙ্গ, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি এবং ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিকে মানুষ খায় বলে এদের দ্বিতীয় সারির ভক্ষক বলে। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদিকে আবার মাংসাশী পাখীরা খায় বলে এরা তৃতীয় সারির ভক্ষক। মৃত্যুর পর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচনকারী জীব (ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা) দ্বারা জৈব থেকে অজৈব পদার্থে পরিণত হয় এবং প্রকৃতিতে অবস্থান করে। এই সকল অজৈব বস্তুকে উদ্ভিদ পুনরায় তাদের খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করে।

সংরক্ষণ (Conservation)

অন্যান্য জীবের মত মানুষ প্রকৃতির সন্তান এবং জীবজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। মানুষ যে কেবলমাত্র তার নিজের পরিবেশের পরিবর্তন করতে পারে শুধু তাই নয় সে অন্যান্য জীবের (প্রাণী ও উদ্ভিদের) পরিবেশের উন্নতি করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। মানুষ তার নিজের সুবিধের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর যথেচ্ছ পরিবর্তন ও ধ্বংসসাধন করে জীবজগতের প্রভূত ক্ষতি করে। কয়েক শতাব্দী ধরে সাময়িক লাভের আশায় এবং অবহেলার ফলে ধীরে ধীরে যে পরিমাণ অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়েছে তার ফলে বর্তমানে খাদ্যাভাব, বন্যা, খরা, মরুভূমির প্রসার এবং সংক্রামক রোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য এই সকল সমস্যা জাতীয় ভিত্তিতে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। তবে এই সকল সমস্যা অনেকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবপ্রসূত। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে অফুরন্ত বলে মনে করেছে। সেইজন্য যথেচ্ছ বনসম্পদ কেটে চাষ-আবাদ বাড়িয়ে এবং জীবজন্তু খাদ্য হিসেবে হত্যা করে বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণীর পরিমাণ সীমিত করেছে। বর্তমানে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, এইভাবে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে তার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে পৃথিবীর **বাস্তব্যবিদ্যাবিদেরা** (ecologists) এই সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার কথা বলেছেন। **কনজারভেশান্** (conservation) কথাটির প্রকৃত অর্থ **'বাঁচানো'** (save)। বাস্তব্যবিদ্যাবিদ্ জে. ডি. ব্ল্যাক সংরক্ষণ বিষয়ে বলেন

যে, প্রাকৃতিক সম্পদকে এরূপ বিচক্ষণতা ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে তা অধিক সংখ্যক জীবের দীর্ঘ সময়ের জন্য সর্বাপেক্ষা মঙ্গল করতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে বৃহত্তর মানবসমাজের স্বার্থে **সংরক্ষণের মূলনীতিগুলিকে** চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পুনর্নবীকরণযোগ্য বা অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, (২) সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু পূর্বঅনুষ্ঠিত ভুলের প্রতিকার, (৩) অত্যধিক জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এবং (৪) পরিবেশ দূষিতকরণ বন্ধ করা।

(১) পুনর্নবীকরণযোগ্য বা অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ঃ মানুষের যথেচ্ছ বনসম্পদ কাটা এবং গৃহপালিত পশুচারণের জন্য প্রকৃতির বহু নিভৃত বনাঞ্চল ঊষর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা বনসম্পদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সঙ্গে পরিবেশ দূষিতকরণ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বনের মধ্যে যে পরিমাণ গাছ উৎপন্ন হচ্ছে তার চেয়ে অধিক গাছ যাতে কাটা না হয় তা বন্ধ করা হয়েছে। যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ অপূরণীয় তাদের সুষ্ঠু ব্যবহারও প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খনি থেকে কয়লা বা খনিজ তৈল উত্তোলন করার পর জ্বালানীরূপে ব্যবহার করলে তা আর পূরণ করা যায় না, কয়েক প্রকার ধাতুও এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বিভিন্ন অপূরণীয় বস্তু নিঃশেষিত হচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে পুনর্নবীকরণ অযোগ্য বিভিন্ন বস্তুর যথাসম্ভব কম ব্যবহার এবং এই বস্তুগুলির অপচয় বন্ধ করা উচিত।

(২) সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু পূর্বঅনুষ্ঠিত ভুলের প্রতিকার ঃ মাটি, জল, বন ও বন্যপ্রাণী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় তাদের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যথেচ্ছ ধ্বংস বা হত্যা বন্ধ করা উচিত।

প্রাকৃতিক সম্পদ—মাটি ঃ মাটি ভৌত ও জীববস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্ট একপ্রকার জটিল যৌগ। ইহা উদ্ভিদের মূলকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং পুষ্টিসাধক বস্তু সরবরাহ করে। মাটিতে বারংবার এক প্রকারের চাষ-আবাদের ফলে তার উর্বরা শক্তির ক্ষয় হয়। যথা, একই জমিতে বারংবার ধান বা গম চাষের ফলে সে জমি ক্রমশ অনুর্বরা হয়। জমিতে উদ্ভিদ না থাকলে জল, বৃষ্টি এবং বায়ুপ্রবাহ ক্রমাগত মাটির উপরের স্তরকে সরিয়ে দেওয়ায় ভূমির প্রভূত ক্ষয় হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং শহর ও কলকারখানার প্রসার ঘটলে জমি ক্রমশ উদ্ভিদশূন্য হওয়ায় ভূমিক্ষয় ঘটে। চাষীরা জমিকে বহুবার চাষ করলে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে জমির উপরের স্তরে সর গিয়ে ভূমিক্ষয় হয়।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ ঃ মৃত্তিকা সংরক্ষণ জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দুভাবে করা যায়, যথা—(১) পর্যায়ক্রমিক চাষ-আবাদ দ্বারা এবং (২) বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ করে উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা। শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ করলে তাদের

মূলে মূলজ অর্বুদ-সৃষ্টিকারী রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ দ্বারা জমির নাইট্রোজেনের অভাব মিটায়, আবার বিভিন্ন প্রকার অজৈব এবং জৈব সার প্রয়োগ দ্বারাও মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে।

মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু জলসেচের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে মাটির উপরের স্তর ধুয়ে যেতে না পারে, উদ্ভিদশূন্য মাটিতে নিবিড় চাষ-আবাদের দ্বারা এবং গাছ লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়; কারণ গাছের মূল মাটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। বহুস্থানে ঘাস লাগিয়েও মাটির উপরের স্তরের ক্ষয় রোধ করা যায়। রাজস্থানে অধিক বায়ুপ্রবাহযুক্ত অঞ্চলে এভাবে গাছ লাগিয়ে মরুভূমির প্রসার রোধ এবং দেশের সর্বত্র বৃক্ষাদির ধ্বংস রোধ করার সাথে সাথে বনমহোৎসব অনুষ্ঠান করে গাছ লাগানোর বিজ্ঞানসম্মত পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জল সংরক্ষণ: জলই জীবের জীবন। জল ব্যতীত কোনও জীব বাঁচতে পারে না। জলাভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হয়। এজন্য বর্তমানে জল সংরক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জল সংরক্ষণের প্রাথমিক উপায় হচ্ছে বৃষ্টিধারার জলকে নদী বা সমুদ্রে প্রবাহিত হতে না দিয়ে সেই অঞ্চলে যতটা সম্ভব জমিয়ে রাখা। বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে জল সঞ্চয়ের প্রয়োজন অত্যধিক। এজন্য পর্বতের ঢালে বৃক্ষ রোপণ করা উচিত, কারণ উদ্ভিদ মূলের দ্বারা মাটিকে আঁকড়ে ধরে রেখে জল আটকিয়ে রাখার সাহায্য করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্বতের ঢালুতে বাঁধ বেঁধে জল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সঞ্চিত জল থেকে সমতলভূমিতে এবং নদীতে ক্রমাগত জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পর্বতের ঢালে গাছপালা না জন্মালে ভূমিক্ষয় হয়ে বাঁধের নিকটের ঢালে পলিরূপে সঞ্চিত হয়ে বাঁধের কার্যকারিতা হ্রাস করে।

কলকারখানার বর্জ্যবস্তু এবং শহরের পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল নদীতে পড়লে জল দূষিত হয়ে নদীতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীদের এবং নদীর জল ব্যবহারকারী মানুষের ক্ষতি করে। বর্তমানে বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠান পয়ঃপ্রণালীর ময়লা পচিয়ে কেবলমাত্র ময়লাবিহীন থিতান জলকে নদীতে ত্যাগ করে এবং থিতিয়ে পড়া ময়লাকে শুকনো করে উদ্ভিদের সার হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছে। একইভাবে কলকারখানার বিভিন্ন বর্জ্যবস্তুও পরিস্রাবণের পর নদীতে পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বনসংরক্ষণ: বনসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর যে-কোনও অঞ্চলের তা আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে দেশের তিন ভাগের এক ভাগ অঞ্চলে বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বনভূমি থাকায় সেই অঞ্চলের আবহাওয়াকে জীববাসের অনুকূল করে, বৃষ্টিপাত ঘটায়, মাটির নিচে মূলপ্রসারিত করে ভূমিক্ষয় নিবারণ ও মাটির মধ্যে জল সঞ্চয়ে সাহায্য করে। জল সঞ্চয়ের ফলে মাটি সরস থাকে, বন্যা হয় না, শিল্পের এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনে কাঁচা মাল সরবরাহ করে। ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলের প্রায় ২০—২৩ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলের প্রায়, ১৩ ভাগ হচ্ছে বনাঞ্চল। মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পপ্রসার হওয়ায় বনজঙ্গলের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বন-

সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষছেদনের হার নিয়ন্ত্রণ এবং দাবানল (বনের শুকনো গাছে আগুন ধরা) বন্ধ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। শুধু তাই নয় উদ্ভিদ ধ্বংসকারী রোগবিস্তারকারী বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও কীটপতঙ্গের বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নূতন নূতন গাছ লাগিয়ে বনসংরক্ষণ করা যায়। এই সঙ্গে বনসংরক্ষণের জন্য ভারতীয় বন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষণা করে সেই বনে গাছকাটা, ফুল, ফল সংগ্রহ করা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ : বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে এবং মানুষের খেয়াল ও হঠকারিতায় পৃথিবীর বহু প্রাণী অবলুপ্ত হয়েছে। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় তিন শতকের অধিক বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, বন্য গাধা, ফেকাসে লাল বর্ণের মস্তকযুক্ত পাতিহাঁস এবং আরও অনেক প্রাণী ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। অবলুপ্ত রোধ করার জন্য ভারত সরকার এই সকল প্রাণীকে **সংরক্ষিত প্রাণী** হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এদের হত্যা আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাণীদের রক্ষার জন্য সংরক্ষিত বন ও জাতীয় উদ্যান নির্দিষ্ট করেছেন যাতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী সেখানে নিরাপদে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এই সব প্রাণীর জন্য সংরক্ষিত বনকে **অভয়ারণ্য** বলে।

পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন ও জলদাপাড়া, বিহারের হাজারিবাগ ও পালামৌ এবং আসামের কাজিরঙ্গা ও মানস ইত্যাদি অভয়ারণ্য যথাক্রমে, বাঘ, গণ্ডার এবং হাতী ইত্যাদি এবং গুজরাটের গির অরণ্য সিংহের জন্য সংরক্ষিত। সুন্দরবনে গোসাবার অন্তর্গত পাখিরালয়ে বৎসরের বিশেষ একটি সময়ে বহু পাখী আসে। বাঘ রক্ষার জন্য বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের **ব্যাঘ্র প্রকল্প কর্মসূচী** গৃহীত হয়েছে। উপরি-উক্ত অভয়ারণ্য ব্যতীত উত্তরপ্রদেশের নৈনিতালে 'জিম্ করবেট পার্ক' নামক অভয়ারণ্য সুবিখ্যাত।

ব্যাঘ্র সংরক্ষণ : বাঘ হচ্ছে প্রকৃতির এক টি সুন্দর সৃষ্টি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঘ দেখা যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের বাঘের সৌন্দর্য, শক্তি ও বিভীষিকার জন্য প্রসিদ্ধ। এদের 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' (Royal Bengal Tiger) বলে। পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঘ দেখা যেত এবং সেই সময় এদের সংখ্যাও অধিক ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে জনসংখ্যার চাপে বনভূমি কেটে চাষ আবাদের প্রয়োজনে বাঘের আশ্রয়স্থলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বনের মধ্যে বাঘের খাদ্য বিভিন্ন প্রকার হরিণ ও শূকর ইত্যাদি ক্রমশ কমতে থাকায় বাঘের খাদ্যের অভাবও ঘটেছে। স্বাধীনতা পূর্বোত্তর কালে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যথেচ্ছ বাঘ শিকার করার জন্য বাঘের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায়। পরবর্তী কালে বিদেশে উচ্চমূল্যে বাঘের চামড়া বিক্রীর জন্য এবং বিভিন্ন সারকাস এবং চিড়িয়াখানায় শিশু বাঘ সরবরাহের জন্য লোভী ব্যবসায়ীদের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতেও অনেক বাঘ মারা যায়। এইভাবে বাঘের সংখ্যা এমন কমে যায় যে এক সময় মনে হয়েছিল বাঘ বুঝি ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

বাঘকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থা বিশেষ প্রকার 'ব্যাঘ্র প্রকল্পের' পরিকল্পনা করেছেন। এই প্রকার ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য তাঁরা বহু টাকা সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এই সঙ্গে নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের বিভিন্ন অঞ্চলে অভয়ারণ্যের সৃষ্টি ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থার সহযোগিতায় ভারত সরকারও ব্যাঘ্র সংরক্ষণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট নয়টি অভয়ারণ্যে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। এই সকল অভয়ারণ্য যথাক্রমে—সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ). পালামৌ (বিহার), সিমলিপাল (উড়িষ্যা), মানস (আসাম), করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উঃ প্রদেশ), কানহা (মধ্যপ্রদেশ), বন্দিপুর (কর্ণাটক), মেলঘাট (মহারাষ্ট্র) এবং রণথম্বোর (রাজস্থান) ইত্যাদি।

ব্যাঘ্র প্রকল্পের কার্যসূচী : ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত **অভয়ারণ্যগুলিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল** ঘোষণা করে প্রাণিহত্যা ও গাছপালা কাটা বন্ধ করা হয়েছে। প্রভূত পরিমাণে রক্ষী নিয়োগ করে **চোরা শিকারীদের বেআইনীভাবে বনে প্রবেশ ও শিকারের সংখ্যা হ্রাস** করা হয়েছে। এই সঙ্গে বাঘের বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণী যথাক্রমে শূকর, হরিণ ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সকল বিভিন্ন কার্যকরী প্রচেষ্টার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানা গেছে।

(৩) **অত্যধিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** গত ৩০ বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং এই হার ক্রমাগত বাড়ছে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হবে এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে। এইজন্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানুষের সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ও ভারতে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।

(৪) **পরিবেশ দূষিতকরণ বন্ধ করা :** সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে পরিবেশ দূষিত-করণের সম্পর্ক আছে। এজন্য প্রত্যেক জীবন-বিজ্ঞানের ছাত্রের এ বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকা উচিত। কলকারখানার ধোঁয়া, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বস্তু প্রভৃতি জল, বাতাস ও মাটিকে বিষাক্ত করছে। কৃষিকার্যে নানাপ্রকার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করার বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বস্তু প্রাণী ও মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারে উপকারী পতঙ্গ যা দ্বারা উদ্ভিদের পরাগ সংযোগ ঘটে তারাও ক্ষতিকারক পতঙ্গের সাথে মারা যায়। এর ফলে পরাগ সংযোগ না হওয়ায় ফসল উৎপন্নের পরিমাণ কম হচ্ছে। যথেচ্ছ বন কেটে বড় বড় গাছ নষ্ট করার জন্য সেইস্থানে যে সকল পাখী ও অন্যান্য প্রাণী বাস করে তারা অন্যত্র বাসস্থানের জন্য চলে যায়। গাছ ধ্বংস করার জন্য মাটিতে জল ধরে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হওয়ায় ভূমিক্ষয় এবং তার জন্য নদীর তল ভরাট হওয়ায় ঘন ঘন বন্যা হয়। কলকারখানার বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, নদী ও জলাশয়ে মুক্ত করার জন্য ঐ জল মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয় এবং মাছ ও অন্যান্য প্রাণী মারা যায়। এজন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা ও গবেষণার দ্বারা পরিবেশ দূষিতকরণ দ্রুত বন্ধ করা উচিত না হলে জীবজগৎ বিপদগ্রস্ত হবে।

ব্যবহারিক কার্য

(Practical Work)

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন পরিত্যাগ করে তার প্রদর্শন : (শিক্ষকমহাশয় এই পরিক্ষাটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রদর্শন করবেন।)

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন : কিছু জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা), জল, সামান্য সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, বীকার, ফানেল, টেস্ট টিউব, দিয়াশলাই ইত্যাদি।

পরীক্ষা : একটি বীকারে জল ও জলের মধ্যে কিছু পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ (হাইড্রিলা) রাখা হ'ল। জলজ উদ্ভিদগুলির কাণ্ডের কাটা দিকটি উপরের দিকে ক'রে একটি উপুড় করা কাচের ফানেলের মধ্যে ঢাকা অবস্থায় জলের মধ্যে রাখা হ'ল। জলে অল্প পরিমাণে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট মিশাতে হবে, এর দ্বারা জলে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত হয়ে পরীক্ষার সুবিধা হবে। এবার একটি জলপূর্ণ টেস্ট টিউব ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উপুড় করে রাখতে হবে যাতে বাতাস টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এই অবস্থায় বীকারটি সূর্যালোকে রাখা হ'ল।
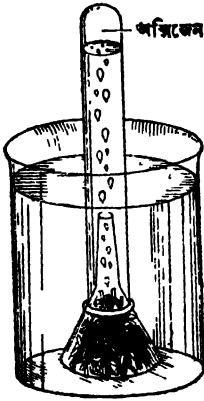
৫৭নং চিত্র ।। সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে—পরীক্ষার দৃশ্য।

নিরীক্ষা : সূর্যালোকে বীকারটি রাখবার কিছুক্ষণ পরে জলজ উদ্ভিদের কাটা কাণ্ডগুলি থেকে বুদ্‌বুদ্ বের হয়ে ফানেলের নলের মধ্য দিয়ে টেস্ট টিউবের মধ্যে যাচ্ছে দেখা যাবে। যত বুদ্‌বুদ জমবে ততই টেস্ট টিউবের উপুড় করা উপরের অংশের জল নিচের দিকে নামতে থাকবে। অবশেষে টেস্ট টিউবের অধিকাংশ স্থান গ্যাসে ভর্তি হ'লে বুড়ো আঙুলের সাহায্যে টেস্ট টিউবের মুখ চেপে ধরে জলের বাইরে এনে তার মধ্যে জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি প্রবেশ করান মাত্র দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

সিদ্ধান্ত : সালোকসংশ্লেষে যে গ্যাসটি নির্গত হয়েছে তা অক্সিজেন, কারণ **জ্বলন্ত কাঠি একমাত্র অক্সিজেনের সংস্পর্শে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। সুতরাং এই পরীক্ষায় প্রমাণ** হচ্ছে যে, **সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হয়।**

ব্যবহারিক (Practical) জীবন বিজ্ঞান ঃ প্রতি ছাত্র-ছাত্রী নিজে হাতে কলমে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি পরীক্ষাগারে অনুশীলন করবে ঃ

(১) চূণজলের মধ্যে শ্বাসকর্মের সময় নির্গত নিশ্বাস বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা বুদ্‌বুদ উৎপন্ন করার পরীক্ষা ঃ

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ আমরা জানি যে, বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ০.০৩% এবং অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ২০.৯%। আমরা শ্বাসকর্মের সময় প্রশ্বাসে বায়ু গ্রহণ ক'রে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা কোষীয় শ্বসন করি। কোষীয় শ্বসনে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তা আমরা নিঃশ্বাসের সময় বহিষ্কার করি। নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ৩.৯%। আমাদের নিঃশ্বাস বায়ুতে যে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বহিষ্কৃত হয় তা একটি পরীক্ষার মধ্যমে প্রমাণ করা যায়। নিম্নে একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি দেখান হচ্ছে।

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ঃ একটি কাচের টেস্ট টিউব, এক পাত্র স্বচ্ছ চূণজল এবং একটি ২০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ কাচের নল।

পরীক্ষা ঃ ষ্টেট টিউবটির অর্ধেকের উপর স্বচ্ছ চূণের জলে ভর। পরে কাচের নলটি টেস্ট টিউবের চূণের জলের মধ্যে ডুবিয়ে এবং কাচের নলের অপর অংশটি মুখের মধ্যে গ্রহণ করে আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে থাক। এইভাবে কয়েক বার ফুঁ দাও।

নিরীক্ষা ঃ চূণের জলের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ু বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করবে এবং ধীরে ধীরে স্বচ্ছ চূণের জল ঘোলা হতে থাকবে।

৫৮নং চিত্র ॥ (ক) টেস্ট টিউবের মধ্যে স্বচ্ছ চুণজল (খ) চুণজলের মধ্যে নিশ্বাস ত্যাগের ফলে ঘোলা হওয়ার দৃশ্য।

সিদ্ধান্ত ঃ স্বচ্ছ চূণের জল ঘোলা হওয়ার কারণ হচ্ছে নিঃশ্বাস বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড চূণজল যাকে রাসায়নিক গঠনে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)$] বলে তার সঙ্গে বিক্রিয়া দ্বার ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) নামক যৌগের সৃষ্টি করে। ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট

অধঃক্ষেপরূপে (precipitate) জলের মধ্যে সঞ্চিত হওয়ায় স্বচ্ছ চূণজলকে ঘোলা দেখায়।

(২) কুনো ব্যাঙের সাধারণ আন্তর যন্ত্র এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ প্রণালী ঃ

ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি বড (দৈর্ঘ্যে ৩০ সেণ্টিমিটার এবং প্রস্থে ২০ সেণ্টিমিটার) প্রান্ত তোলা টিন বা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে। ট্রের মধ্যে মোম গলিয়ে প্রায় ২½ সেণ্টিমিটার পুরু করে ঢালতে হবে। কারণ পিনের সাহায্যে ব্যাঙকে আটকিয়ে না রাখলে ব্যবচ্ছেদের অসুবিধা হবে। কয়েকটি আলপিন, ধারালো ছুরি, কাঁচি (একটি বড় এবং একটি ছোট), চিমটা (একটি বড এবং একটি ছোট), একটি বাঁকানো লম্বা সূচ এবং একটি সোজা বড সূচ। একটি কাচের জার, একটু ক্লোরোফর্ম্, জল, কাগজ, পেন্সিল ও ছবি আঁকার জন্যে সাদা খাতা।

ব্যবচ্ছেদ প্রণালী ঃ সজ্ঞান অবস্থায় ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদ করা অসুবিধাজনক, কারণ ব্যবচ্ছেদের সময় প্রাণীটি অত্যন্ত নড়াচড়া করবে। এজন্য ব্যাঙকে প্রথমে অজ্ঞান করে তবেই ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। একটি কাচের জারে কয়েকটি কুনো ব্যাঙ রেখে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফরম দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলে ব্যাঙগুলি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কুনো ব্যাঙকে ক্লোরোফর্মের দ্বারা অজ্ঞান করার পরে মোমভর্তি ট্রেতে ব্যাঙটিকে চিৎ করে চারটি পায়ে পিন দিয়ে মোমের সাথে যুক্ত করতে হবে। ব্যাঙ মেরুদণ্ডী, উচ্চর শ্রেণীর প্রাণী এবং এদের পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড এবং পরের পর স্নায়ু, রক্ত সংবহন ও শেষে পৌষ্টিকতন্ত্র থাকায় পৃষ্ঠদেশ বরাবর ব্যবচ্ছেদের অসুবিধা হয়। এজন্য অংকদেশ থেকে ব্যবচ্ছেদ করলে পৌষ্টিকতন্ত্র সহজেই দেখা যাবে। চিৎ করে আটকানো ব্যাঙের অংকদেশের মধ্যরেখা বরাবর বড় কাঁচির ভোঁতা দিকের সাহায্যে সম্মুখের মুখ ও পশ্চাতের পায়ু পর্যন্ত এবং বাঁকিয়ে অগ্র ও পশ্চাদপদের চামড়া কাটতে হবে। পরে চামড়াকে দেহের পেশী থেকে কাঁচি ও চিমটার সাহায্যে ছাড়িয়ে পিন দিয়ে মোমে আটকাতে হবে। এবার একইভাবে কাঁচি দিয়ে পেশীকে চিরে দেহগহবর উন্মুক্ত করতে হবে। পেশীর উভয় দিক পিনের সাহায্যে মোমের সাথে যুক্ত করতে হবে।

(ক) কুনো ব্যাঙের সাধারণ আন্তর যন্ত্রগুলির কোন্‌টি কোন্ যন্ত্র এবং কোথায় অবস্থিত তার নির্ণয় করা ঃ দেহগহবর উন্মুক্ত করার পর প্রথমেই একটি পাতলা আবরণীতে ঢাকা সংকোচন ও প্রসারশীল **হৃৎপিণ্ড** দেখা যাবে। হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্বে বাদামী রঙের দুটি **যকৃতখণ্ড** আছে। যকৃৎখণ্ড দুটির সংযুক্ত অঞ্চলে সবুজ রঙের **পিত্তথলি** এবং পিত্তথলির নালিকার সঙ্গে যুক্ত হলদে রঙের **অগ্ন্যাশয়** দেখা যাবে। যকৃতের উভয় খণ্ডগুলির তলায় একটি ক'রে মোট দুটি গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মত **ফুসফুস** আছে। মুখছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি কাঠি ঢুকিয়ে দিলে পর্যায়ক্রমে **গ্রাসনালী ও পাকস্থলী** দেখা যাবে। পাকস্থলীর পরবর্তী সরু নলাকার অংশকে **ক্ষুদ্রান্ত্র** এবং দেহের পশ্চাৎ

অঞ্চলে প্রসারিত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে, ক্ষুদ্রান্ত্রের যে অংশে অগ্ন্যাশয় যুক্ত থাকে সেই অংশকে **ডুয়োডিনাম** বা **গ্রহণী** বলে। বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশকে **মলাশয়** বা রেকটাম এবং

৫৯নং চিত্র ॥ কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন আন্তর যন্ত্রের দৃশ্য।

পরবর্তী অংশকে **ক্লোয়েকা** বা **অবসারণী** বলে। সমগ্র পৌষ্টিকতন্ত্র দেহগহ্বরের সঙ্গে পাতলা ধারণ-ঝিল্লি বা **মেসেণ্ট্রি** (mesentry) দ্বারা যুক্ত থাকে। পৌষ্টিকনালীর ধারণ-ঝিল্লির সঙ্গে একটি ছোট গাঢ় লাল রঙের **প্লীহা** যুক্ত থাকে। পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র একটু অপসারিত করলে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুটি লাল রঙের **বৃক্ক** (kidney) এবং বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত আঙুলের আকারের হলদে রঙের বহু ফ্যাট-বডিস্ দেখা যায়। **পুরুষ ব্যাঙের** প্রতি বৃক্কের মধ্যভাগে যুক্ত একটি করে মোট দুটি লম্বাটে ধরনের হলদে রঙের **শুক্রাশয়** (testis) এবং অগ্রবর্তী অঞ্চলে একটি করে গোলাকার বাদামী রঙের **বিডার্স অরগ্যান** যুক্ত থাকে। স্ত্রী-ব্যাঙের বৃক্কের উভয়

পার্শ্বে ধূসর বর্ণের বহু ভাঁজযুক্ত **ডিম্বাশয়** বা **ওভারি** এবং ডিম্ব বহন করার **কুণ্ডলী** পাকানো **ডিম্বনালী** দেখা যায় এবং ডিম্বনালীর স্ফীতাকার অংশকে **ইউটেরাস** বলে। বৃক্কের পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে একটি ক'রে মোট দুটি মূত্রনালী উৎপন্ন হয় এবং ক্লোএকার সঙ্গে যুক্ত মূত্র সঞ্চিত হওয়ার জন্য **মূত্রথলি** থাকে।

(খ) **পৌষ্টিকতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ প্রণালী ঃ** দেহগহ্বরের অভ্যন্তরে পাকানো পৌষ্টিক-নালী পাতলা মেসেনটারী পর্দার সাথে সংলগ্ন থাকে। এই পর্দা কেটে ক্ষুদ্রান্ত্র

৬০নং চিত্র ॥ কুনোব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ এবং বিভিন্ন অংশে পিনফ্ল্যাগিং-এর দৃশ্য।

ও বৃহদন্ত্র সরল করতে হবে। এবার ক্ষুদ্রান্ত্রের সামনের দিকে U-আকারের ডুয়োডিনাম অঞ্চলে পিত্তনালীর সংযুক্তি অঞ্চল ঠিকভাবে রেখে পাকস্থলীটি বের ক'রে গ্রাসনালী পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে। পৌষ্টিকনালী পশ্চাৎ অঞ্চলে রেকটাম বা মলাশয় ও অবসারণী হয়ে অবসারণী ছিদ্র দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। একটি পিন

বাইরের দিক থেকে অবসারণী ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেহগহ্বরের ভেতর থেকে বড় কাঁচির ভোঁতা অংশটি পেলভিক অস্থির সংযুক্ত অঞ্চলের (শ্রোণীচক্র) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে চাপ দিলে দুদিকে বিযুক্ত হয়ে যাবে। এবার পিনটি নাড়লে ক্লোএকা (অবসারণীটি) পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে। এই সময় মূত্রস্থলী অপসারণ করতে হবে।

মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বাটি টেনে বার করে আনবার পর বাঁকানো সূচের ধরবার জায়গাটি প্রবেশ করিয়ে দিলে গ্রাসনালী পরিষ্কার দেখা যাবে। কয়েক বার নোংরা ও রক্ত মিশ্রিত জল ট্রে থেকে ঢেলে পরিষ্কার জল ভর্তি ক'রে পাতলা আবরণ সরিয়ে পিত্তস্থলী, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় বের করতে হবে। পরে ব্যবচ্ছেদের ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম যথাযথ লিখতে হবে।

ব্যবচ্ছেদ যথাযথ দেখাবার পদ্ধতি : পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশ দেখে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি কেটে বাদ দিয়ে এবং ছোট চিমটার সাহায্যে পরিষ্কার করে, বার বার জল পরিবর্তন করলে পৌষ্টিকনালীটি পরিষ্কার হবে। এবার পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশের নাম ছোট ক'রে কাগজ কেটে সরু পেন্সিল দিয়ে লিখে সরু সরু আলপিনের সাহায্যে আটকিয়ে ট্রেটি জল ভর্তি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে **'পিনফ্ল্যাগিং'** (Pinflagin_) বলে। পরে পরিষ্কার ক'রে ব্যবচ্ছেদের ছবি খাতায় আঁকতে হবে।

(৩) মশা ও প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ

(ক) **মশার জীবন-বৃত্তান্ত :** যে প্রাণীটি আমাদের সব চাইতে বেশী বিরক্ত এবং রোগ সংক্রমণ করে তা হচ্ছে মশা। আমাদের বাসস্থানের সর্বত্রই মশার আনাগোনা আছে, মশার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রোগের বিস্তারও ঘটে। সুতরাং তাদের জীবন-ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শিক্ষা করলে মশা ধ্বংস করতে সুবিধা হবে। মশা সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গশ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী।

সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য : কয়েকটি ছোট ছোট কাচের জার ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি। ফরমালিন (এক প্রকার সংরক্ষণকারক রাসায়নিক পদার্থ) ও জল, জারের মধ্যে ধরে এরূপ অস্বচ্ছ কাটা কাচ, ছাঁকুনি, কাগজ ও পেন্সিল অতি মিহি কালো সুতো এবং লেন্স।

মশার বিভিন্ন দশা সংগ্রহ : পুকুর, ডোবা, আবদ্ধ জল সর্বত্র মশা ডিম পাড়ে এবং তাদের বিভিন্ন দশার পরিবর্তন হয়। তবে সহজে মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ করতে হলে একটি জলভর্তি পাত্র ঈষৎ অন্ধকার স্থানে রাখলে তাতে মশা ডিম পাড়বে। ডিম ফুটে পরের পর দশা যথাক্রমে লার্ভা পিউপায় ও পিউপা ইমাগোয় ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এই পরিবর্তিত জলের মধ্যে মশার জীবনের বিভিন্ন দশা সহজেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। নীচে বিভিন্ন দশা ও তার সংগ্রহ প্রণালী দেওয়া হ'ল।

প্রথম দশা—ডিম সংগ্রহ : লেন্সের সাহায্যে জলের উপর ভাসমান দুই প্রকারের ডিম দেখা যায়। ডিমগুলির আকার মাকুর মত, দুপাশে ভেলক ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভাসতে থাকলে এই ডিমগুলি অ্যানোফিলিস মশার ডিম। যদি ডিমগুলির নীচের দিকটি স্ফীত, গোলাকার হয় এবং একত্রে ভাসতে থাকে তাহলে ডিমগুলি কিউলেক্স মশার বুঝতে হবে। এই দুই প্রকার ডিম ছাঁকুনির সাহায্যে সংগ্রহ ক'রে দুটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির মধ্যে ফরমালিন মেশানো জলে রেখে ছিপি বন্ধ করতে হবে। উভয় শিশির গায়ে কাগজে কোন্ জাতীয় মশার ডিম তা লিখতে হবে। এই শিশি দুটি আলাদা আলাদা কাটা কাচের গায়ে উপরের দিকে সুতো দিয় বাঁধতে হবে।

দ্বিতীয় দশা—লার্ভা বা শূককীট সংগ্রহ : ২।৩ দিন পরে জলভর্তি পাত্রটি পরীক্ষা করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত জীব জলের মধ্যে ছোটাছুটি করছে দেখা যাবে। এদের আকার লম্বা, দেহ—মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। মস্তকটি চ্যাপ্টা, একজোড়া চোয়াল ও ভোজন বুরুশ যুক্ত এবং উভয় দিকে চক্ষু ও শুঁড় থাকে। এইগুলিই মশার জীবন
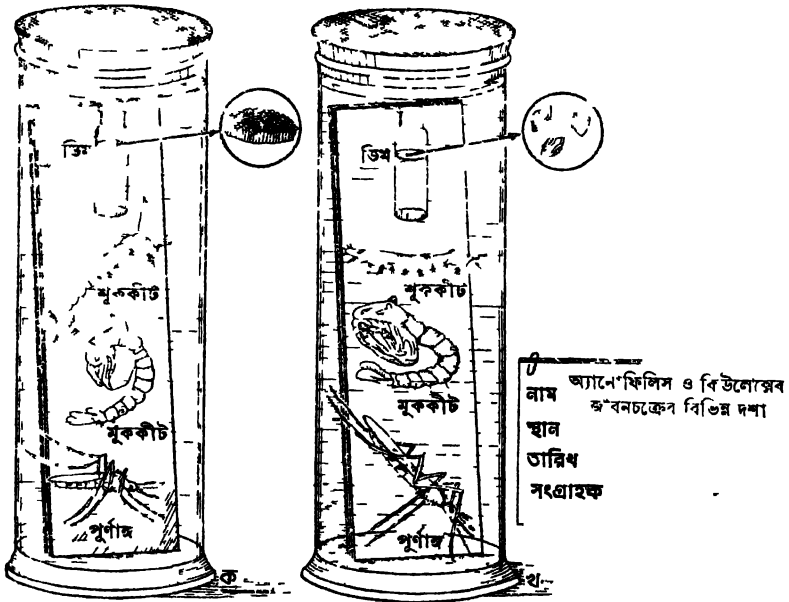
৬১নং চিত্র ॥ মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশার সংরক্ষণ—(ক) কিউলেক্স এবং (খ) অ্যানোফিলিস্ মশা জারের মধ্যে ফরমালিন জলে সংরক্ষণ পদ্ধতির দৃশ্য।

বৃত্তান্তের দ্বিতীয় দশা, এদের **শূককীট বা লার্ভা** বলে। **অ্যানোফিলিস মশার শূক জলের সমান্তরালে এবং কিউলেক্স মশার শূক জল তলের কোণাকুণি ভাসতে থাকে।** বিভিন্ন জাতের মশার শূক সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাটা কাচের উপর সুতোয় বেঁধে

বা 'কুইক ফিক্স' (Quick fix) নামক আঠায় লাগিয়ে ফরমালিনযুক্ত জারে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

তৃতীয় দশা—পিউপা বা মূককীট সংগ্রহ : ৭।৮ দিন পরে এই পাত্র ভাল করে দেখলে কমার (,) আকৃতির মত স্বচ্ছ ঢাকনায় আবৃত মূককীট দেখা যাবে। এদের মস্তক ও বক্ষ একত্রে দেহখণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী স্থূল এবং গোলাকার দেহখণ্ড ও উদর সরু হয়ে বাঁকানো থাকে। অ্যানোফিলিস মশার মূককীটের মস্তকের স্থূল গোলাকার অঞ্চলটি কিউলেক্স মশার একই অঞ্চল অপেক্ষা পেটের দিকে অনেক বেশী ঘোরানো থাকে। আগেকার উপায়ে বিভিন্ন মশার জন্য নির্দিষ্ট কাচখণ্ডে মূককীটগুলি সুতো বা আঠার সাহায্যে লাগাতে হবে।

চতুর্থ দশা—ইমাগো বা সমঙ্গ সংগ্রহ : একই স্থান থেকে কয়েকদিন (২।৩) পরে ইমাগো বা সমঙ্গ দশার মশা সংগ্রহ করতে হবে। এই সময় শিশু মশা তার দেহের আবরণী বা খোলস কেটে বেরিয়ে আসে এবং যতক্ষণ না পাখা শুকিয়ে যায় ততক্ষণ খোলসের উপরে বসে থাকে। এই অবস্থায় কয়েকটি মশা সংগ্রহ করতে হবে। **এই মশার মধ্যে যেগুলি দাগযুক্ত এবং দেহের পশ্চাৎ অঞ্চল ভূমির সাথে কোণাকুণি সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে সেগুলি অ্যানোফিলিস মশা এবং যাদের ডানায় দাগ থাকে এবং দেহের পশ্চাৎ অঞ্চল ভূমির সাথে সমান্তরাল থাকে সেগুলি কিউলেক্স মশা বলে জানতে পারা যাবে।** এই শিশু মশাগুলি সংগ্রহ ক'রে নির্দিষ্ট কাচের সাথে লাগাতে হবে।

এবার প্রতিটি কাটা কাচে বিভিন্ন দশার নাম কাগজে লিখে আঠা দিয়ে লাগিয়ে জারের মধ্যে রাখতে হবে। জারের জল শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে ফর্মালিন মিশ্রিত জল ঢালতে হবে। এইভাবে মশার জীবন-বৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

(খ) প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ : জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে হ'লে মশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মধ্যে ছাঁকুনির পরিবর্তে প্রজাপতি ধরবার জাল প্রয়োজন হবে।

সংগ্রহ করবার স্থান : আমাদের দেশে বিশেষত পল্লীগ্রামে এবং শহরের পার্কে, ফুলবাগানে বিভিন্ন রঙের সুন্দর সন্দর প্রজাপতি দেখা যায়। এই প্রাণীও পতঙ্গ শ্রেণীর, সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী। এরা লেবু, কুল, সজিনা ও শিমুল ইত্যাদি গাছে ডিম পাড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতির বিভিন্ন গাছ ডিম পাড়ার জন্য নির্দিষ্ট। বিশেষ প্রকার গাছে ডিম দেখলে কোন্ জাতীয় প্রজাপতি তা সনাক্ত করা যায়।

প্রজাপতির বিভিন্ন দশা ও তার সংরক্ষণ :

(ক) **ডিম :** কুল, লেবু ইত্যাদি গাছের পাতায় প্রজাপতি একত্রে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ডিম পাড়ে এবং ডিমের গায়ের আঠাল রস তাদের পাতার সাথে সংযুক্ত করে রাখে। এইরূপ একটি পাতা বা ডাল একটি কাচের জারে কাটা কাচের উপর বেঁধে ফরমালিনের মধ্যে রাখতে হবে। (খ) **লার্ভা বা শুঁয়াপোকা :** নির্দিষ্ট গাছে কয়েকদিন পরে

শুঁয়াপোকা ঘুরতে দেখা যাবে। এরা কচি পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের দেহ—মাথা, বুক ও উদরে বিভক্ত এবং সারা দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোঁয়ায় ভর্তি থাকে। দেহের অংকীয়ভাগে ১৩টি পা এবং শেষ দেহখণ্ডে বাঁকানো পর্দাটিকে 'ক্ল্যাসপার' বলে। এই প্রকার কয়েকটি শুঁয়াপোকা সংগ্রহ করে জারের মধ্যে কাটা কাচের গায়ে বেঁধে রাখতে হবে। (গ) **পিউপা বা নুককীট দশা ঃ** কয়েকটি জীবন্ত শূককীট একটি ছিদ্রযুক্ত কাচের জারে বিশেষ গাছের পাতা দিয়ে রাখলে শূককীট ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে ঐ পাতাগুলি খেয়ে ক্রমশ স্থূল হয়ে নিজেদের দেহনিঃসৃত লালায় নিজেদের আবদ্ধ করবে। এই আবরণীশুদ্ধ শূককীটকে কোকুন বা গুটি বলে। এই কোকুনের মধ্যে শূক পিউপায় পরিবর্তিত হবে। অথবা যে গাছ থেকে শূকগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল সেখান থেকেও গুটি সংগ্রহ করা যায়। (ঘ) **ইমাগো বা পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ঃ** ৮।১০ দিন পরে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে এবং কিছু সময় খোলসের উপর বসে থাকে। এই সময়ও প্রজাপতির ইমাগো সংগ্রহ করা যায়। প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণ সংরক্ষণের জন্য ছোট একটি কাগজের সাথে যুক্ত করে পরে কাচের ফ্রেমযুক্ত বাক্সে রাখা যায়। অন্যান্য মশার তিনটি দশার মত কাটা কাচের সাথে আটকিয়ে জারের ফরমালিনযুক্ত জলের মধ্যে রাখতে হবে। বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি জালের দ্বারা ধরে একইভাবে কাগজে আটকিয়ে রাখা যায়।

প্রজাপতি সংগ্রহ করার সময় একটি কাগজে কোন্ জায়গা থেকে প্রজাপতি সংগ্রহ করা হয়েছে, কবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোন্ গাছে বাসস্থান সেগুলিও লিখে রাখতে হবে।

(৪) বিভিন্ন প্রকার পাতা সংগ্রহ

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের পাতার আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। এই সকল পাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং কোন্ অঞ্চলের কোন্ উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা লিখে রাখা জীবন বিজ্ঞানের একটি শিক্ষামূলক বিষয়।

পাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ কাঁচি, ছুরি, সূচ, সুতা, পুরানো, খবরের কাগজ, বড় খাতা, ন্যাপথালিন, কাগজ ও পেন্সিল ইত্যাদি।

পাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, যথা—ফার্ণ, ব্যক্তবীজী ও একবীজ পত্রী এবং দ্বিবীজ পত্রী উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ করতে হবে। এই সকল উদ্ভিদের পাতার আকার বহু প্রকারের, ফলক ও ফলকের অগ্র দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে। পাতাগুলির পরিচয়ও লিখে রাখতে হবে। পাতা সংগ্রহ করার পর পুরানো খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে পর পর প্রসারিত করে রাখতে হবে। দেখতে হবে যাতে কোন পাতা অপর কোনও পাতার উপর না পড়ে। এই অবস্থায় পাতাযুক্ত খবরের কাগজগুলির উপর বই বা অন্য কোনও ভারী বস্তু চাপা দিয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজগুলি পাল্টিয়ে দিতে হবে, কারণ খবরের

কাগজ পাতায় রস শুষে নরম হয়ে গেলে পাতা পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবশেষে পাতাগুলি তাদের স্বাভাবিক প্রসারিত অবস্থায় শুকিয়ে উঠবে। পাতাগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে বড় সাদা খাতায় সরু করে কাগজ কেটে আঠার সাহায্যে অথবা সূচ-সুতার সাহায্যে লাগাতে হবে। উদ্ভিদের পাতা আটকানো সাদা কাগজের এক কোণে কবে, কোথায় এবং কোন্ উদ্ভিদের পাতা তা লিখতে হবে। শুষ্ক পাতা দ্বারা আটকানো কাগজটিকে **'হারবেরিয়াম শীট'** বলা হয়। যাতে পাতাটিতে পোকা না জন্মায় সেজন্য মাঝে মাঝে ন্যাপথালিন গুঁড়ো বা গ্যামাক্সিন ছড়াতে হবে।

(৫) ব্যায়ামের পর হৃদ্‌ঘাত বা হৃদ্‌স্পন্দনের (Heart beat) হার বৃদ্ধি

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন : মানুষের দেহ একটি যন্ত্রবিশেষ। অন্যান্য যন্ত্র যেমন নিয়মিত বা মাঝে মাঝে না চালালে সক্রিয় থাকে না সেরূপ আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন পেশী ও যন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে গেলে মাঝে মাঝে ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়াম করলে দেহের বিভিন্ন পেশীর সংকোচন-প্রসারণ ও কার্যকলাপের ফলে পেশীগুলির সক্রিয়তার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ব্যায়ামের ফলে দেহের হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসকার্য বাড়ে এবং দেহের কোষীয় বিপাকক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় দেহে প্রচুর তাপ, ঘর্ম ইত্যাদি নির্গত হয়।

ব্যায়ামের প্রকার অনুযায়ী পরিশ্রমও বিভিন্ন মাত্রায় হয়। যেমন, লঘু বা হালকা ব্যায়ামে নিষ্ক্রিয় অবস্থার চেয়ে সামান্য পরিমাণেও পরিশ্রমের বৃদ্ধি হয়। মধ্যম প্রকার ব্যায়ামে পরিশ্রমের হার হালকা অপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু ভারী বা কঠিন ব্যায়ামে অনেক বেশী পরিশ্রম হয়।

ব্যায়ামের ফলে পেশী সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং তার ফলে পেশীর মধ্যে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর জারণক্রিয়া ঘটে এবং উৎপন্ন শক্তি ব্যয়িত হয়। এই কার্যে অধিক অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন, সেইজন্য ব্যায়ামের পরে হৃদ্‌ঘাতের হার ও শ্বাসকার্যের হারের বৃদ্ধি ঘটে।

ব্যায়ামে হৃদ্‌ঘাতের হার বৃদ্ধির পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন : একটি স্টপওয়াচ অথবা সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত হাতঘড়ি (Wrist-watch) প্রয়োজন।

পরীক্ষা : পরীক্ষা শুরু করার প্রথমে তোমার বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ডান হাতের কব্জির চামড়ার নিচে অবস্থিত কব্জি ধমনী বা নাড়ীর অবস্থিতি নির্ণয় কর। পরে ঘড়ির সেকেণ্ড কাঁটার সাহায্যে প্রতি মিনিটে কতবার নাড়ী স্পন্দিত হয় তা নির্ণয় কর। সাধারণ বিশ্রামরত ও সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার হয়। প্রতিবার হৃদ্‌ঘাত বা হৃদ্‌স্পন্দনের ফলে একবার ক'রে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। সুতরাং প্রতি মিনিটে যতবার নাড়ীর স্পন্দন হবে তা প্রতি মিনিটে হৃদ্‌স্পন্দনে

হার নির্ণয় করবে। এবার যে-কোনও প্রকার ব্যায়াম কর—(ডন, বৈঠক, দাঁড়লাফান, দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি) যতক্ষণ না বেশ পরিশ্রম হয় ততক্ষণ থামবে না।

নিরীক্ষা ঃ এই অবস্থায় পূর্বের মত প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন কতবার হচ্ছে দেখ। দেখবে যে, নাড়ীর স্পন্দনের হার অনেক বেড়ে গেছে তার ফলে হৃদ্‌স্পন্দনের হারও প্রতি মিনিটে বেড়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণের হার প্রতি মিনিটে ৭২ বার থেকে অনেক বেড়ে যায়। কারণ রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি হ'লে মস্তিষ্কের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু উত্তেজিত হয়। এর ফলে রক্তসংবহন দ্রুত হয়ে ফুসফুসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বহিষ্করণ দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন স্বাভাবিক করে। (২) শিরার সংকোচনের ফলে ঊর্ধ্ব ও নিম্নমহাশিরার দ্বারা অধিক রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করে। (৩) হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন ও রক্তবাহগুলির সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। (৪) দেহের পেশীকলার মধ্যে ধমনিকার জালকগুলির দ্বারা রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায়, কিন্তু পৌষ্টিকতন্ত্রে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। (এজন্য আহারের পর ব্যায়াম করা উচিত নয়।)

———

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী :

১। নিউরন কি? একটি নিউরনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া উহার অংশগুলি চিহ্নিত কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) দেহের ভিতরে আবেগ কিভাবে পরিবাহিত হয়? ২। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কি? অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ু বলতে কি বোঝ? ৩। মানব মস্তিষ্কের প্রধান অংশ কি কি এবং ইহাদের কাজ কি? প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও। ৪। তোমার দর্শন ইন্দ্রিয়ের চিহ্নিত চিত্র আঁকিয়া উহার গঠন বর্ণনা কর। চোখের জলের উৎস এবং কাজ কি? ৫। জ্ঞানেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির নাম ও কার্য বল। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) ৬। জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টি ও কি কি? আমরা কেমন করিয়া শুনি? জিহ্বার কোন্ কোন্ অংশে মিষ্ট ও অম্ল স্বাদ অনুভূত হয়? ৭। একটি চক্ষুর লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন কর ও ইহার বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর—অচ্ছোদপটল (cornea), লেনস্ (lens), অক্ষিপট (retina) ও কণীণিকা (iris)। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ৮। কর্ণের গঠন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ৯। সাইন্যাপস্ কি? প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রের বর্ণনা দাও। ১০। নিউরনের কার্য কি? একটি সরল ও একটি জটিল প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার উদাহরণ দাও। মাছের কি কান আছে এবং মাছ কি শুনতে পায়? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬)

(খ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চল কোথায় অবস্থিত? ২। রড কোষ কোথায় অবস্থিত? ৩। 'ডেনড্রন' ও 'অ্যাক্সন'এর কার্যগুলি কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ৪। অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের কার্যগত পার্থক্য কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ৫। দেহের ভারসাম্য রক্ষায় কে সহায়তা করে? ৬। মেনিনজিস কি? ৭। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া কি? ৮। মানুষের করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা কত? ৯। নার্ভ কোষদ্বয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অংশের নাম কি? ১০। যে-কোনও দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ১১। জিহ্বার কোন্ অংশ দুইটি তিক্ত ও মিষ্ট স্বাদে সংবেদনশীল? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ১২। দুইটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম লিখ যাহাদের যথাক্রমে 'করনিয়া' ও 'কক্লিয়া' থাকে। (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা '৭৮) ১৩। অক্ষিপটের দৃষ্টিশক্তিহীন স্থানটিকে কি বলে? ১৪। ডেনড্রাইট কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬)

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী : (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। অ্যাক্সনের বাহিরের পাতলা আবরণটির নাম নিউরিলেমা।··· ২। আবেগের আদান-প্রদান নিউরোহিউমারের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে।··· (৩) কর্ণের কার্য দুইটি—একটি

'শ্রবণ', অপরটি কি ?…(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) (৪) অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।… (৫) কোন্ সুগন্ধী বস্তুর ঘ্রাণ কর্ণপটহের মাধ্যমে গৃহীত হয়।… (৬) অপটিক লোব পশ্চাৎ মস্তিষ্কে অবস্থিত।… (৭) 'রড' কোষ মৃদু ও 'কোন' কোষ তীব্র বেদন সৃষ্টি করে।… (৮) যে স্নায়ু মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে নিয়ে যায় তাকে ইফারেণ্ট বা বহির্বাহি স্নায়ু বলে।… (৯) কক্লিয়া শব্দতরঙ্গকে নার্ভ আবেগে রূপান্তরিত করিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।… (১০) মানুষ ও প্ল্যানেরিয়া উভয়েই পুঞ্জাক্ষির সাহায্যে দেখিতে পায়।… (১১) সেরিব্রাল কর্টেক্সই স্মৃতি. ধীশক্তি, ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। হরমোন বিষয়ে সাধারণ ধারণা ২১-৩৩

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী :

(১) হরমোন কাহাকে বলে ? একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের নাম লিখিয়া কোথায় উৎপন্ন হয় এবং স্বাভাবিক কাজ উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) (২) স্নায়ুতন্ত্রের সাথে হরমোনতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে হরমোন উৎপত্তিস্থলের নাম বল। (৩) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসকে কি বলে ? দৈত্যাকার, স্থূলাকার ও বামন মানুষ কিজন্য হয় ? (৪) 'পরিচালক গ্রন্থি' (Master gland) কাকে বলে ? এই গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোনগুলির কার্যাবলী বর্ণনা কর। (৫) মানুষের দেহে ইনসুলিন কি কার্য করে ? ইনসুলিন উৎপত্তিস্থলের নাম কি ? (৬) বুকের উপর অবস্থিত গ্রন্থির নাম বল। এই গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দাও। (৭) নিম্নলিখিত হরমোনগুলির অভাবজনিত লক্ষণগুলি বর্ণনা কর : (ক) থাইরক্সিন, (খ) ইনসুলিন, (গ) এ্যাড্রিনালিন। (মাধ্য : পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) (৮) উদ্ভিদের একটি হরমোনের নাম লিখিয়া উহা কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কি কি কাজ করে লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) (৯) উদ্ভিদ দেহের প্রধান হরমোনটির নাম কি ? ইহাদের অন্যান্য হরমোনগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। কৃষিকার্যে হরমোনের প্রভাব বর্ণনা কর। "কৃষিকার্যে হরমোনের প্রয়োগে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি"—তিনটি হরমোনের উল্লেখ করিয়া উহাদের উপকারিতা দেখাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) (১০) এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি কাহাকে বলে ? প্রাণিদেহের দুইটি এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির নাম, অবস্থান, নিঃসৃত হরমোনের নাম ও উহাদের কার্য বর্ণনা কর। (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা, '৭৮) (১১) মানবদেহে বিভিন্ন হরমোন উৎপাদনকারী অঙ্গগুলির নাম লিখ এবং উহাদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা কর। ১২। অক্সিন কাহাকে বলে ? অক্সিনের শ্রেণীবিভাগ ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯)।

(খ) এক কথায় উত্তর দাও।

১। এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য বল। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ২। হরমোনকে 'রাসায়নিক দূত' বলে কেন? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ৩। A.C.T.H. কি? (৪) মানবদেহের কোন্ গ্রন্থিটি মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত? (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা '৭৮, '৭৯) ৫। এ্যাডরিনাল গ্রন্থিকে কোন্ হরমোন উত্তেজিত করে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ৬। গলগণ্ড সৃষ্টি হয় কেন? ৭। অক্সিন কি? কোথায় উৎপন্ন হয়? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) ৮। প্রাণীর যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্যকারী রাসায়নিক বস্তুটির নাম কি? ৯। মিশ্রগ্রন্থি কাকে বলে? ১০। 'ফ্লোরিজেন'-এর কাজ কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ১১। কোন্ হরমোন কাণ্ডের শীর্ষে উৎপন্ন হয়ে নিম্নে প্রবাহিত হয়? ১২। একটি উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে প্রচুর শাখা-প্রশাখা বাহির হয় কেন? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬)

(গ) **জোড়-বিজোড় নির্ধারণকারী প্রশ্ন:** ("ক" স্তম্ভ হইতে অঙ্গের নাম এবং "খ" স্তম্ভ হইতে হরমোনের নাম লইয়া সঠিক যুগ্ম তৈয়ারী কর)

"ক" স্তম্ভ	"খ" স্তম্ভ
(i) পাকস্থলী	(অ) ইনসুলিন
(ii) অগ্ন্যাশয়	(আ) টেস্টোস্টেরণ
(iii) শুক্রাশয়	(ই) গ্যাসট্রিন (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭

(ঘ) **সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর:**

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি 'এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি' নহে—(a) লালাগ্রন্থি (b) অ্যাড্রিনালগ্রন্থি, (c) থাইরয়েডগ্রন্থি, (d) পিটুইটারিগ্রন্থি। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯

(ঙ) **বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী:** (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। পিনিয়াল গ্রন্থিকে পরিচালক গ্রন্থি বলে।··· ২। আইলেট-অফ্‌ল্যাঙ্গারহ্যান্স যকৃতে অবস্থিত।··· ৩। এক্রোমেগালি রোগ পিট্যুইটারী গ্রন্থির অধিক ক্ষরণে ফল।··· ৪। ইনসুলিনের প্রভাবে রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ৫। অগ্ন্যাশয়গ্রন্থি ও লালাগ্রন্থি দুটিকে অনালগ্রন্থি বলে।··· ৬। মেরুদণ্ডী প্রাণী বুকের উপরে থাইমাস অবস্থিত।··· ৭। ক্রেটিনিজম্ এবং মিক্সিডিমা অ্যাড্রিনালে নিষ্ক্রিয়তার ফল।··· ৮। জিব্বারেল্লিন একপ্রকার ছত্রাক জিব্বারেল্লা হইতে প্রস্তুত হয়।··· (৯) উদ্ভিদ হরমোনকে এক কথায় অক্সিন বলে। ১০। ফ্লোরিজেন ফল পাকানোয় সাহায্য করে।···

(খ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। উদ্ভিদের কোন্ কলা সর্বদা বিভাজিত হয় ? ২। একটি উদ্ভিদের নাম কর ; যাহাতে অঙ্গজ জনন হয়। (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা '৭৮) ৩। ভ্রূণাণু ও ডিম্বাণুর প্রভেদ কি ? ৪। অঙ্গজ জনন হয় এমন দুইটি গাছের নাম বল। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ৫। জীবদেহের বৃদ্ধি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ? ৬। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় একটি বাহ্যিক ও একটি আভ্যন্তরীণ শর্তের নাম লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ৭। গ্যামেটে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক না ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে ? ৮। কোরকোদ্গম কি ? ৯। 'কনজুগেশান' কি ? ইহা কোথায় সম্পন্ন হয় ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা উভয়লিঙ্গ হয়।··· ২। যৌন-পদ্ধতিতে তারা মাছ প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন করে।··· ৩। পাখীরা শাবক প্রসব করে।··· ৪। বার হইতে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের বৃদ্ধি কম হয়।··· ৫। কোন ফুলের পরাগ রেণু যখন সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডের উপর পড়ে তাকে ইতর পরাগসংযোগ বলে।···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।। বংশগতি ৬৬-৭৪

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী ঃ

১। সুপ্রজনন বিদ্যার জনক কাকে বলা হয় ? তাঁর আবিষ্কারের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২। বংশগতি বলতে কি বোঝ ? সভ্যতার বিকাশে বংশগতি বিজ্ঞানের অবদান কি ? ৩। 'বংশগতি' (Heredity) বলিতে কি বুঝ ? মেণ্ডেলের বিভিন্ন মতবাদ উল্লেখ কর ও 'এক-সংকর জনন' (monohybrid cross)—এর সাহায্যে মেণ্ডেলের একটি মতবাদ ব্যাখ্যা কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ৪। মেণ্ডেলের বংশগতি সম্বন্ধীয় প্রথম সূত্রটি কি ? মেণ্ডেলের মটরবীজের (দীর্ঘ ও হ্রস্ব) পরীক্ষার ফল ছকের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও। 'সংকর' (হাইব্রিড) ও 'খাঁটি' কথার অর্থ কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ৫। মেণ্ডেলের এক-সংকর ক্রসের (monohybrid cross) একটি উদাহরণ দাও এবং চেকার বোর্ডের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। ইহা হইতে কি মন্তব্য করা যায় ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ৬। বংশগতি কাকে বলে ? বংশগতিতে প্রবল গুণ (dominant) ও প্রচ্ছন্ন গুণ (recessive) কথার অর্থ কি ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) ৭। বংশানুক্রমে মাতাপিতার গুণাগুণগুলি সন্তানে বহন করে কেন ? একটি কালো এবং একটি সাদা গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটালে দ্বিতীয় পুরুষে কালো এবং সাদা গিনিপিগ ৩ ঃ ১ অনুপাতে পাওয়া গেল। প্রথম পুরুষে কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে এবং কোন্ বৈশিষ্ট্যটি প্রবল ও কোন্টি সুপ্ত ? ৮। এক সংকর-জননের ৩ ঃ ১ অনুপাত কখন পাওয়া যায় না ? একটি উদাহরণ দিয়া ইহা লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ৯। লম্বা ও বেঁটে গাছের সংকরায়ন ঘটালে দ্বিতীয় পুরুষে লম্বা ও

বেঁটের অনুপাত কি হবে ? লম্বা গাছগুলির মধ্যে কতগুলি সংকর ? সংকর গাছগুলির মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্যটি প্রবল এবং কোন্‌টি সুপ্ত ? ১০। মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলি লিখ। এই সূত্রগুলি যে প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা উদাহরণসহ আলোচনা কর। কৃষির উন্নতিতে সংকরায়নের কোন ভূমিকা আছে কি ? ১১। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখাও—(ক) 'ফেনোটাইপ' ও 'জেনোটাইপ', (খ) 'জাইগোটিন' ও 'ডিপ্লোটিন" (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)।

(খ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি $2n = 8$ হয়, নিম্নলিখিত অংশসমূহের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হইতে পারে লিখ ঃ (i) পুংদণ্ডের ক্রোমোজোম সংখ্যা। (ii) পাতার ক্রোমোজোম সংখ্যা। (iii) পরাগরেণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা। (iv) ভ্রূণাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা। (v) বীজের ক্রোমোজোম সংখ্যা। (vi) ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা।

২। সুপ্রজনন বিদ্যার জনক কাকে বলা হয় ? ৩। বংশধারার বাহক কোন্‌টি —বীজ, জীব, জীন। ৪। একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তানের মধ্যে যে সকল সাধারণ বৈসাদৃশ্য আসে তাকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় কি বলে ? ৫। জীবের বংশগতির নির্ধারক জীন কণিকা কোথায় থাকে ? ৬। মানুষের যৌনকোষে কয়জোড়া ক্রোমোজোম থাকে ? ৭। RNA-এর সম্পূর্ণ নাম কি ? ৮। বংশগতিতে ৩ ঃ ১-কে কি অনুপাত বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। সন্তান-সন্ততি তাদের সকল বৈশিষ্ট্য পিতামাতার নিকট হতে পায়।·· ২। জাইগোটে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।··· ৩। মেণ্ডেল পৃথকীকরণ সূত্রটি দ্বি-সংকরায়ণ পরীক্ষার দ্বারা বোঝান।·· ৪। আকস্মিকভাবে জীনের পরিবর্তন ঘটলে সন্তান-সন্ততির বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন ঘটে। ইহাকে জীন মিউটেশন বলে।··· ৫। ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা জীবের ক্রোমোজোম ও জীনের রাসায়নিক গঠনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান।··· ৬। হলুদ ও গোলাকার এবং সবুজ ও কুঞ্চিত মটর বীজের হলুদ ও গোলাকার বৈশিষ্ট্যই প্রকট।· ৭। কালো এবং সাদা গিনিপিগের সাদা রঙটি প্রকট।···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ অভিব্যক্তি

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) অভিব্যক্তি কাহাকে বলে ? ল্যামার্কের মতবাদ সংক্ষেপে লিখ। (মাধ্য পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) ২। বিভিন্ন প্রমাণ সহযোগে ক্রম বিবর্তনের বিষদ বিবরণ দাও (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ৩। অভিব্যক্তির অনুকূলে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাদে

উল্লেখ কর। মিউটেশন কি এবং কাহার মতবাদ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) (৪) অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝ? ডারউইনের (Darwin) মতবাদ সংক্ষেপে লিখ। নয়া-ডারউইনবাদ কি? (৫) 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জীবন-সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমেরই আছে বাঁচিবার অধিকার'—এই দুইটি কাহার উক্তি? এই উক্তি দুইটি আলোচনা কর। (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা '৭৮) ৬। ল্যামার্কিজম বলতে কি বোঝায়? ল্যামার্কের অভিব্যক্তিবাদ সূত্রগুলি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর। ৭। অভিব্যক্তির অনুকূলে ভ্রূণঘটিত ও জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ ভালভাবে ব্যাখ্যা কর। ৮। প্রজাতি উদ্ভবে মিউটেশন তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। কে এই তত্ত্বের আবিষ্কারকর্তা? ল্যামার্কের মতবাদের ত্রুটি কোথায়? ৯। নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীগণ কি কারণে বিখ্যাত ঃ—(ক) লুই পাস্তুর, (খ) গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ও (গ) হুগো ডি-ভ্রাইস। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

(খ) **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

১। 'পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে অর্জিত গুণগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হইতে পারে'—ইহা কাহার মতবাদ? (মাধ্যঃ কম্পঃ পরীক্ষা '৭৮) ২। 'অর্জিত গুণগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়'—এই মতবাদের প্রস্তাবক কে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ৩। জীবনসংগ্রাম সূত্রের প্রবক্তা কে? ৪। মানুষের দেহের একটি 'লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয়' অঙ্গের নাম কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮, '৭৯) ৫। অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস কে? ৬। কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল? (৭) সরীসৃপ ও পক্ষীকুলের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী একটি জীবাশ্মঘটিত প্রাণীর নাম বল। ৮। ঘোড়ার পূর্বপুরুষের নাম কি? ৯। "মিউটেশন" তত্ত্বের প্রবক্তা কে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৭) ১০। লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) জীবাশ্ম কাহাকে বলে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯)

(গ) **বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ** (সঠিক উত্তরের পাশে 'হাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে না' লিখ)

১। অভিব্যক্তি সম্বন্ধীয় ডারউইনের মতবাদ থেকে ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র।··· ২। হংসচঞ্চু স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী।··· ৩। ফরাসী জীববিজ্ঞানী জে. বি. ল্যামার্ক 'প্রজাতি উৎপত্তি' তত্ত্বের প্রবক্তা।··· ৪। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃদ্‌পিণ্ড পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত।··· ৫। অভিব্যক্তির প্রধান কারণ হইতেছে পরিবেশের প্রভাব।···

(ক) **সাধারণ প্রশ্নাবলী ঃ**

১। অভিযোজন বলতে কি বোঝ? অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি? একটি জলজ উদ্ভিদ ও একটি জলজ প্রাণীর অভিযোজন বর্ণনা কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ২। অভি-

যোজনের উদ্দেশ্য কি? পরিবেশের সহিত মাছের অভিযোজনের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ৩। অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি? একটি জলজ প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার অভিযোজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯) ৪। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পত্রের রূপান্তরের কারণ ও ফল কি কি তা বুঝিয়ে লেখ। ৫। পরিবেশ অনুযায়ী উদ্ভিদের অভিযোজনের বর্ণনা দাও। ৬। অভিসারী অভিযোজন কাকে বলে? রুইমাছ অভিযোজনের দ্বারা কিভাবে নিজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে তা আলোচনা কর। ৭। দ্রুতগতির জন্য অভিযোজন হয়েছে এরূপ একটি স্থলচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। ৮। পাখীর এবং বায়ুবাহী বীজের অভিযোজন সম্বন্ধে যা জান লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ৯। (ক) বায়ুতে উড়বার জন্য পাখীর নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির কিরূপ অভিযোজন হয়েছে লিখ—(i) আকৃতি, (ii) পেশী এবং (iii) হাড়। (iv) কয়েকটি মাছের শ্বাস অঙ্গের জলজ ও স্থলজ অভিযোজন কিরূপে হয়েছে তা উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ১০। মরুভূমিতে বসবাসকারী একটি প্রাণীর অভিযোজনের বর্ণনা দাও। ১১। উদ্ভিদের বায়বীয় ও প্রাণীর বায়বীয় অভিযোজনের একটি উদাহরণ দাও ও তাহাদের তাৎপর্য দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯)

(খ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। মূলের পরিবর্তিত রূপের নাম কি? ২। মরু উদ্ভিদের পাতাগুলি মোটা বা কণ্টকে পরিবর্তিত হয় কেন? ৩। একটি জলজ উদ্ভিদের দুইটি অভিযোজন উল্লেখ কর? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৮) ৪। শ্বাসমূল কিরূপ উদ্ভিদের অভিযোজনের উদাহরণ? ৫। একটি গৌণ জলজ প্রাণীর নাম লিখ। (৬) পাখীর ডানা দুটি কোন্ অঙ্গের পরিবর্তন? ৭। মরু-জাহাজ কাকে বলে এবং সে জলের প্রয়োজন কোন্ অঙ্গের দ্বারা মিটায়? ৮। একটি মুখ্য জলচর প্রাণীর নাম লিখ। ৯। কচুরিপানার কোন্ অঙ্গ উহার ভাসার জন্য অভিযোজিত হয়েছে? ১০। একটি প্রাণিভোজী উদ্ভিদের নাম লিখ। ১১। জীবন কালে অর্জিত কোনও বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হইতে পারে অথবা পারে না? (মাধ্যঃ পরীক্ষা, '৭৭) ১২। একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের একটি স্থলজ ও একটি জলজ অভিযোজনের উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ১৩। মাছ স্থলে বাস করতে পারে না কেন? ইহার দুইটি কারণ লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। ফণিমনসা গাছের কান্ড পাতায় রূপান্তরিত এবং পাতা কন্টকে রূপান্তরিত হইয়াছে।··· ২। লবণাক্ত স্থানের উদ্ভিদের মূলে মূলরোম থাকে না।··· (৩) সকল প্রকার অভিযোজনই স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক।··· ৪। তিমির শরীরে জল প্রবেশ

নিরোধ করিবার জন্য যে স্নেহ পদার্থের স্তর আছে তার নাম 'ব্লাডার'। ·
৫। ক্যাঙ্গারুর পশ্চাদ্‌পদ লাফাবার জন্য সবল পুষ্ট ও লিপ্তপাদ হইয়াছে।···

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন চক্র **১০৪-১০৯**

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী :

১। 'কার্বন আবর্ত' বর্ণনা কর। ইহার তাৎপর্য কি? ২। বায়ুমণ্ডলে শতকরা কতভাগ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে? নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ৩। বায়ুমণ্ডলে কত ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে? কি কারণে উদ্ভিদ সরাসরিভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে না? একটি ছক সহযোগে নাইট্রোজেন চক্র ব্যাখ্যা কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ৪। অক্সিজেন আবর্ত কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন কিভাবে জীবে এবং জীব হইতে বায়ুতে আবর্তিত হয় তার বর্ণনা দাও। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত? ৫। জীবজগৎ তাহার পরিবেশ হইতে প্রায় ১৫টি মৌলিক পদার্থ খরচ করিয়া যাইতেছে কিন্তু আজও উহারা শেষ হইয়া যাইতেছে না। তোমার পঠিত দুইটি মৌলিক পদার্থের নিজ নিজ পরিমাণ কিরূপে বজায় রহিয়াছে তাহা সংক্ষেপে দেখাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ৬। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের অনুপাত কিভাবে বজায় থাকে সংক্ষেপে লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৮) ৭। একটি ছক আঁকিয়া নাইট্রোজেন চক্রের বিবরণ দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯)

(খ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন উদ্ভিদ কিভাবে গ্রহণ করে? ২। শিম্বজাতীয় (লেগুমিনাস) উদ্ভিদের মূলে বাসকারী জীবাণুর নাম কি? ৩। প্রাণীরা কিভাবে কার্বন সংগ্রহ করে? ৪। নাইট্রোজেন সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটিরিয়াকে একসাথে কি বলে? ৫। নাইট্রেট সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়াগুলিকে একসাথে কি বলা হয়?

(গ) **বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী**—(সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। প্রাণীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই উদ্ভিদের নিকট হতে কার্বন গ্রহণ করে।··· ২। নাইট্রোসোমোনাস ব্যাকটিরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে। ৩। উদ্ভিদ মৌলিক নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করে।··· ৪। বিভিন্ন অজৈব বস্তুদ্বারা জীবদেহের নাইট্রোজেনঘটিত জৈব পদার্থের অজৈব নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত হওয়াকে নাইট্রিফিকেশন বলে।··· ৫। পরিবেশ হতে গৃহীত মৌল বস্তুগুলি জীবনমণ্ডল পুনরায় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় বলে পরিবেশে জীবের প্রয়োজনীয় মৌল শেষ হয় না।

(ক) সাধারণ প্রশ্নাবলী :

১। ইকোসিস্টেম বলতে কি বোঝ ? একটি পুকুরের উদাহরণ দিয়া ইকোসিস্টেমটি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৬) ২। একটি ইকোসিস্টেমে কয় শ্রেণীর উপকরণ অংশ গ্রহণ করে ? বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য কি ? সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত যে কোনও দুইটি প্রাণীর নাম উল্লেখ কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) ৩। 'সূর্যই সবল প্রাণশক্তির উৎস'—ব্যাখ্যা কর। ৪। পরিবেশের কোন্ পাঁচটি উপাদানের উপর জীবন নির্ভরশীল ? চিত্র সহযোগে কোনো একটি স্থলভাগের বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৫। মানুষ কিভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত করে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে তা দুটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও। ৬। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি ? ৭। সংরক্ষণের সংজ্ঞা কি ? বনসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি ? বনসংরক্ষণে আমাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৮) ৮। সংরক্ষণ বলতে কি বোঝ ? সুস্থ মানবসমাজ গঠনে কয়েকটি সংরক্ষণ কার্যের উল্লেখ কর। অভয়ারণ্য কাকে বলে ? ৯। মিথোজীবিতা বলতে কি বোঝ ? বাস্তুসংস্থান তন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য কি ? খাদ্য পিরামিড তত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। খাদ্য জাল কি ? ১০। বাংলাদেশে কয়টি অভয়ারণ্য আছে ও কোন্ কোন্ অভয়ারণ্য কি কি বিশেষ প্রাণীর জন্যে বিখ্যাত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা কম্পঃ '৭৯) ১১। বনজ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া 'সংরক্ষণ' সম্বন্ধে রচনা লিখ। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৯)

(খ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। খাদ্যশৃঙ্খল কি ? ২। বাস্তুসংস্থান তন্ত্রের একক কি ? ৩। সর্বভুক্ কথাটির অর্থ কি ? ৪। পরজীবিতার সংজ্ঞা কি ? ৫। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক কি ? ৬। জাঙ্গল উদ্ভিদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি কি ? ৭। সমজীবিতা (commensalism) বলতে কি বোঝায় ? ৮। শক্তির ও সংখ্যার পিরামিড কি ? ৯। প্রাথমিক উৎপাদক কারা ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী : (সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরের পাশে 'না' লিখ)

১। উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে।··· ২। জড় ও জীব একে অপরের সহায়ক বা পরিপূরক নয়। ৩। প্লাংকটন একপ্রকার নিম্নস্তরের প্রাণী। ৪। পরজীবী উদ্ভিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে লাইকেন।·· ৫। মাংসাশী প্রাণীরা খাদ্যের ব্যাপারে সরাসরি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।···

মৌখিক প্রশ্নাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ নার্ভতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়স্থানগুলির পরিচয় দান ১—২০

১। উদ্দীপনা-গ্রাহক অঙ্গ কি কি ?

২। নিউরোন কাকে বলে ? গাছের কি নিউরোন আছে ?

৩। নার্ভতন্ত্রের সাথে ডাক বিভাগের কোন্ শাখার তুলনা করা হয় ?

৪। একটি মিশ্র স্নায়ুর নাম বল। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৫। গ্যাংগ্লিয়ন কাকে বলে ?

৬। নার্ভতন্ত্রের কোন্ অংশটি সুসংগঠিত ? এই অংশটির কার্য কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৭। সাইন্যাপস্ কাকে বলে ? নিউরোহিউমর কোথায় উৎপন্ন হয় ?

৮। প্রতিবর্তক্রিয়া কি ? প্রতিবর্তক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭) এই ক্রিয়া কি গাছে হয় ?

৯। সর্তানুগ প্রতিবর্তক্রিয়া কাহাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১০। সুষুম্না কাণ্ড কি ? মানব মস্তিষ্কের কোন্ অংশ অধিক উন্নত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১১। মস্তিষ্কের ঝিল্লি আবরণীকে কি বলে ?

১২। গুরু মস্তিষ্কের কাজ কি কি ?

১৩। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি ?

১৪। আরশোলা অ্যান্টিনার সঞ্চালন দ্বারা বুঝতে পারে—কেন ?

১৫। জিহ্বার সাহায্যে আমরা খাদ্যের স্বাদ বুঝতে পারি—কেন ?

১৬। মাছি ও প্রজাপতির স্বাদেন্দ্রিয় কোথায় থাকে ?

১৭। সর্দি হলে আমরা কোনও কিছুর গন্ধ অনুভব করতে পারি না কেন ?

১৮। পুঞ্জাক্ষি কাহাকে বলে ? পুঞ্জাক্ষি আছে এমন একটি প্রাণীর নাম কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

১৯। মথের ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোথায় অবস্থিত ?

২০। অন্ধবিন্দু কাকে বলে ?

২১। মানুষের চক্ষুতে আলোক সংবেদনশীল স্তরটির নাম কি ?

২২। মানুষ কানের সাহায্যে শুনতে পায় কিন্তু মাছ কি শুনতে পায় ?

২৩। স্ট্যাটোসিস্ট কোন্ প্রাণীর, কোন্ অঙ্গে থাকে এবং কি কাজ করে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। হরমোন বিষয়ে সাধারণ ধারণা **২১—৩৩**

১। হরমোন কি ? কোন একটি গ্রন্থির নাম কর যা হরমোন উৎপন্ন করে।
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

২। কয়েকটি উদ্ভিদ হরমোনের নাম বল।

৩। অক্সিন কি ? কোলিওপটাইল কাহাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৪। ফ্লোরিজেন কি ? এর দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় কি ?
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

৫। পতঙ্গের জীবনবৃত্তান্তের প্রথম অবস্থায় কোন্ হরমোন রূপান্তরে সাহায্য করে বল।

৬। অন্তক্ষরা গ্রন্থি কাহাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৭। থাইরয়েড কি ? ইহা দেহের কোথায় অবস্থিত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

৮। কোন্ অনাল গ্রন্থিকে 'মাষ্টার গ্রন্থি' বলা হয় ? উহা কোথায় অবস্থিত ?
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৯। গলগণ্ড রোগ কি জন্য হয় ?

১০। থাইরোক্সিন নিঃসরণ অধিক বয়সে কম হলে কি হয় ?

১১। ইনসুলিন কোথায় উৎপন্ন হয় ? ইনসুলিন ক্ষরণ কম হলে কি রোগ হয় ?
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১২। ডায়াবেটিস কি ? কোন্ বস্তুর অভাবে এই রোগ হয় ?
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

১৩। মানুষের বৃক্কের উপরে অবস্থিত গ্রন্থির নাম কি ?

১৪। অ্যাড্রিনালিন কি এবং কোথায় উৎপন্ন হয় ?

১৫। সংকটকালীন বা যুদ্ধ, ত্রাস ও পলায়ন সম্বন্ধীয় হরমোন কি ?

১৬। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে পরিচালক গ্রন্থি কোন্‌টি ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।। কোষ বিভাজন এবং তাহার তাৎপর্য **৩৪—৪৮**

১। কোষের মস্তিষ্ক বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কোন্‌টি ?

২। নিউক্লিয়স ছাড়া জীবকোষ বাঁচিতে পারে কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৩। কোন্ জীবের কোষে নিউক্লিয়স থাকে না বল।

৪। সেনট্রোজোম কোথায় থাকে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৫। প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের মধ্যে একটি পার্থক্য বল।

৬। ক্রোমোজোম কি ? কোথায় থাকে এবং কার্য কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৭। মানুষের কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৮। কোষ বিজাজন কয় প্রকার ? দেহকোষ বিভাজনের নাম কি ?

৯। মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয় কেন ? সাইটোকাইনেসিস কাহাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১০। জননকোষ উৎপাদনে কোন্ প্রকার কোষ বিভাজন হয় ?

১১। মাইটোসিস কি ? ইহা কোথায় সংগঠিত হয় ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

১২। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত থাকে ?

১৩। মায়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় কেন ? এই বিভাজন কোথায় হয় ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

১৪। মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনে কয়টি করে অপত্যকোষ উৎপন্ন হয় ?

১৫। মায়োসিসের সময় কোষের নিউক্লিয়সের দুইবার বিভাজন হয় কেন ? দ্বিতীয় বিভাজনটির বিশেষত্ব কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

১৬। মাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবদেহে না হলে কি ফল হ'ত ?

১৭। D.N.A. কি ? সেনট্রোমিয়ার কাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১৮। একটি নির্দিষ্ট জীবের সকল কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কি এক থাকে ?

১৯। R.N.A. কোথায় থাকে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।। বৃদ্ধি ও জনন ৪৯—৬৫

১। বৃদ্ধি কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের মুখ্য বৃদ্ধিকাল বলতে কি বুঝ ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

২। মিষ্টি আলু, ডালিয়া ও শতমূলীর অঙ্গজ জনন কোন্ অঙ্গের সাহায্যে হয় ?

৩। পাতার দ্বারা জনন কোন্ উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় ?

৪। কোন্ উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলের সাহায্যে জনন হয়, নাম বল।

৫। গোল আলু, আদা ও ওলের কোন্ অঙ্গের সাহায্যে জনন হয় ?

৬। রেণু বা স্পোরের সাহায্যে জনন হয় এমন একটি উদ্ভিদের নাম কি ?

৭। সমজনন কোষ দ্বারা কোন্ উদ্ভিদের জননক্রিয়া হয় ?

৮। সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জনন কোষগুলির নাম কি কি ?

৯। দ্বি-গর্ভাধান কোথায় হয় ?

১০। একটি ফুল এক লিঙ্গ অথবা উভয় লিঙ্গ কি করিয়া বুঝ ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

১১। জাইগোট (ভ্রূণাণু) কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

১২। অযৌন জনন কাহাকে বলে ? পুনরুৎপত্তি কোন্ প্রাণীতে দেখা যায় ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১৩। অ্যামিবার জননকে কি বলে এবং প্রক্রিয়ার নাম কি ?

১৪। মুকুলোদ্গম দ্বারা জনন হয় এমন একটি প্রাণীর নাম বল।

১৫। একটি উভয় লিঙ্গ প্রাণীর উদাহরণ দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) একটি উভয় লিঙ্গ গাছ কিভাবে চিনবে ?

১৬। একলিঙ্গ গাছের উদাহরণ দাও। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১৭। মানুষের দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোষের নাম কি ?

১৮। বহিঃনিষেক হয় এমন একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম বল।

১৯। বহুকোষী প্রাণীর দেহের কোন্ কোষটি আয়তনে সবচেয়ে বৃহৎ, নাম বল।

২০। স্থলচর মেরদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণ কোন্ আবরণীর দ্বারা সুরক্ষিত হয় ?

২১। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী কুনো ব্যাঙ কিরূপে চিনিবে ?
(মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

২২। যৌন জনন কাহাকে বলে ? গ্যামেট কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।। বংশগতি ৬৬-৭৪

১। সুপ্রজনন বিদ্যার জনকের নাম কি ?

২। বংশগতি বলিতে কি বুঝ ? (মাধাঃ পরীক্ষা '৭৮)

৩। পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াকে কি বলে ?

৪। পিতা-মাতার বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেগুলি অপত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাকে কি বলে ?

৫। এক-সংকর জনন কাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৬। মেণ্ডেলের দ্বি-সংকর পরীক্ষায় দ্বিতীয় প্রজন্মের অনুপাত বল।

৭। যৌন ক্রোমোজোম কাকে বলে ?

৮। জীন কি এবং কোথায় থাকে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

৯। বংশগত বৈশিষ্ট্যের বাহক কে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

১০। মেণ্ডেলের কাজের পুনর্মূল্যায়ন কোন্ কোন্ বিজ্ঞানীর অবদান ?

১১। সুনির্বাচনের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল কয়েকটি ধানের নাম বল।

১২। XX ক্রোমোজোমবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীরা কোন্ লিঙ্গ ?

১৩। ইভ্‌নিং প্রিমরোজ উদ্ভিদের উপর জীববিজ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।। অভিব্যক্তি ৭৫-৮৯

১। অভিব্যক্তি ও জীব-অভিব্যক্তি কি এক বস্তু ?

২। পতঙ্গ ও পাখীর ডানাকে কি বলে ?

৩। নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাহাকে বলে ? তোমার দেহের একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম বল। (মধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৪। একটি ক্ষয়িষ্ণু অঙ্গের নাম বল।

৫। জীবাশ্ম কাকে বলে? জীবাশ্ম হইতে আমরা কি জানিতে পারি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮) ঘোড়ার পূর্বপুরুষের নাম কি?

৬। ভ্রূণ অবস্থায় স্তন্যপায়ীরা মাছের মত দেখতে হয়—এটি কোন্ জাতীয় প্রমাণ?

৭। পরিবেশের প্রভাব, ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অর্জিত গুণের অধিকারিত্ব ইত্যাদির দ্বারা জীব-অভিব্যক্তি হয়—এটি কার মতবাদ?

৮। জার্মপ্লাজম কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৯। মেণ্ডেল বিখ্যাত কেন? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)। মেণ্ডেলের আবিষ্কার কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১০। ডারউইনের নাম কিসের জন্য বিখ্যাত? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

১১। অর্জিত গুণাবলীর বংশানুক্রমিক সঞ্চার সূত্রের প্রবক্তা কে ছিলেন? অর্জিত গুণ বলতে কি বুঝ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮) ল্যামার্ক কেন বিখ্যাত? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১২। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে কে প্রথম আলোচনা করেন? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১৩। মিউটেশন তত্ত্বের প্রবক্তার নাম কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১৪। ডি-ভ্রাইস কিসের জন্য বিখ্যাত? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ অভিযোজন ৯০-১০৩

১। অভিযোজন কাকে বলে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭, '৭৮)

২। বেলগাছের পাতার কাঁটা, কাঁঠালি চাঁপার কাঁটা, ঝুমকালতার আকর্ষ—কি প্রকার অভিযোজন? একটি জলজ উদ্ভিদের নাম কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৩। ফণিমনসার কাণ্ড ও কাঁটা, ঝাউগাছের কাঠির মত পাতা—কি প্রকার অভিযোজন?

৪। পাখীর দুটি অভিযোজনের নাম কর। কোন্ পাখী জলে সাঁতার দিতে পারে? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৫। শ্বাসমূল কোন্ স্থানের গাছে দেখা যায়?

৬। কোন্ গাছে ঠেসমূল দেখা যায়? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৭। উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম কোন্ উদ্ভিদের হয়? এরূপ হয় কেন? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৮। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কোন্ প্রকার মূলের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতা গ্রহণ করে?

৯। কোন্ স্তন্যপায়ী প্রাণী জলে বাস করে? তাহার শ্বাসযন্ত্রের নাম কি? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১০। তিমি স্তন্যপায়ী—এদের অভিযোজনকে কি বলে

১১। গৌণ জলজ প্রাণী কাদের বলা হয় ? ইহাদের ... উভচর প্রাণীর পার্থক্য কি ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

১২। কই, মাগুর, সিংগি ইত্যাদি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় কি সুবিধা হয় ?

১৩। আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে কোন্ প্রাণীরা চলে ?

১৪। সকল পাখী কি উড়তে পারে ? কোন্ পাখীরা উড়তে পারে না ?

১৫। বাদুড়ের ডানা আছে এবং উডতে পারে— এরা কোন্ শ্রেণীর প্রাণী ?

১৬। মরুভূমির কোন্ সরীসৃপ প্রাণী চর্মের সাহায্যে বৃষ্টি ও শিশিরবিন্দু শোষণ করে ?

১৭। মরুভূমির জাহাজ কাকে বলে ? একটি অনুড্ডীন পাখীর নাম কর। (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন চক্র ১০৪—১০৯

১। পরিবেশ বলিতে কি বুঝ ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

২। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ কত ?

৩। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের সমতা কোন্ প্রক্রিয়ায় থাকে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৪। শ্বাসকার্যে গৃহীত অক্সিজেন কোন্ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে ?

৫। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৬। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃশেষিত হলে কি হতে পারে ?

৭। বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৭)

৮। ছোলা, মটর, ধঞে, শিম্ব ইত্যাদি জাতীয় উদ্ভিদ জমিতে লাগানো উচিত কেন ?

নবম পরিচ্ছেদ ॥ ইকোসিস্টেম ও কনজারভেশান ১১০—১২১

১। বাস্তব্যবিদ্যা কাকে বলে ?

২। জড় পরিবেশের উপাদান কি কি—নাম বল।

৩। ইকোসিস্টেমের প্রধান উপাদান কি কি ?

৪। ইকোসিস্টেমে উৎপাদক ও ভক্ষক কারা ?

৫। খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়গুলি বল।

৬। খাদ্যশৃঙ্খল কাহাকে বলে ? (মাধ্যঃ পরীক্ষা '৭৮)

৭। একই পরিবেশে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলকে কি বলে ?

৮। বায়োম কাকে বলে ?

৯। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও বিচক্ষণতাব সাথে ব্যবহারকে কি বলে ?